চার টাকা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

প্রিয়বরেষু

ভূমিকা

এ উপন্যাসখানা ক-খণ্ডে যে সমাপ্ত হবে, তা আজ আমি বলতে পারছি নে। তবে এটুকু বলতে পারি যে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ। তারপর প্রতি খণ্ড স্বয়ং পূর্ণ হবে। বিগত একশত বছর ধরে পূর্ব বাঙলার গ্রামিন সভ্যতা কি ভাবে যে ব্যষ্টির থেকে গোষ্ঠীর দিকে ধীরে ধীরে সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তারই চিত্র এ উপন্যাস। উলঙ্গ একটা কাঠামকে সুন্দর, নয়নাভিরাম, জনমনের পূজার উপযোগী করে তুলতে আমি কেবলমাত্র সত্য তথ্যেরই প্রলেপ দিয়েছি—এঁকেছি একেবারে হুবহু ছবি।

এই তথ্য ও চিত্রের অন্তরালে একটা সুবৃহৎ ঐতিহাসিক তত্ত্ব রয়েছে। পড়তে পড়তে যদি সেই তত্ত্বটি পাঠক পাঠিকার মনে ছায়াপাত করে, তবেই বুঝব যে আমার পরিশ্রম সফল হয়েছে। ইতি—

গ্রন্থকার

এই লেখকের লেখা অন্যান্য উপন্যাস

চর কাশেম

পদ্মদীঘির বেদেনী

জোটের মহল

ভাঙছে শুধু ভাঙছে

দক্ষিণের বিল, ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

একটি সংগীতের জন্মকাহিনী (যন্ত্রস্থ)

কনকপুরের কবিতা (যন্ত্রস্থ)

শুধু একটুখানি নুন (যন্ত্রস্থ)

দীনু আজকাল বিপ্রপদর নিতান্ত মুখাপেক্ষী, নইলে সে কি ছাড়ত অশ্বিনীকে ! সে মুখে চুপ করে থাকলেও মনে মনে টগবগ করতে থাকে।

তা ঠিক ... ন্নর মত ছোঁ মেরে কয়েকটা পান মুখে পুরে অশ্বিনী করেছে।' কমল... দিয়ে হয়।

টেনে এনে বিপ্রপ... য়ে ওঠে। বেলা হয়েছে, কবাড়ী একটু ঘুরে আসবে।

রক্তমুখো...র এই এক বাড়ীতে হাত পাতা যায় !

কমলকামিনী বলেন, 'রাজু ভিক্ষে নিয়ে যাও। যে কদিন আছে সে কদিন দেব, তুমি লজ্জা করে আবার ত্যাগ করে যেও না।'

এবার রাজু অন্ধ চোখ জোড়া নিমেষে পালটে চক্ষুষ্মান চোখ জোড়া কমলকামিনীর দিকে তুলে ধরে। সে জোড়াও প্রাচীন তবু আর্দ্র হয়ে ওঠে। 'মা, এ কথা সবাই বুঝলে এ বয়সে আর লোক ঠকিয়ে বেড়াতে হত না।'

'তোমার যেদিন অসুবিধা হবে, এখানে নেমন্তন্ন রইল,—তুমি বেত দিয়ে আমার ডালা কুলো বেঁধে দিও, তোমার রুজি পুষিয়ে যাবে।'

'আচ্ছা মা, আচ্ছা। এখনও আমি চোখে যা ঠাহর পাই তাতে ও-সব কাজ করতে পারি, কিন্তু নিত্য ও-কাজ কে দেবে বলো ?'

রাজু ও কমলকামিনীর কথা বিপ্রপদ শোনেন না।

এই যে অজস্র পান তামাক তিনি খরচ করতে পারছেন এর জন্য মনে মনে স্ফীত হয়ে ওঠেন। যে যা পারে সে তা খেয়ে যাক, নিয়ে যাক, এতে তার সৌভাগ্যের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। বিনিময়ে তিনি অর্জন করবেন সম্মান। পয়সা দিয়ে মানুষে আর করে কি ! আর বছরে কটাকাই বা তাঁর পান তামাকে খরচ ! পানের ত একটা 'বর' করেছেন পুকুর পাড়ে। এ সন অনেক তামাকও হয়েছে তাঁর ক্ষেতে। তিনি হিসেবী লোক। সারা বছরের খরচটা দিয়েছেন একেবারে মাটিতে ছড়িয়ে। বছর অন্তর তা ফলে ফুলে লতায় পাতায় ভরে উঠবে। তাঁর লোক-জনের তো অভাব নেই। তারা বসে বসে করবে কি ?

জাল বুনতে বুনতে কখন যে বেলা দ্বিপ্রহর হয় তা বুঝতে পারে[illegible] বিপ্রপদ। তিনি বাড়ী থেকে যাওয়া[illegible] জালখানা শেষ [illegible] যেতে চান। জাল বুনতে, মাছ ধরতে [illegible] চির[illegible] বিদেশে বসে বড় একটা সুযোগ হয় না, সম্মানও থাকে [illegible] যারা আছে তারা তাঁরই বোনা জাল দিয়ে যে মাছ ধ[illegible] কলরব করবে—এ তাঁর ভাবতেও ভাল লাগে।

'তুমি কি ছুটি নিয়ে এসে তু[illegible] সুস্থ থাকতে পার না। [illegible] কোথায় সে দিকে কি লক্ষ্য আছে? এখন ওঠো, স্নান করতে যা[illegible] তোমার জন্যে আর সবাই কতক্ষণ বসে থাকবে?'

'তাই তো, সত্যিই অনেক বেলা হয়েছে দেখছি।'

'ছাই দেখছ! কৃষাণ মজুরের ছুটি না নেওয়াই ভাল।'

'[illegible] ঠিক। এখন তেল গামছা দাও।' বলে বিপ্রপদ 'চারি[illegible] চেয়ে দেখেন, কেউ নেই। 'তোমার মুখের কথা অক্ষয় হক, আমি সত্যি সত্যি কৃষাণ মজুরহতে পারি।' হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে, নাটম[illegible] খাটটার ওপর। নিতাই সরদার চিৎ হয়ে পড়ে আছে। 'ও কি, [illegible] যে তুমি যাওনি, তোমার কোনও অসুখ-বিসুখ করেনি তো?'

সে ম্লান হাসি হেসে বলে, 'না না। তবে কি জানেন বাবু, [illegible] কাছে একটা নালিশ আছে।'

'কি নালিশ?...থাক, সে সব পরে হবে। [illegible]খন এত বেলা তখন এখানেই নেয়ে-খেয়ে নেও। বড়বৌ, দুখানা গামছা আর কাপড় পাঠিয়ে দাও। নিতাই এস, এস।'

...

খাবার ঘরে দুখানা পিঁড়ি মুখোমুখি পাতা হয়েছে। নিতাই নাপিত। সে বিপ্রপদর সুমুখে বসে খেতে কুণ্ঠা বোধ করে।

কমলকামিনী বলেন, 'আরে বসে পড় সরদারের পো। উ[illegible]

'বড্ড তো নিরীহ !'

'নাই দিয়ে দিয়ে তুমি ছেলেটার মাথা খেলে।'

'তা তো ঠিক ! দেখ না, অমরেশের পোষা হাঁসজোড়ার কি দশা করেছে।' কমলকামিনী এক জোড়া মৃতকল্প হাঁস বনের মধ্যে থেকে টেনে এনে বিপ্রপদর সুমুখে ছুঁড়ে দেন।

রক্তমুখো ছেঁড়া-খোঁড়া হাঁস দুটোকে দেখে বিপ্রপদ বিস্ময়ে পিছিয়ে যান।

ছেলেরা আবার একে একে গিয়ে খালপারের গাব গাছটার তলে জমা হয়। ভামটার কান ধরে কেউ টানে, কেউ বা ঠ্যাং ধরে, কেউ কেউ আবার গায়ে হাত বুলায়। কি নরম, কি তুলতুলে ! ওটা বিরক্ত হয়ে চোখ বুঁজে থাকে। কেউ একান্ত ব্যথা দিলে চোখ মেলে দাঁত খিঁচোয় !

'দেখ রে শালার গোঁফ জোড়া।' হরেন বলে, 'বুড়ো, তোমার বয়েস কত ?'

'কি গো বাঘের মাসী, এখন কেমন ? খাবে আমার হাঁস ? বড্ড নরম মাংস, না ? এখন তবে হাঁস-ফাঁস করছ কেন ?' অমরেশ বলতে বলতে একটা চড় মারে।

জন্তুটা খেঁকিয়ে ওঠে।

এখন পর্যন্ত যারা ভামটা দেখেনি, তারা ছুটে আসে। একটুখানি মাণিকটা ভিড় ঠেলে দেখতে না পেয়ে কেঁদেই ফেলে। ক্রমশ দেখা যায় প্রবীণরাও এসে ভিড় করছে—প্রশ্নও করছে দুচারটা। মন্তব্য করতেও কসুর করছে না। তখন ছেলের দল অন্য দিকে সরে পড়ে।

তাদের সমস্যা, এখন এটাকে নিয়ে কি করা যায় ?

একটা শটি বন ভেঙে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছেলেরা সব গিয়ে বসে পড়ে, এ স্থানটা বেশ আবডাল। মন্ত্রণার চমৎকার স্থান বটে।

একটা মাটির খোপ থেকে ভামটাকে টেনে বের করে তার মুখের কাছে দুধের বাটিটা ধরে। পূর্ণপাত্র দুধের দিকে একবার মাত্র চেয়ে ভামটা চোখ বোঁজে। উজ্জ্বল আলোটা বোধ হয় সহ্য হয় না। অনেক চেষ্টার পর দুধ না খাওয়াতে পেরে অমরেশের রাগ হয়। সে ভামটার মুখ দুধের মধ্যে থুবড়ে ধরে। তবু সে অভিমানে মুখ বেজার করে থাকে। তখন উপায়ান্তর না দেখে বাটি শুদ্ধ দুধ হেঁচকে ফেলে দিয়ে ওটাকে সাবধানে খোপে রেখে ওরা চলে যায়।

বিমলা গোপনে থেকে সব দেখছিল—সে ছুটে গিয়ে সংবাদটা বেশ ফলাও করে কর্ত্রীমহলে প্রচার করে। ফলে নেপথ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন শোনা যায়। অমরেশ ও বিন্থ পুকুরঘাটে বাটিটা ও ডিবাট্টা রেখে পালিয়ে আসে। এবং বাড়ীর অনেকগুলো বিছানার মধ্যে কোথায় গিয়ে যে অন্ধকারে চুপ করে শুয়ে থাকে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেক রাত্রে যখন অপরাধীরা ধরা পড়ে তখন তারা সকল শাসনের বাইরে— গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

খুঁজতে খুঁজতে কমলকামিনী অমরেশকে পান শিবপদর বিছানায়। 'কি করি বলো তো ঠাকুরপো, ছেলেটা তো একেবারে ডানপিটে হয়ে গেল। একটা মাত্র ছেলে, তাও যদি মানুষ না হয়, তবে কি যে-সে দুঃখ! গত জন্মে কত যে পাপ করেছি তাই এ জন্মে পেটে ধরলাম একটা ব্যাধ। কেবল শিকার—শিকার! হয় পাখী, না হয় পশু, না হয় মাছ। আচ্ছা ঠাকুরপো, যে কদিন বাড়ী আছি একটু ভাল লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করা যায় না? এর পর গিয়ে ওঁকে ধরে মফঃস্বলের বাসায় যা-হোক একটা ব্যবস্থা করাব।'

'কি করব বৌঠান? আজ না হক কাল, কি দুদিন বাদে আমারও যে ঐ এক সমস্যা। পণ্ডিতের কাছে আর কদিন পড়বে বিন্থ?'

'তা ঠিক। বাড়ীর সব ছেলেদের জন্যই এখন থেকেই তোমাদের

ভাবা উচিত। তোমাদের মান সম্মান সবই মিথ্যা যদি সন্তান মুখ্যু হয়। রাগ করো না ঠাকুরপো, তোমাদের এদিকে একটু লক্ষ্য কম।'

'রাগ করে করব কি? আমরা তো সব মূর্খের দল। আমাদের মধ্যে দাদাই যা শিখেছেন।'

'তোমার দাদাকেই বা কি বলব? যেখানে থাকেন সে-টা একটা অজ পল্লীগ্রাম। না আছে ইস্কুল, না আছে কোন পড়াবার সুবিধা। শুধু নদীর পারে আছে একটা কাছারীবাড়ী, পাইক পেয়াদা গোমুখ্যুর দল।'

'সে খবর তো আমি জানি। তবু দাদাকে বলা ছাড়া উপায় কি?'

অমরেশ নড়ে উঠতেই কমলকামিনী উঠে দাঁড়ান। তিনি নিজের শয্যার দিকে চলতে চলতে ভাবেন: ওই তো একটি মাত্র ছেলে। ওকে মানুষ করতেই হবে। নইলে সবই আঁধার। মিথ্যা হবে এই চোখ-ঝলসান বৈভব। একটা নতুন ধারার ওই হচ্ছে প্রথম পুরুষ। ওর পায়ে-চলার পথ ধরে চলবে পিছে আসছে যারা। তাই তো ওকে চালাতে হবে ঠিক পথে—জ্ঞানের পথে। তাঁর বহু আরাধনার সোনার চাঁদ, বুকের রক্ত, দেহের নির্যাস। এই যে দুলে রয়েছে তাঁর বুকে যদি একটু পাগল হয়, দুরন্ত হয়—তবে কি করতে পারেন তিনি? বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হিতোপদেশ দিয়ে ওকে পথে আনতে হবে। খাটতে হবে ওঁর পিছে। বিপ্রপদর কাছে বলে হবে কি? বহির্মুখী যাঁর মন, তাঁকে এখন বলে কোনই লাভ নেই, সময় মত উসকিয়ে দিলেই চলবে। তিনি ঘুমন্ত ছেলের মুখে কটা ঘন ঘন চুম্বন করেন, একটু চেপে ধরেন বুকে।

রাত্রে আর ভাল ঘুম হয় না। শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখেন কমলকামিনী: গৈরিকবসন পরে শ্রীমান যেন যাচ্ছে কোন এক তপোবনে পড়তে। চুড়া করে তার চুল বাঁধা, বগলে তালপাতা, হাতে ঝুলছে মসীপাত্র। ব্রহ্মচারী বালক হাসতে হাসতে দুলে দুলে চলে—সংগে চলে তার সহচর ছায়াটি।

ঋষির সুমুখে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ করেন—'জয়োঽস্তু বৎস ! তুমি কি চাও এখানে ?'

'আমি তোমার কাছে লেখাপড়া শিখব, এই নতুন তালপাতা কেটে কেমন আমাকে গুছিয়ে দিয়েছেন মা।'

'তোমার নাম ?'

অমরেশ যেন নিজের নামটাই ভুলে গেছে। স্মরণ করতে দেরী হয় তার।

'তপোবনের ছেলেরা ওর ভাব দেখে খিলখিল করে হেসে ওঠে। অমরেশ কেঁদে ফেলে।

ছেলেরা আবার হেসে ওঠে।

লজ্জায় দুঃখে অমরেশ মা মা বলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে। কমলকামিনী ত্রস্তে যাকে দু হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন, সে তাঁর কাল্পনিক অমরেশ নয়।

আর ঘুম আসে না কমলকামিনীর। তিনি শুয়ে শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন। এই যে ছেলে কোথায় ছিল, কেমন করে এলো তাঁর কোলে ? এদের আবার সংসার হবে, বৌ আসবে, নাতিনাতনীতে ভরে যাবে ঘর। কত নতুন নতুন মুখ—একটা যেন পাঠশালা বোঝাই ছেলেমেয়ে। কত হবে বিবি, তাদের জন্য খুঁজতে হবে কত সাহেবসুবা। তারাও আবার বড় হবে, চলে যাবে এক এক করে। আসবে আর এক দল।...তিনি আর ভাবতে পারেন না। এতগুলো ছোট বড় নানা-রকম মুখ মনে রাখতেও যেন কষ্ট হয়। তিনি আবার পাশ ফিরে অমরেশের গায় হাত দেন।

'মা, রাত কতক্ষণ ? এখনও তুমি ঘুমোওনি ?'

'অমরেশ, একটা কথা শুনবি বাবা ?'

'কি কথা মা, গল্প বলবে ?'

'না। আমার একটা কথা শুনবি ?'

গল্প ছাড়া এমন কি কথা হতে পারে! অমরেশ কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে, 'শুনব, বলো।'

'আচ্ছা, তোমার মাকে যদি কেউ মারে ?'

'বাঃ রে, কেন মারতে যাবে আমার মাকে ?'

'তুই তবে কেন মারতে গেলি বুনো ভামটাকে ? ওরও তো দুটো বাচ্চা আছে ?'

'ও আমার সখের হাঁস খেলে কেন ?'

'যার খাদ্য সে খাবে, তাই বলে কি তুই তাকে মারবি ?'

বালক এবার আর উত্তর দিতে পারে না।

'আমাকে যদি মেরে কেউ বেঁধে নিয়ে যায়, তোর কেমন লাগে বল তো ?'

অমরেশ চুপ করে মার বুকের কাছে এগিয়ে আসে। কমলকামিনী বুঝতে পারেন ওষুধে ক্রিয়া হয়েছে। তিনি আর ওকে বিরক্ত করেন না।

সকাল বেলা ফলস্বরূপ দেখা যায়, অমরেশ ভামটাকে বাঁশবাগানে নিয়ে গিয়ে মুক্তি দিয়েছে।

কিন্তু ভামটার সে কথা মনে থাকে না। সপ্তাহ কয়েক যেতে না যেতেই অমরেশের হাঁস পায়রা প্রায় সাবাড় করে আনে। সে কি সংঘবদ্ধ আক্রমণ!

অমরেশের মার ওপর রাগ হয় না, রাগ হয় শান্তিরামের ওপর। সেই টিকিওয়ালা ঝুনো নারকেলটার বুদ্ধিতেই আজ এই দশা। সে যদি হাতের কাছে পেতো টিকিটা ধরে তার টেনে দিত! কিন্তু তাও বুঝি সে পারত না। মোড়ল ছেলের টিকি ধরলে সব বন্ধুরা তাকে একঘরে করবে যে!

অতএব তার চোখে জল আসে।

অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে স্বামী স্ত্রীরও যেন কাজ বেড়ে চলেছে। শুধু কাজ আর কাজ। দুজনার ঘরে বাইরে একটুও জিরেন নেই। জিরেন চানও না। এক মুহূর্ত বসে থাকলে মনে হয় যেন কত কি ক্ষতি হয়ে যাবে। এদিকে কাজ, ওদিকে কাজ,—যেন কাজের স্রোতে বান ডেকেছে। ওঁরা বসে থাকবেন কি করে? সেই জন্যই এ বাড়ীর কেউ বসে থাকে না। বৌ ঝি কামলা মজুর কেউ ফাঁকি দেয় না সংসারকে। এ বাড়ীতে অহোরাত্র যেন সমারোহ চলেছে।

বিপ্রপদ ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছেন—এ ছুটি তাঁর আলস্যে গা ঢেলে দেওয়ার জন্য নয়। তিনি এক মনে আরো কাজ করে যাবেন। দুটো মেয়ে বড় হয়েছে, তাদের বিয়ে দেবেন। পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করবেন। কতক ভাল ধানী জমি এখনও খরিদ করতে পারেননি, তা করা একান্ত দরকার—আরো কত কি যে বাকী।

'বিপ্রপদ, একটু উঠে শুনে যাও, বিশেষ একটা জরুরী কথা আছে।'

আজ হাট বার কিনা। অন্য কেউ না জানলেও বিপ্রপদ জানেন জরুরী কথাটা কি। তিনি একটু হেসে জবাব দেন, 'এই এখানে এসেই বলুন না দীনুদা, এখন তো কেউ নেই এখানে।'

জরুরী কথাটা দীনু বলতেই পারে না। ইতিমধ্যে এক দল শেখ মুসলমান এসে উপস্থিত হয়। বিপ্রপদকে আদাব জানাতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে তাদের বসতে আপ্যায়ন করেন। আনতে বলেন পান তামাক।

এই পান তামাক দেওয়ার প্রথাটা যে এদেশে কত কাল ধরে প্রচলিত তা এরা কেউ জানে না। শিশুকাল থেকে দেখে দেখে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। খরচ অতি সামান্য, কিন্তু এইটাই গ্রাম্য ভদ্রতার মানদণ্ড। সেই পান তামাক তখনই আসে।

তামাক টানতে টানতে ইছমাইল মিঞা বলে, 'এখন কও না—এমন যে
দলের ভিতর থেকে আর এক জন জবাব দেয়, 'তুমি হইছ একটা সরদার, তুমিই মেয়া ছাহেব, তুমিই কও না!'

দীনু এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল—সে প্রলুব্ধের মত ওদের এক পাশে একটা বেঞ্চে এসে বসে পড়ে এবং তার নিজের জরুরী কথাটা আপাতত ভুলে যায়। ধোপাবৌর পেট ব্যথা থেকে মহেশ্বর মুদীর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত—গ্রামের এমন কথা নেই, যাতে না এই রোগা কালো বামুনটির স্বার্থ আছে! বড় বড় বাড়ীর বিষয় হলে তো সবিশেষ ভাবে জানাই দরকার। কখন কোনটা কি কাজে লাগে বলা যায় না তো!

বৃদ্ধ ইছমাইল মিঞা তার মুখের স্থূল রেখাগুলো কুঞ্চিত করে বলতে আরম্ভ করে, 'শ্যান মশাই নাকি তার এদেশী তালুকটা বিক্রি করবে। পাইকপাড়ার ঘোষালরা তিন হাজার টাকা বহায় দিতে চায়, ও-পাড়ার এন্তেজদ্দিও নাকি ওৎ পাতিয়াই আছে, কিনবে বইল্যা। ঘোষালেরা এখন পড়তা পড়ছে। ভাই ভাইও ঘোর বিবাদ লাগছে—একেবারে বিষম বিবাদ। ওরা তালুক কেনবে এইডা।' বলে ইছমাইল মিঞা সভাস্থ সকলকে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। 'ওরা গ্রামের ভিতর মিথ্যা ওজন রাখছে। তবে এন্তেজদ্দি কিনলেও কিনতে পারে। ওডা টাকার কুমইর। ওর—'

ইমাম উত্তেজিত হয়ে বাধা দেয়! 'ঐ এন্তারে দিমু তালুক কেনতে? আমার জান থাকতে? তয় বাবুর কাছে আইলাম ক্যান?'

ইছমাইল মিঞা বলে, 'তোর সাথে না হয় বিবাদ আছে ঐ এন্তেজদ্দির, তাতে স্যানেগো কি? তারা যেখানে টাকা বেশী পাইবে সেইখানেই নিকা বইবে। ইমামের জন্য স্যানেগো বড় মাথা ব্যথা!'

ইমাম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। 'কি, এত দিন যে ওনাদের খাজনা দিলাম, সেলাম দিলাম তা কি হইবে মিথ্যা? আচ্ছা, দেইখ্যা নিমু, মা-ঠারইণ তো বাঁচাইয়া আছেন এখনও।'

চুপ কর—না হইলে আমরা উঠি। কথাডাই কইতে দিলি না!'

'না, না, কও মেয়া ছাহেব। পরাণডা আমার ফাইট্যা যায়, তুমি গোসা হইও না, তুমিই কও।'

এখানে সামান্য একটু ইতিহাস বলা দরকার।

এন্তেজদ্দি ইমামের বৈবাহিক। ইমাম তার বড় মেয়ে নূরবানুকে বিয়ে দিয়েছিল এন্তেজদ্দির ছেলের সংগে। সখ করে তার স্নেহের নুরবানুকে অল্প বয়সে তুলে দিল বড়লোকের ঘরে। মেয়েটার ছিল স্বাস্থ্য ভাল। একটা ছেলে হলো চোদ্দ বছরে। তারপর তাকে ধরল সূতিকা জ্বরে। মেয়েকে ওঝা বৈদ্য দেখাবার জন্য অনেকবার যায় ইমাম নৌকা নিয়ে। কিন্তু বারবার ও ফিরে আসে। কত কান্নাকাটি সাধাসাধি তবু টলে না, একটুও গলে না এন্তেজদ্দির পাষাণ প্রাণ। তখন তার ঘরে ধান উঠেছে। বৌ না থাকলে সামলায় কে? বধূর অসুখ না আর কিছু। সকলই তার ভাণ, কাজ না করার অছিলা।...*কিছু দিন পরে শোনা যায়, বৌ নিতান্ত* অবাধ্য। কেবল বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্যান প্যান করে। কোলের ছেলেটা যায় হঠাৎ মারা। প্যানপ্যানানি আরো বাড়ে।...তারপর এক দিন-ইমামের স্নেহের নুরবানুর মৃত্যু-সংবাদ আসে। এন্তেজদ্দির গ্রামের লোকে বলে: ওরা বাপ বেটায় মিলে নাকি বৌটাকে কাঁথা চাপা দিয়ে বাপের বাড়ীর কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। তা না হলে স্বাভাবিক মরার অমন চেহারা হতে পারে না। কেউ ভয়ে পুলিশে খবর দেয় না, কারণ ওদের নাকি যথেষ্ট টাকা। ঘটনাচক্রে ইমামও সে দিন বাড়ী ছিল না—থাকলে সে একবার দেখে নিত। সেই অবধি ইমামের কলিজাটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ ইছমাইল মিঞার বক্তব্য: তারা বিপ্রপদর এক গ্রামের বাসিন্দা। পুরুষানুক্রমে তারা মেলামেশা করে এসেছে বোসেদের সংগে। তাই একটা স্নেহ মায়া মমতায় জড়িয়ে গেছে সকলে। সম্পত্তিটা দেশী। হিন্দু-

মুসলমানে আদাব দেবে—ডাকলে কেউ না এসে পারবে না—এমন যে ঘোষালেরা, তারাও করবে মাথা হেঁট!' 'এ তালুক না রাখবু, একটা রাজত্তো এক্কেবারে রাজত্তো!'

বিপ্রপদর চোখ জোড়া লোভে জ্বলজ্বল করে ওঠে। তবু তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কেউ রাখ না কেন—তোমাদের স্বজাতির মধ্যে তো এস্তেজদ্দি ছাড়াও পয়সাওয়ালা লোক আছে।'

খালের এ-পারে তেমন লোক নেই এক ইছমাইল মিঞা ছাড়া। কিন্তু সে বৃদ্ধ, তার ছেলেমেয়ে নেই। কে রক্ষা করবে এবং খাবেই বা কে সম্পত্তি? বড় খালের ও-পারের কেউ এ সম্পত্তি খরিদ করে এটা তাদের বাঞ্ছনীয় নয়। এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের বাসিন্দাকে আদাব দিতে যাওয়া নিতান্ত লজ্জাজনক। যদি বিপ্রপদ টাকা চালাতে না পারেন—সর্বদা তো নগদ টাকা হাতে থাকে না, এরা ধার দিতেও প্রস্তুত এবং সে টাকা যেদিন ইচ্ছা তিনি পরিশোধ করেন যেন, তবু সম্পত্তিটা খরিদ করে সকলের মান রক্ষা করুন, এই তাদের ইচ্ছা।

'কত টাকার দরকার?'

'হাজার পাঁচেক!'

'পাঁচ হাজার!'

ভয়ের কিছু নেই। জীবনে এক দিন মাত্র একটা কাজ করে রাখবেন—ছেলেমেয়ে তা বসে বসে ভোগ করবে। নিরাপদ রইল তাদের ভবিষ্যৎ—এ গ্রামের হিন্দু মুসলমানেরও মুখ উজ্জ্বল হল। 'বাবু, তুমি ভয় পাইও না, এই বুড়ার কথাডা লও, রাখো যাইয়া তালুকটা।'

এতক্ষণ পরে দীনু একটা ওজন করে কথা ছাড়ে: 'বিপ্রপদ, টাকায় সুযোগ আনতে পারে না, সুযোগ আনে ভাগ্যে। তবে বিবেচ্য, তুমি থাক বিদেশে, মহাল রক্ষা করবে কে?'

প্রাচীন ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চকণ্ঠে দীনুকে এমন একটা তাড়া দেয় যে, সে

ভয়ে উঠে দাঁড়ায়। ‘রাখেন আপনার মাইগ্যা কথা। আমরা বাধ্য থাকলে একটা মাগীতেও রাখতে পারে এ তালুক। চেনেন না ইছমাইল শিকারে—শোনেন নাই তার নাম ?’

দীনু এবার একেবারে বিপ্রপদর কাছ ঘেঁষে এসে বসে। ‘তবু না ভেবে-চিন্তে কিছু করা যায় না, উচিতও না। আমরা হিতকাঙ্ক্ষী, ওর টাকায় এবং আমাদের টাকায় প্রভেদ কি ?’ তার হিংসায় না কিসে যেন বুকটা টন টন করতে থাকে। ‘আজ বিপ্রপদ নিঃস্ব হলে আমরাও নিঃস্ব হব। দু চার টাকা যে হাওলাত বিলেত পাবো, সে আশাও আর থাকবে না। আমরা কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষী।’ দীনু নিতান্ত অচল। একটি একটি করে প্রায় পঞ্চাশটি টাকা এ যাত্রা ও এই সংসার থেকে ধার বলে নিয়েছে, কিন্তু আর ফিরিয়ে দেয়নি। ওর রীতিমত ভয় হয় যে, বিপ্রপদর এতগুলো টাকা হাতছাড়া হলে ওর উপায় হবে কি ?···সে ছাড়া, যদি এই তালুকটা বিপ্রপদ কিনতে পারেন, তবে আর একটা বিপদে পড়বে এই দীনু। বাকী বকেয়া পাওনাগুলো কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে তাকে। সেনেরা ওকে ‘না-দিল্’ বাদশা খেতাবী দিয়েছে। সে খেতাবী টিকবে না বিপ্রপদর কাছে। টাকার জোরে আর্জি দিয়ে সব পাওনা উসুল করে নেবেন। দীনু উপায় চিন্তা করে, কি করে উদ্যমটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যায়। ‘শুনলাম নাকি তালুকটার ওয়ারিশ সব নাবালক। কেমন করে হবে দলিল ?’

‘কাগজ-পত্র দেইখ্যা উকিলের পরামর্শ লইয়া তবে তো বাবু টাকা দেবেন—সে জন্য আপনার মাথা ব্যথা ক্যান ?’

বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, ‘মুনাফা কত ?’

‘তিনশ টাকা।’

‘সদর খাজনা ?’

‘তিনশ।’

'খাজনা মুনাফা সমান। লাভ সম্মানটাই।'

কিন্তু কতগুলো টাকা! এক সময় গুণে দিতে হবে—থাকে থাকে। সঞ্চয় করতে কত দিন কেটে গেছে। কত অনাহার কত অনিদ্রা গেছে দেহের ওপর দিয়ে। এ সব সম্পত্তি কষ্টার্জিত টাকায় কেনা চলে না। বিপ্রপদর মুখের চেহারা শুষ্ক হয়ে আসে, জিভ ভিতরে টেনে যায়।

দীনু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মুসলমানরা নিভে যেতে চায়।

বিপ্রপদ বলেন, 'আজ না হয় ওঠা যাক, আর এক দিন এস। এ তো টাকা পয়সার ব্যাপার, চিন্তা না করে বলি কি!'

'আচ্ছা, বিষয়ডা একটু ভাইব্যা দেখবেন—আদাব আদাব।'

'আদাব, আবার এসো, বুঝলে?'

'বিপ্রপদ এবার—'

'কি?'

'আজ হাট বার, দুটো টাকা ধার দাও। জানই ত আমার—'

বিপ্রপদ অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি করবেন?'

'আসছে হপ্তায় শোধ করে দেবো।'

অন্য দিন হলে তিনি একটু হাসতেন। দু-একটা রসিকতার কথাও হয়ত বলতেন। কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি দুটো টাকা বের করে দিয়ে ওকে বিদায় করে দেন।

স্বদেশে স্বগ্রামে তালুক। অহংকারী ঘোষালেরা প্রজা। গুরু পুরুত পাড়াপ্রতিবেশী তটস্থ। দেশের উত্তম অধম জনসাধারণ জোড়হাতে দণ্ডায়মান। প্রলোভন—ভীষণ প্রলোভন! এ সুখের তুলনায়, এ সম্মানের কাছে, আর্থিক ক্ষতি অতি সামান্য। যে দেশে তিনি দীন-

দরিদ্র বলে পরিচিত ছিলেন এই সেদিন প...—সেই দেশের রাজা হবেন! যেন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর! কল্পনায়ও কি সুখ! আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের উজ্জ্বল হবে মুখ। ভরত লক্ষ্মণের মত ভাইদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে দেশে। এর চেয়ে আর কাম্য মানুষের কি থাকে? তিনি নিশ্চয় তালুক খরিদ করবেন—যত টাকাই লাগুক, ফিরবেন না।

'তুমি যে ওদের ফিরিয়ে দিলে—কিছু ঠিকঠাক তো করে বলে দিলে না? এমন সুযোগ কি তোমার ভাগ্যে আর জুটবে?'

'তোমার কাছে না জিজ্ঞাসা করে—প্রতিবেশী গুরুঠাকুরের পরামর্শ না নিয়ে কি একটা জবাব দিয়ে দেবো বলো তো?'

'তা হলেই তুমি তালুক কিনেছ! সাত কাণ পাঁচ কাণ যত করবে ততই হবে বিঘ্ন।'

'তাহলে কি তোমাদেরও অনুমতি নেব না?'

'না। এ সব কাজ যত গোপনে হয় ততই ভাল।'

'আচ্ছা, তবে তাই হবে।'

'এখন আর দাঁড়িয়ে থেকো না—আজই তো আ... ...মার কথায় বায়না দিচ্ছ না—বেলা হয়েছে, নাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা ক... ...। এস আমার সংগে।' কমলকামিনী আগে আগে চলেন।

ফাল্গুনের উষা...

সবে পাখীরা ডেকে উঠেছে। গাছগুলোর পাতার আড়ালে আবডালে তরল অন্ধকার। এখনও প্রকৃতির দিনের রূপসমারোহ স্পষ্ট হয়নি। যে ফুল শীতের হাওয়ায় ফুটতে পারেনি, তা এই ফাল্গুন মাসে দু একটি করে পাঁপড়ি মেলছে। বোসেদের শীতলাতলার বাগানে একটা মিহি মিঠে

গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। মরা ডোবার বুকে একগুচ্ছ ঢোলকলমীর ফুল ঝুলে পড়ে দুলছে ঐ।

তরল অন্ধকার আরো তরল হয়ে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যায়।

অমরেশ রোজ যেমন ফুল তুলতে আসে—আজও তেমনি এসেছে।

ও কে? রঙিন একখানা গায়ের কাপড় জড়িয়ে ও মেয়েটা দাঁড়িয়ে? যেন তুলি দিয়ে আঁকা! অমরেশ বিস্মিত হয়ে চেয়ে থা... চেয়ে দেখে ওর ফুল তোলার ভংগি। ওর ভ্রূ, চোখের পালক, এলো চু... অপরূপ বলে মনে হয়। রূপকথার কোন বনদেবী নাকি? ফুল তুলতে এলো ওদের বাগানে? অমরেশের গাটা ঝমঝম করে ওঠে।

'কি রে, কেমন আছিস অমরেশ?'

'তু—তুমি সোণালীদি! কবে এলে?'

'কাল রাত্রে।'

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'একটু ফিক করে হাসে মেয়েটি। শুভ্র দাঁতের ওপর এক ঝলক আলো ঝিলমিলিয়ে যায়।

সীঁথির সিঁদুরের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই অমরেশ কি যেন ভাবে। ... হেসে বলে ওঠে, 'ও বুঝেছি, বুঝেছি! গত বছর এমনি দিনে শাঁ... বাজিয়ে উলু দিয়ে...'

'চুপ কর, চুপ কর ডেঁপো ছেলে।' বলে, সোণালী ওর গালে ঠা... করে একটা চড় কশিয়ে দেয়।

আঘাত পেয়ে অমরেশ প্রতিঘাত করতে চেষ্টা করে। 'বলব, এক বার বলব। বিয়ে হয়েছে—শাঁখ বাজিয়ে নিয়ে গেছে।'

'নিয়ে গেছে তো তোর কি? বলবি বল, এই আমি চললাম।'

মেয়েটি চলে যায়। অমরেশ সুর করে তার সাধ্যমত ঐ সব ক... বলে। 'বিয়ে হয়েছে, ওমা কি ঘেন্নার কথা, বিয়ে হয়েছে রে।'

সেদিন অমরেশের ফুল তোলায় আর সুবিধা লাগে না। দু চারটা ঝুরি জবা তুলে সে বাড়ী ফেরে। মনে মনে বলে, আবার যদি ওকে পানে দেখি, দেবো ওর গালে খামচি বসিয়ে।

মেয়েটি পাড়ার এক বামুন বাড়ীর। ওর মা আছে, বাপ নেই। শের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। দেখলে মনে হয়, ওর ভিতর এমন। কিছু জন্মেছে যা বালকের অভিজ্ঞতার বাইরে। মেয়েটি গরীবের— কোথায় যেন কোন দূর দেশে ওর মা ওকে অল্প খরচে এক অপদার্থের হাতে তুলে দিয়ে রেহাই পেয়েছে।

দুদিন বাদে ফের দেখা। এবার সুপারি বাগানের নির্জন পথে। বেলা আর নেই। পড়ন্ত রোদ ক্রমে ম্লান হয়ে আসে শিমুল গাছের শাখায়, চূড়ায়। লাল ফুলগুলো আরও রক্তাভ হয়ে ওঠে। ওরা লজ্জায় যেন অন্ধকারে লুকিয়ে যাবে। ম্লান আলো বাঁশ বাবলার ফাঁকে ফাঁকে কাঁপতে থাকে। গরুগুলো গ্রাম্য পথ ধরে বাড়ী ফিরছে। দু একটা লতাগুল্মও খাচ্ছে পথের পাশের।

'এত রাগ যে, আমাদের বাড়ী একটি বারও যেতে পারলিনে। আচ্ছা, দেখা যাবে অমরেশ। এক মাঘে শীত কাটে না।'

'তুমিও তো আসোনি ফুল তুলতে এ দুদিন। আমি রাগ করেছি না হাতী! আমার অত রাগ নেই।'

'বেশ, তা হলে কাল যাস আমাদের বাড়ী।'

'নিশ্চয় যাবো। কিন্তু ফুল তুলতে আসতে হবে তার আগে—কাল সকালেই।'

'না ভাই। মা বারণ করে। বলে, বড় মেয়ের অত ফুল তোলার বাই কেন?' 'বড়' কথাটা উচ্চারণ করে সোণালী নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে।

অমরেশ ওর অপাংগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কত বড় হয়েছে তা পরিমাপ করতে চেষ্টা করে।

'বড় হলে ফুল তুলতে বারণ—এমন কি বড় হয়েছ তুমি ?' সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। 'এই তো এইটুকু—ও আবার বড় !'

সোণালী একটু সরে যায়।

'তুমি কাল এসো, বারণ না ছাই !'

অগত্যা সোণালী জবাব দেয়, 'আচ্ছা, আসব খুব ভোরে আবার ফিরেও যাবো সকাল সকাল, মা ঘুম থেকে ওঠার আগে।'

'তাই বেশ, তাই খুব ভাল, টের পাবে না কেউ। একেবারে খুব ভোর বেলা উঠে এসো।'

কথায় কথায় সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসে।

'তুই আমায় একটু এগিয়ে দিবি অমরেশ ?'

'দেবো।'

'তোর ভয় করবে না ?'

'ভয় কিসের, এটা তো আমাদের বাগান।'

কতটুকু এগিয়ে গিয়েই একটা ছোট খাল। খালটা ছোট কিন্তু বেশ গভীর। পূর্ববাঙলায় এমনি খাল বাড়ী ঘরের আনাচে-কানাচে। যখন জোয়ার আসে তখন জল থৈ থৈ করে, আবার ভাঁটার টানে শুকিয়ে যায়। খালটা পারাপারের জন্য একটা সাঁকোর বদলে এক খণ্ড সুপারি গাছ দেওয়া ছিল। একে বলে 'চার'। সেই 'চারটা' জোয়ারের জোরে ভেসে গেছে। হয়ত পূবটানে, নয়ত পশ্চিমে।

'এখন উপায়, পার হব কি করে ?'

'এই এমনি করে।' অমরেশ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ স্থানটা এক লাফে পার হয়।

'আমি তো পারব না অমরেশ।'

'খুব পারবে—একটু হাতখানা এগিয়ে দাও, আমি ধরি, তুমি এবার লাফ দাও।'

কথিত প্রণালীটা মন্দ না। সোণালী ধারে হুড়মুড় করে গিয়ে অমরেশের গায়ের ওপর পড়ে। খানিকটা শাড়ী ভিজে যায়। তারপর সে কি হাসাহাসির পালা! একটা নরম স্পর্শে অমরেশের দেহটা কেমন করে ওঠে যেন। সোণালী তো ওকে অনেকক্ষণ এমনিই জড়িয়ে ধরে থাকে! শেষে অমরেশ একটু বিরক্ত হয়েই ছিন্ন করে ওর নাগপাশ।

ফেরার সময় অমরেশ ভাবে, কাল কি কি ফুল তুলবে।

৬

ঘোষালদের বৈঠকখানা। দীনু অপেক্ষা করছে।...

একটা ভাঙা টিনের ঘর, পুরোনো সুঁদরী কাঠের ঘুণে-ধরা খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে যেন শেষ নিশ্বাস ফেলছে। কতক্ষণে যে এ ধুঁকুনি শেষ হবে তার জন্যই যেন অপেক্ষা। আলমারীটার ওপর শতাধিক বছরের পুরানো অপ্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র-দলিল-দাখিলা। তার ভিতর আরসোলা ও ইঁদুরের বাসা। ইঁদুরগুলো যখন-তখন ছুটোছুটি হুটোহুটি করে। এখন আগন্তুক মানুষটিকে তারা হিসেবেই আনছে না

একখানা ত্রিপদ চেয়ারের ওপর ভারসাম্য করে কোন প্রকারে বসে আছে দীনু। বসে বসে সে কেবলই বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরখানা আঁধার হয়ে এলো। সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ঘোষালেরা তিন ভাই গেল কোথায়? এ সময় ছাড়া দিনের বেলা কোনও জটিল পরামর্শ করায় অনেক বিঘ্ন। কেউ শুনতে পেলে তার কি যে ক্ষতি হবে, তা একমাত্র সে-ই বোঝে!...ঘোষালদের দিয়ে আর যাই হোক, কোনও দিন কারুর আপদে-বিপদে উপকার হয়নি, বা হবে না—এমন মিথ্যা অপবাদ কেউ কখন দিতে পারে না তাদের নামে। বরঞ্চ এই সুখ্যাতিই

তাদের আছে, যে জলে পড়ে,তাকে তারা আর একটু ঠেঁশে ধরে জল খাইয়ে ছাড়ে, আগুনে পড়লে আর একটু ভিতরের দিকে দেয় ঠেলে। পুরুষানুক্রমিক ধারা তারা শত গৃহ-বিবাদেও বজায় রেখেছে। এ সব কাজে তাদের একতার তুলনা কোন স্বাধীন দেশেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এটুকু দীনু জানত এবং ভাল করেই জানত বলে এ বিপদে তাদের শরণাপন্ন হয়েছে।

যখন তিনটি ভাই তিনটি হুঁকো এবং তিনটি লণ্ঠন নিয়ে এই এজমালী বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করল, তখন দীনু তার ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে তিনটি শনিগ্রহকে অভিনন্দন জানায় সে। 'এসো এসো বাবাজীরা, ভাল তো সব, ভাল তো ?'

'এত দিন বাদে যে খুড়োর আবির্ভাব ?' তার পর পৃথক পৃথক তিনখানা আসন গ্রহণ করে তারা। প্রথম গ্রহটি জিজ্ঞাসা করে, অবশ্য খুব নীচু গলায়, 'ব্যাপার কি ?'

'বহু দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, জানতে এলাম কেমন আছ। আর একটু—'

'কাজ আছে।' অপূর্ণ বাক্যটি পূর্ণ করে অপেক্ষাকৃত বয়োকনিষ্ঠ গ্রহটি। বাকী দুটী হেসে ওঠে।

প্রথমটি মন্তব্য করে, 'খুড়ো না ঠেকলে কি এদিক মাড়ায় !'

'ঠেকা তেমন কিছু নয়, তবে কি জানো, বাবা তোমাদের বড্ড ভালবাসতেন। আমি সেই চোখেই তোমাদের দেখি ; কিন্তু অবস্থা সঙিন হলে কোন মায়াই দেখান যায় না, তাই সর্বদা খোঁজখবর নিতে পারিনে। তা বলে তোমরা বুদ্ধিমান, রাগ করবে কেন ? এই দেখ না, প্রয়োজনের সময় খুড়ো ঠিক হাজির।'

'এখন আসল কথাটা কি তাই বলুন।' দ্বিতীয়টি প্রশ্ন করে।

'আপদে-বিপদে চিরকাল তোমরা আমাকে পেয়েছ, আমিও তোমাদের

তজনা করি। তোমাদের সে ধর্ম্মজ্ঞান এখনও লোপ পায়নি।' এবার দীনু কণ্ঠস্বর রীতিমত হ্রস্ব করে। 'ঐ যে সেনেরা না কি তালুক বেচছে, তা তোমরা নিশ্চয় জানো। তোমরা বনেদী ঘর, তোমরা যদি চেষ্টা-চরিত্তির করে না রাখো তবে কোন রাহুর গ্রাসে পড়তে হয় কে জানে! আমাদের শক্তিগড়ের সবাই একবাক্যে প্রার্থনা করছে যে, ঠাকুর যেন ঘোষাল বাবুদের সুমতি দেন—তাঁরাই যেন এ সম্পত্তিটা রাখে। মায় মুদী জোলা তাঁতি পর্যন্ত। সেই সংবাদটা জানাতেই আমার আসা।'

'কেন, তোমাদের বোসেরা তো রয়েছে পয়সাওয়ালা উঠতি ঘর?'

'আরে দূর, দূর! তাদের কি এতে অধিকার আছে? ব্রাহ্মণের অধিকার শাস্ত্রে, বৈশ্যর অধিকার চাষে—ওরা এখনও নিতান্ত চাষা। এত যে পয়সা—এখনও বাড়ীতে একটা চাকর নেই। বাবু নিজ হাতে জাল বোনেন! গিন্নী নিজ হাতে গরু বাঁধেন! তোমরা তা কস্মিন কালে পারোনি বা পারবে না। সত্যি কি না?'

'ওদের মধ্যে কেউ একটা মামলা-মকর্দ্দমা বোঝে? জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করে আজ না হয় বড়টার একটু পদোন্নতি হয়েছে—তা বলে কি প্রজাপুঞ্জ শাসন করার ক্ষমতা আছে ওদের মধ্যে কাউর? এই দেখ না, বাবা গত হবার পরই নিতাই সরদার যেমন একটু অবাধ্য হয়ে এক সন খাজনা বন্ধ করেছে, অমনি তার বিষদাঁত কেমন করে সাঁড়াশি দিয়ে টেনে ধরেছি!' বলে প্রথম গ্রহটি তার আংগুলগুলো বেঁকিয়ে ভংগিখানা দেখিয়ে দেয়।

'হাঃ হাঃ হাঃ!' ছোট দুটি হেসে ওঠে।

'আমরা হিন্দু মুসলমান একত্র হয়েই চাই—তালুকটা তোমরা রাখো।'

তৃতীয় গ্রহটি চোখ দুটো মিটমিট করছিল, বলে, 'দাদা, একখানা

পোষ্টকার্ড ছেড়ে দাও না সেনেদের ঠিকানায়। কথাবার্তাটা একটু পাকা-পোক্ত করে চালাও, তার পর দেখা যাবে। আজ রাত্রেই লেখা [illegible] চিঠি। পোষ্টকার্ড আছে দাদার কাছে?'

'না।'

'মেজদার তহবিলে?'

'উঁহুঁ।'

'আমার কাছেও তো নেই।'

অর্থাৎ থাকলেও কেউ অনির্দিষ্ট একটা এজমালী কার্ডের জন্ত দিতে রাজী নয়।

অবস্থার গুরুত্ব দীনু বুঝতে পারে। একটা হুঁকো এক জনের হাত থেকে টেনে নিয়ে বলে, 'কাল প্রত্যুষে আমিই নিয়ে আসব।'

তা হলে আর চিন্তা কি! তিন ভাই আশ্বস্ত হয়।

অনেকক্ষণ বাদে তামাকে টান দিয়ে দীনুর দম সামলাতে বেশ একটু সময় লাগে। 'তামাকটা তো বেশ!...নিতাই না কি সগ্গে গেছে—অর্থ সাহায্য করছে বিপ্রপদ।'

প্রথম গ্রহটি প্রমাদ গণে, অপর দুটি এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

প্রথমটি তবু আস্ফালন করে, 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। আচ্ছা, দেখা যাবে।'

দ্বিতীয়টি মন্তব্য করে, 'কাঁচা পয়সার ঝন্‌ঝনি কদ্দিন? ও-রকম কত দেখেছি! কত চন্দ্র সূর্য দেখলাম—ও তো কেরোসিনের ডিবা, এক ফুঁতেই ব্যস!'

তৃতীয়টি একটা অসভ্য মুখভংগি করে।

'বিপ্রপদর স্ত্রীকে নিতাই মা ডেকেছে। এখন টাকার জন্ত ও নাকি আর পিছু হটবে না।' দীনু বলে।

'এত টাকার দেমাক! টাকা না হয় চলল, বুদ্ধি দেবে কে? বুদ্ধি...

ও-পারে ঐ শক্তিগড়ে কোন দিন জন্মায়নি, বুদ্ধির ব্যাপারী আমরা, কি বলো দাদা ?'

বড়টি হাসে, না মুখ ভেঙচায়, বোঝা যায় না ঠিক।

'আস্ফালনে লাভ কি বাবাজীরা—ফলেই তো পরিচয়। আচ্ছা, তা হলে উঠি রাত অনেক হলো। কিন্তু যাবো কি করে ? যে অন্ধকার! কোনও আলোর একটু—'

কথাটা কানে যেতেই তিন ভাই তিনটি লণ্ঠন ...মিত করে বাড়ীর ভিতর চলে যায়। কিন্তু যাওয়ার সময় দীনুকে প্রণাম করে যাওয়ার সৌজন্যটা তারা ভোলে না।

দীনু অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে।

পথ চলতে চলতে ভাবে : বুদ্ধির ব্যাপারী কোথায় ? পাইকপাড়ায় না শক্তিগড়ে ?...এরা নিতান্ত স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর। এদের অর্থের সম্বলও অতি অপ্রচুর। এদের ব্যবহার অতি ঘৃণিত। কিন্তু এদের শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে আপাতত তাকেই যুদ্ধ করতে হবে। অন্তরাল থেকে নিক্ষেপ করতে হবে বাণ। আবার বিপ্রপদকেও হাতে রাখতে হবে। তাকেও লেলিয়ে দিতে হবে, আশা দিতে হবে—দিতে হবে উৎসাহ। বঙ্কিমের যদি প্রতিপক্ষ না থাকে তবে গ্রাম্য সাধারণ বাঁচবে কি করে ? বিশেষত দীনুর মত যারা। তাদের আসন উঁচুতে রাখতে হলে এই একমাত্র পথ। দীনু পরিশ্রম করতে পারে না, টাকা পয়সা ক্ষেত খামারও তার নেই। তাকেও তো বাঁচতে হবে। তারও তো সমাদর চাই। মানুষ হয়ে জন্মেছে সে, গরীব বলে কি তার উচ্চাকাংখা উচ্চাভিলাষ থাকবে না ? যত দিন তার বাবা বেঁচে ছিল, সেও এই ভাবেই চলে গেছে—কত ভেদনীতি চালিয়ে গেছে ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে। দীনু বেশী কিছু আশা করে না—শুধু যোগ্য পুত্রের মত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যেতে চায়। শ্রীভগবান যেন তার দিকে মুখ তুলে চান। সে মনে মনে

ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে।...তাকে বহুরূপী হতে হবে। জীবন সংগ্রামে সকলের নীতি এক হলে চলবে কি করে? মানুষে চাষ করে বলদ দিয়ে, সে চাষ করবে মানুষ দিয়ে। তার ক্ষেত্র তাকেই তৈরী করে ফসল বুনতে হবে, করতে হবে অপেক্ষা।

পরদিন সময় মতই দীনু পোষ্টকার্ড নিয়ে উপস্থিত হয়।

বহু গবেষণার পর একটা মুসাবিদা স্থির হয়। মহা উৎসাহে তা মেজো ঘোষাল সাজিয়ে ফেলে পোষ্টকার্ডের অংগ ভরে—সারে সারে। পোষ্টকার্ডখানা লেখা হলে সে নানা সুরে নানা ছন্দে বাকী কটি পরশ্রীকাতর জীবদের পড়ে শোনায়। তারা এমন করে কান পেতে শোনে, যেন মনে হয় কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের গুহ্য ব্যাখ্যা শুনছে।...

একটা তরকারীর ডালা মাথায় নিয়ে সেই সময় যাচ্ছিল নিতাই সরদার হাটে। বৈঠকখানার পাশ দিয়েই পথ।

'কি হে, তুমি না কি মামলায় জবাব দিয়েছ?'

'সময় মত সবই জানতে পারবেন, আমি তো আর অন্যায় করিনি বড় বাবু—আইন আদালতের আশ্রয় নিয়েছি।'

'তবে অন্যায় বুঝি আমাদের? বেশ কথা তো শিখেছ তুমি?'

'আপনারাই তো গুরুমশাই, আমরা আপনাদের ছাত্তর।'

কনিষ্ঠ ঘোষাল বলে, 'গুরুমশাই দেখেছ, কিন্তু তার বেত তো দেখনি—এই লিকলিকে সরু বেত!'

'অত কড়া কথা বলবেন না কত্তা, তা হলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।'

এখানেও একটু টীকার প্রয়োজন—

ছোট ঘোষালের একটি রক্ষিতা আছে। ছোট ঘোষাল তাকে নাকি গোপনেই রক্ষণাবেক্ষণ করে। বেহায়া নিতাই এতগুলো গুরুজনের সুমুখে সেই কথাটারই ইংগিত করল। এমন স্পর্ধা একটা সামান্য প্রজার! ছোট গ্রহটা রাগে গরগর করতে থাকে। কিন্তু

সে আর নিতাইকে ঘাঁটায় না। বলা তো যায় না, বেহায়া কিসে কি বলে বসে।

ভাইয়ের পরাজয়,—বিশেষত কনিষ্ঠ ভাইয়ের। বড় ঘোষালের ক্ষণিকের জন্য মতিভ্রম ঘটে। সে মুক্তকচ্ছ হয়ে পায়ের খড়ম হাতে নিয়ে ছুটে যায়। 'তবে রে শালা—'

দীনুর মনে মনে আনন্দ হয়, কিন্তু মুখে বলে, 'আহা হা, করো কি, করো কি? একেবারে জ্ঞান হারিয়েছ।' সে হস্তক্ষেপ করে থামায় না কাউকে।

'দাঁড়া, তোকে আজই শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি—কাকের ওপর আবার কামান দাগাব কি!' এবার ছুটে যায় প্রবীণ উকিল মেজ ঘোষাল। বিদ্বান মানুষ—বিদ্যার টাল সামলাতে না পেরে গিয়ে পড়ে নিতাইয়ের ওপর হুড়মুড় করে।

দীনু কৃত্রিম অস্থিরতা দেখিয়ে বলে, 'তোমরা কি আজ ক্ষেপে গেলে সব?'

'কি, এত দূর! নিজের দোরগোড়ায় পেয়ে—' আর কিছু নিতাই বলে না। সে বলিষ্ঠ বাজের মত দুটো গ্রহকে দুহাতে ধরে কক্ষচ্যুত করে ধূলায় অবলুণ্ঠিত করে দেয়। অতিরিক্ত কিছু করে না—কারণ, প্রভুদের স্বাস্থ্য ভংগ হতে পারে। কিন্তু ওতেই কাজ হয়।...

ডালা মাথায় নিয়ে নিতাই চলে যায়। প্রভুদের জন্য যেটুকু পরিশ্রম সে করল, তাতে তার এতটুকুও নিশ্বাস কাঁপে না।

'শালার নামে একটা ফৌজদারী করতেই হবে।' বড় ঘোষাল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'শালাকে শিক্ষা দিতেই হবে।'

'কিন্তু মিথ্যে মামলা প্রমাণ হলে কি হবে দাদা? বড্ড ভুল করেছ নিজের বাড়ীর দরজায় বসে ওকে অপমান করে। মিথ্যা মামলার ফল ২১১—ভাল প্রমাণ হলে জেল! সে বার নবীন মণ্ডল—'

মেজো ঘোষাল মন্তব্য করে, 'তুই আর আইন শেখাস নে বড়দাকে।'

বড়টি জিজ্ঞাসা করে, 'তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে ছোট?'

'আমি আলমারীটার পিছনে ছিলাম। সবাই এক সংগে খায় খেয়ে আসামী হলে তদ্বির করবে কে? আর তা ছাড়া আমার তো শরীরটাও বিশেষ ভাল না। সেই লিভারের ব্যথাটা—'

'মূর্খ!'

দীনু পথে পথে অবৈতনিক প্রচারসচিবের কাজ করে।

দেশময় টি-টি পড়ে যায়: কি চাও, নিতাই সরদার ঘোষালদের মেরেছে। খুন জখমও হয়েছে নাকি কে জানে! আরো অনেক কিছু।...

বিপ্রপদর নেপথ্যে যা ঘটে ঘটুক, তিনি নিজের সংসারের প্রতি দৃষ্টি দিতে এতটুকুও কার্পণ্য করেন না।

স্ত্রী কমলকামিনী তাঁর ন'টি সন্তানের শুধু জননী নন, সহধর্ম্মিণীও বটে! তাঁরও স্বাস্থ্য অটুট। কেউ তাঁকে দেখলে বলতে পারে না যে, তাঁর গর্ভে এতগুলো সন্তান জন্মেছে, এতগুলো শিশুর দৌরাত্ম্য গেছে তাঁর বুকের ওপর দিয়ে। দেহের মাংসপেশী এতটুকুও শিথিল হয়নি, অসংলগ্ন হয়নি স্তনভার। বরঞ্চ মানিয়েছে বেশ সুন্দর। মাতৃত্বের রসধারায় তাঁর মুখখানা স্নিগ্ধ গম্ভীর। এ রূপ সাধারণের কাছে কামনার অতীত। কিন্তু সময় সময় বিপ্রপদকে উদভ্রান্ত করে। কখনও কখনও মন্থরগামিনী গৃহস্বামিনীর গতিবেগ তাঁকে বিভোর করে দেয়।...পুরানোকে নতুন করে পাওয়ার আকাংখা জন্মে। তিনি এগিয়ে যান। গিয়ে, অকারণে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাল আছ তো?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?' হেসে উত্তর দিয়ে একটু কটাক্ষ নিক্ষেপ করে কমলকামিনী চলে যান—আবার হয়ত ঐ পথেই ফেরেন।

'চলো, আজ একটু ক্ষেতের কাজ করি। বর্ষা এখন হবেই, ডেঙো

ক্ষেতটা কুপিয়ে রাখলে দানা ফেলতে সুবিধা হত।' বিপ্রপদ মৃদু মন্দ কণ্ঠে প্রস্তাব করেন।

'তাই চল, যাব—এই কলসীটা একটু রেখে আসি।'

কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা দুটিতে একত্র হতে চান, একান্ত একান্তে। ফাল্গুনের তপ্ত শ্বাসে বিপ্রপদর হৃদয় যেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নিঃশেষ-প্রায় রঙিন শিমুল ফুলগুলোর দিকে আজ তাঁর নজর পড়ে। ওগুলো দেখতে বেশ লাগে—যেন তাঁর কমলেরই মত।

কমলকামিনী দুখানা কোদাল নিয়ে আসেন। একখানা বিপ্রপদকে দেন।

'ওখানাও দেও, ক্ষেতে গিয়ে নিও।'

'কেন?'

'তোমার কষ্ট হবে।'

'কষ্ট হবে কোদাল নিতে, আর কোপাতে?'

'তোমার কুপিয়ে কাজ নেই, আজ বসে বসে শুধু ঢিল ভেঙো।'

বিপ্রপদর কণ্ঠস্বরে কি যেন কমল টের পান। নীরবে কোদালখানা তাঁর হাতে দেন। অপেক্ষাকৃত একটা হাল্কা যন্ত্র তুলে নেন। প্রথম যৌবনের কয়েকটি কথা তাঁর স্মৃতিপথে ফুটে ওঠে। কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত বিপ্রপদ বিশ্রাম করতে সময় সময় ঘাটের নিকটে গিয়ে একটা জামির গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। কমলকামিনীও এটা ওটা ছুতো করে কেবলই পুকুরঘাটে আসতেন-যেতেন। অল্প বয়সের কথা। জল ছড়িয়ে কাজ করতেন। দু'এক দিন এত দেরী হয়ে যেত যে সত্যি সত্যি রান্নাঘর থেকে ডাক পড়ত। কি যেন সব কথা, এখন ছাই মনে পড়ে না, অর্দ্ধপথে অসমাপ্তই থেকে যেত।...সেদিনের চাউনি আজ যেন বিপ্রপদর চোখে জ্বলে উঠেছে বলছে: তুমি আর আমি, আমি আর তুমি!

ক্ষেতটা বেশী দূর না। 'জুতের' ঘরের পাশেই ঢেঁকি ঘর—তার সুমুখে উত্তর দক্ষিণ দীঘলি। ক্ষেতের এক পাশে গোয়াল। অপর দিকে ছায়া স্যাঁতসেঁতে স্থানটায় পানের 'বর'। বাঁশের কাঠিগুলো দিয়ে সুন্দর একটা ঘর তৈরী করে সারি সারি রোয়া হয়েছে পানের লতা। ওপরে পাতলা পাতলা ছাউনি—মৃদু আলো, মৃদু উত্তাপে ওরা ডগা মেলেছে। ঘরের মধ্যে একটাও .বাজে ঘাস লতা পাতা নেই। অন্য কোনও কৃষিও নেই। শুধু কাঠি বেয়ে অজস্র পানের লতা উঠেছে ওপরের দিকে। ঘরের বাইরে চারদিক ঘিরে ইচ্ছা মত বেগুন কিম্বা লঙ্কা গাছ রোয়া যায়। কমলকামিনীও নানা রকম লঙ্কা গাছ পুঁতেছেন। ওগুলো বছর ভরে বাঁচে, বছর ভরে ফসল দেয়। বেগুন গাছও বেছে বেছে লাগান হয়েছে—সবুজ বেগুনী সাদা তাদের ফল।

বিপ্রপদ কুপিয়ে চলেছেন—আর ঢিলগুলো ভাঙছেন কমলকামিনী। ঈষৎ সরস মাটির চাপড়াগুলো এক আঘাতেই ফাগের মত গুঁড়ো হয়ে যায়। শক্তগুলো একেবারে লোহার মত কঠিন। তা মুগুরের ঘায় গুঁড়ো হয় না। সেগুলো জল দিয়ে ভিজিয়ে, ঠেলে রাখেন তিনি তারপর গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে। এ দেশের মাটি একেবারে দোয়াঁশ নয়—এঁটেলীর ভাগটাই একটু বেশী। তাই সরসটা যত নরম, নিরসটা তত কঠিন। তবু উর্বর! একটুখানি জলের স্পর্শে এর ভিতর জাগে নব চেতনা। মাখনের মত কমনীয়তা আসে এর অংগে। ক্ষুদ্রতম বীজটি পর্যন্ত নব জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে হেসে ওঠে। নদী-মাতৃক বাংলার এ মাটি। এ মাটির জন্য কত কাব্য, কত পল্লী-গীতি, কত ইতিহাস যে রচিত হয়েছে তা বিপ্রপদ ও কমলকামিনী সব জানেন না। তবু ভালবাসেন। তাঁদের ছেলে মেয়েরাও ভালবাসে—ভালবাসবে অনাগত বংশধরেরাও। হয়ত

তারা এ মাটির জন্য রক্ত দিতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না।' সর্বকালের সর্বদেশের ইতিবৃত্তের সংগে জড়িয়ে আছে এ মৃত্তিকার রহস্য।

'মা, তোমরা আজ আমাদের ফেলে এসেছ? আমরা যে খুঁজে-খুঁজে হয়রান—মা আর বাবা গেল কোথায়?' চপলা কাজে লেগে যায়।

'বিমলা, এদিকে আয় মা। আমি আর তুই দুজনে মিলে এই চাকাগুলো গুঁড়ো করি।'

'বাবা এতখানি কুপিয়েছে আর তুমি মাত্র এতটুকু গুঁড়িয়েছ মা!'

'এখন তো আমার বয়স হয়েছে।'

কথাটা বিপ্রপদর ভাল লাগে না।

'আমি কি তোমার চেয়েও ছোট—এই [illegible] মা, কতখানি কুপিয়েছি?'

'তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার কথা কি!'

'মা, তোমার আর কাজ করতে হবে না, তুমি একটু বসো—বড্ড শ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে তোমাকে। শ্যামলও এসেছিল—মার হাত থেকে মুগুরটা কেড়ে নিল।'

'তোমাল কথা কি?' বলতে বলতে টলতে টলতে চার বছরের মেয়ে সেবাও এসে হাজির। ওর চলন দেখে সকলে হেসে অস্থির। [illegible]পদও।

'বড় নলম মাতি!'

আবার সকলে সস্নেহে হাসে।

সেবা উৎফুল্ল হয়ে মাটির উপর গড়াগড়ি দেয় আর হাসে।

কমলকামিনী তাকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি মাটি সেবা?'

'নলম মাতি—ভাল মাতি!'

'এখানে কি হবে মা?'

'ছাক হবে বুঁইচ হবে।' অর্থাৎ মরিচ।

বিপ্রপদ মন্তব্য করেন, 'রোজ রোজ ক্ষেতে এসে সেবাও কৃষিতত্ত্ব শিখেছে। তোকে বেটি, চাষার ঘরে বিয়ে দেবো—শুয়ে চাঁদ, বসে চাঁদ দেখবি।'

'চাষার ঘরের মেয়ে আমার চাষার হবে বৌ—টুকটুকে রাঙা বৌ।' সুর করে বলে কমলকামিনী, বিপ্রপদর দিকে চেয়ে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসেন।

বিপ্রপদর ইংগিতটা বুঝতে পেরে সোজা হয়ে একটু দাঁড়িয়ে হাসেন।

'এই, অত মাটি মাখে না সেবা, অসুখ করবে।'

'কলবে না অসুখ।'

মা ধরতে যায়, মেয়ে ছুটে পালায়।

'এই দাঁড়া, মারব কিন্তু।'

'মাললে ছোনা পাবে কই?' মানে সোনা।

মা ধরতে গেলেই আবার মেয়ে ছুটে পালায়। 'শোন তোমার মেয়ের কথা, শোন একবার।' বলতে বলতে তিনি সেবাকে একটু এগিয়ে ধরে ফেলেন। ধরে গালে গাল লাগিয়ে বিপ্রপদর দিকে চেয়ে থাকেন। দুজনের মুখেই বিন্দু বিন্দু ঘাম—শ্রমে আরক্ত।

বিপ্রপদ কোদাল চালান বন্ধ করে মা ও মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। চারদিকে কাজ চলেছে—অবিরাম কাজ। কেউ জল আনছে, কেউ ঢালছে, কেউ বা গুঁড়িয়ে ফেলছে মাটি। যে যার অংশ পূর্ণ করতে ব্যস্ত। একটি লোককে কেন্দ্র করেই নিত্যনিয়ত এই কাজের চাকা ঘুরে চলেছে। তাকে ঘিরেই যত বিস্ময়ের সৃষ্টি। সে-ই এ সংসারের গৃহিণী, ঘরণী, জননী।

একটা পায়রার মত কোথা থেকে যেন অমরেশ ছুটে এসে ডিগবাজী

খেতে খেতে শ্যামলার কোদালের কাছে গিয়ে প... । 'আরে থাম থাম, কেটে-কুটে যাবে।'

অমরেশ বারণ মানে না।

'থাম, থাম, দস্যি ছেলে, যদি হাতপায় চোট লাগে? কাজ করতে দে।' মার শাসনও বৃথা হয়।

বিপ্রপদ একটু চোখ রাঙান—এবার অমরেশ স্থির হয়।

'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর! এবার বড্ড থামলি যে?'

'কি, আমাকে কুকুর বললি?' অমরেশ চপলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুজনে একটা খণ্ড যুদ্ধ বেধে যায়। অমরেশ চপলার শাড়ী ধরে টানে—হাত পা কামড়ে দেবে।

মা, মা, দেখ অমরেশের কাণ্ডখানা। ও ওর কাপড়-চোপড় খুলে ফেলবে—সেমিজ সায়া ছিঁড়ে ফেলবে।' বিমলা বলে।

চপলাও কম নয়। সে আত্মরক্ষা করে চলে, নালিশও করে—ফাঁকে ফাঁকে দু একটা কীল চড়ও মারে।

'বড্ড বাড় বেড়েছে তোমার। আর দিদিদের সংগে লাগবে?' বিপ্রপদ কানে ধরে অমরেশকে টেনে আনেন।

সেবা বলে, 'আর কলবি দাদা? বাবু মারবে।'

জবাবে অমরেশ একটা মুখভংগি করে।

'দেখ মা, দাদা মারে।'

'তোকে মারলাম কখন? মিথ্যাবাদী মেয়ে!' অমরেশ সেবাকে কোলে নিতে যায়, সেটা ছুটে মার আশ্রয় নেয়। অমরেশ একটা চুমো খাবে, সেবা তাতে রাজী নয়।

সন্ধ্যার আবছায়া গাঢ় হয়ে আসে, পাখীদের কলরব থেমে যায়। চারদিকের গাছপালাও যেন সারা দিনের ব্যস্ততার পর বিশ্রাম নেবে। সুপারি বাগানের পূর্ব দিকের দুহুলের ঘন লতাগুলোর ওপর দিয়ে ফাল্গুনের

চাঁদ উঁকি মারে। জ্যোৎস্না উচ্ছল [illegible] এখনই ভাসিয়ে দেবে সব। ধরণী আজ রূপোর আঁচল গায় দিয়েছে। ক্ষেতের এক কোণে একটা হাসনাহানা তার উগ্র গন্ধ বাতাসে মিশিয়ে [illegible]

বিপ্রপদ ফলে-ভরা টমেটো গাছগুলোর শাখা প্রশাখা মাচার ওপর তুলে গুছিয়ে রাখেন। ফলের ভারে ওরা আজ পরিপূর্ণ—ঠিক তার কমলের মত। নরম, নধর পাতাগুলোর ছোঁয়া বড় সুখপ্রদ। বড় সুকোমল! বিপ্রপদ থামেন না।

ছেলেমেয়েরা যে যার কাজ শেষ করে পুকুরঘাটে হাত পা ধুতে চলে যায়। সেবাও তাদের সাথী হয়।

গোয়ালের দুয়ারে ধবলী ও কালী তাদের বাছুর নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কমলকামিনী তাদের গলায় দড়ি পরিয়ে দেন। বাছুর দুটোকে একটু দুধ খাইয়ে খোপে রাখতে হবে। রাত্রের খাবার দিতে হবে গরু দুটোকে, তিনি রান্নাঘর থেকে ফ্যানের বালতি মাচার ওপর থেকে খোল ভুষি এনে গরু দুটোর কাছে রাখেন। ওরা এক নিশ্বাসে খেয়ে অবশিষ্টটুকু লেহন করতে থাকে। কমলকামিনীর হাতেও দু একটা চাটা মারে। তিনি ওদের দেহে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলেন, 'আজ আর ডেকো না—এখন ঘুমোও।' ধবলীর পেটের ওপর হাত পড়তেই তিনি বিপ্রপদকে ডেকে এদিকে আসতে বলেন। 'একটা মজা দেখে যাও। রাত হয়েছে, এখন গাছ-গাছালি নাড়া বন্ধ রাখো কাল সকালে আবার যা হয় করো।'

'তাই তো, রাত অনেক হয়েছে। তুমি এখনও গা ধুতে যাওনি?'

'বেশ, এক যাত্রার দুই ফল? এক সংগেই যাবখন। একটি বার এদিকে এসো না!'

বিপ্রপদ উঠে আসেন।

'এই দেখ, ধবলীর পেটে কেমন বাছুরটা নড়ছে—আর দু চার দিনের

মধ্যেই বিয়োবে। এবার বাচ্চাটা বকনা হলেই বাঁচি। দেখ হাত দিয়ে, কেমন নড়ছে।’

কি মসৃণ লোমগুলো! বিপ্রপদ হাত দিয়ে অনাগত গো-শিশুর নর্তন অনুভব করেন। ‘বড্ড দুষ্টু হবে, তোমা[illegible]তি মা ষষ্ঠীর যেমন কৃপা আমার গোয়ালের প্রতিও তেমনি।’ তিনি একটু [illegible]ন।

উত্তরে কমলকামিনী একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করেন।

‘এবার গা ধুতে চলো। তোমার কালীরও তো দুধ কমে গেছে, বাছুরটাকে দুধ দিতে চায় না। এবার একটা ভাল ষাঁড় দেখাতে হবে। আগে থেকে ব্যবস্থা করো। গতবার যে অসুবিধা হয়েছিল। ও-কাজ কি মেয়েমানুষের সাজে? তখন ঠাকুরপোরাও কেউ বাড়ী নেই—একে ডাকো, ওকে ডাকো, কেউ স্বীকার করে না। বাপ রে, কি ঝামেলা!’

‘হুঁ।’

গোয়ালের ঝাঁপ টেনে দিয়ে কমলকামিনী বলেন, ‘এবার চলো। তুমি পুকুরঘাটের দিকে এগোও, আমি কাপড় গামছা নিয়ে আসি।’

আর দু তিন বছরের মধ্যেই বিপ্রপদর গোয়ালখানা ভরে যাবে। হয়ত ওটা বড়ও করতে হবে। সাদা কালো খয়রা মেটে কত রঙের গো-শাবক। এটা ছুটছে এদিকে, ওটা ছুটছে ওদিকে। কোনোটার বুদ্ধি চঞ্চল, কোনোটার চাহনি স্নিগ্ধ। এদের দৌরাত্ম্য এক[illegible] পক্ষে সহ্য করা নিতান্ত অসম্ভব। একটা ছোট ছেলে খুঁজে পেতে আনতেই হবে এক দিক থেকে। রাখাল না হলে গরুর পাল কি সামলান যায়? এখন মেয়েরা সাহায্য করে তাই কমলকামিনীর তেমন কষ্ট হয় না—ক্রমে ক্রমে মেয়েদের বিয়ে হবে যাবে।

ঘরে বাইরে সমান বাড়-বাড়ন্ত! যেন বিপ্রপদর দিকে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চেয়ে রয়েছে। তিনি আসমুদ্র মন্থন করে আহরণ করে আনছেন

এদের জন্য আহার্য। মনে মনে তাঁর গর্ব বোধ হয়।...কিন্তু কমলকামিনী যে এখনও আসছেন না।

'ঘাটে বসে ভাবছ কি?'

'ভাবছি তোমার কথা। এত দেরী যে?'

'কি দিয়ে ঠাকুরের বৈকালী দিতে হবে বলে এলাম।'

'আর আমারটা?'

দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি থেমে যায়। ধীরে ধীরে ওঁরা জলে নামেন। প্রাণ ভরে স্নান করেন। দমকা হাওয়া আসে—একটা উগ্র গন্ধ মিশিয়ে নিয়ে। ছড়িয়ে দিয়ে যায় ঘাট পারে।

'কি, জবাব দিলে না যে?'

টুকরা হাসির মত জ্যোৎস্না কাঁপছে জলে। কমলকামিনী অসংযত বসন শাসন করে গুছিয়ে নিতে নিতে মিষ্টি মাখিয়ে চাপা গলায় জবাব দেন, 'লংকা যত পাকে তত বুঝি ঝাল বাড়ে?'

আজ এই সিক্ত-বস্ত্রা রমণীকে চাঁদের আলোতে বিপ্রপদর পূর্ণ যুবতী বলে ভ্রম হয়। তাঁর চঞ্চল মরু-তৃষা ওঁকে আকণ্ঠ পান করতে চায়? পুরোনো ছন্দ নতুন ঝংকারে বেজে ওঠে। ওঁর রহস্যময়ী নারী। যুগে যুগে এমনি করেই বুঝি উন্মাদ করেছে তাঁকে।

'মা, মা, তোমার কি এখনও গা ধোয়া হলো না, সেবা যে থাকতে চায় না। ও দুধ খাবে, ঘুমোবে।' বিমলার কণ্ঠ শোনা যায়।

'আসি মা, এই তো আমার হয়ে গেছে। শুনছ, এখন আর দেরী করো না—জলে থেকো না বেশীক্ষণ। উঠে বাড়ীর ভিতর এসো, রান্নাও বোধ হয় হয়ে এলো।'

বিপ্রপদ হুঁ-না কিছুই বলেন না।

কমলকামিনীর সে উদ্দাম চাঞ্চল্য কোথায় গেল? যৌবনের প্রথমে যা-ও ছিল, তা-ও আজ আর বুঝি এতটুকু অবশিষ্ট নেই। সে সকলি

মন্থর হয়ে মিলিয়ে গেছে। বুঝি বা বিপ্রপদর ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। আজ তিনি সেবার জন্য যতখানি ব্যস্ত, তার ক্রন্দনে যতটুকু সাড়া দেন, তার ভগ্নাংশের একাংশও তো দেন না বিপ্রপদর জন্য। সেবা একটু উসখুস করে উঠলেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, অমনি পাশ ফিরে দুধ দেন, কিন্তু কত দিন বিপ্রপদ ডেকে দেখেছেন, কমলকামিনী ঘুমে থাকেন অচেতন।...মনে মনে তাঁর একটা গ্লানি বোধ হয়। প্রচ্ছন্ন হিংসাও যেন উঁকি মারে।...অবশেষে বিষাদে মনটা পূর্ণ হয়ে যায়। কি যেন হারিয়ে গেছে তাঁর—কি অমূল্য রত্ন যেন তিনি আর খুঁজে পাবেন না এ জীবনে।

এক খণ্ড লঘু মেঘ ক্ষণিকের জন্য চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। ক্ষণিকের জন্য পুকুরের জল কালো হয়ে আসে।...তার পর আবার জ্যোৎস্না।

তিনি একটা এতটুকু মেয়ের সংগে হিংসা করছেন! আবার সে তাঁরই মেয়ে, ছিঃ ছিঃ! একটা অবোধ বালিকার সংগে প্রতিযোগিতা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওকে ডেকে ডেকে তিনি কতই না আবোল-তাবোল আদর আলাপ করেন। এ সকলই কি অর্থহীন—শুধু মাত্র ভাবাবেগ?

ঘরে গিয়ে বিপ্রপদ দেখেন, যেন একটা সরাইখানার হট্টগোল চলেছে।

ছেলে মেয়েগুলো সবে মাত্র খেয়ে উঠেছে। বৌমা হাত পর্যন্ত ধুতে পারেনি, এর মধ্যে ক্রন্দন, আবদার, অর্থহীন ক্রোধ আরম্ভ হয়ে গেছে।

'গামছা, গামছা? কোথায় আমার গামছা? কে নিল?' অমরেশ উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামলা ডেকে বলে, 'এই নে তোর গামছা—উড়ো চোখে খুঁজবি, পাবি কি করে? শুধু হৈ হৈ।'

'তুই মুখ মুছলি কেন? আমার লাগবে না, লাগবে না রাক্ষুসী।'

'দেখ ছেলের কথাবার্তা। আচ্ছা, মা আসুক আগে দেখাচ্ছি তোকে মজা! দিন দিন তোর বড্ড বাড় বাড়ছে—এত বড় খোকা, ঘুমে ঢুলে পড়ছেন এখনি!'

এর মধ্যে কমলকামিনী এসে পড়েন, তার কাছে বিমলা সখেদে আর্জি পেশ করে। কিন্তু কিছু ছাই কি শোনবার জো আছে। বিনু মরা-কান্না জুড়ে দেয়।

'ও মেজবৌ, ওটাকে এসে ধর—ওটা মরল যে।'

'মরুক, আর আমি পারি নে—ওদিকে ভাসুর ঠাকুর বসে আছেন যে।'

'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, ওটাকে তুই একটু থামা।'

'তা হলে তাড়াতাড়ি এসো দিদি—বিড়ালগুলোও ঘুরছে, আবার কিসে মুখ দেয়।'

রান্নাঘরে যাওয়ার পথে কমলকামিনীর আবার আঁচল টান পড়ে। ছোট ননদের মেয়েটা বলে, 'আমি মার কাছে যাবো।'

'চল। তুই বুঝি খাসনি, ঘুমিয়েছিলি?'

'হুঁ।'

'চল—আর কাঁদে না। তোর ভাগেরটা কেউ খায়নি অভাগী। বড় মাছের ছোট মুড়োটা তোকে দেবখন। কাঁদে না আর।'

মেয়েটা ঠাণ্ডা হয়ে কমলকামিনীর কোলে চড়ে।

তিন ভাই পাশাপাশি খেতে বসেছে। পরিবেশন করছেন কমলকামিনী। বড় বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি। বড় বড় কাঁসার থালা। ক্ষেতের ধানের সরু চাল, ভুরভুর করে গন্ধ বের হচ্ছে ভাতের। পুকুর থেকে বড় একটা মাছ আজ ধরা হয়েছিল। তার ঝোল, মুড়িঘণ্ট আরো কত কি! ঘরেই ঘি তৈরী হয়—একেবারে টাটকা সুগন্ধি। সর্বশেষে গাঢ় খাঁটি দুধ, আজ আবার শুধু দুধই নয়, মিষ্টান্নও আছে। যে যার মর্জি মত খাবে—বাড়ীর কামলা মজুর পর্যন্ত।

'বৌঠান, আজ কতখানি খেজুর রস নেমেছে?' শিবপদ জিজ্ঞাসা করে।

'দশ বার কলসী।'

'তাই বুঝি মিষ্টান্ন রেঁধেছ। রোজ আমি গাছ দিতে সময় পাই নে—তা হলে আরো বেশী পাওয়া যায়।'

দেবপদ বলে, 'দাদা, কাল না কি নিতাই সরদার ঘোষালদের আচ্ছা করে ঠেঙিয়েছে!'

'কেন মেরেছে? এ তো ভারী অন্যায়!'

'কে বললে অন্যায়? অন্যায় ওদেরই, ওরাই আগে নিতাইকে মারে।' বলতে বলতে দীনু একেবারে রান্নাঘরে এসে প্রবেশ করে।

কমলকামিনী একটু মাথার কাপড় টেনে একখানা পিঁড়ি পেতে দীনুকে বসতে ইসারা করেন।

'বড় ঘোষাল এবং মেজো ঘোষাল দুজনে মিলে প্রথমে নিতাইকে অপমান করে। নিতাই অসহ্য হয়ে শুধু আত্মরক্ষা করেছে। তার দোষ কি? সে গরীব—তোমাদের সাহায্য নিয়েছে, এই যদি অপরাধ হয়, তবে তো আর এ দেশে গরীব-গরবা থাকতে পারবে না।'

'না না, তা আমি বলছি নে—তবে কিনা, মারামারি করাটা কি ভাল?'

'এ তো মারামারি নয়—স্রেফ আত্মরক্ষা।'

'আপনি আইনের কথা ছাড়ুন। হাজার হলেও ঘোষালদের একটা মান আছে।'

'আর নিতাইর বুঝি নেই?'

'তাও তো বটে।'

সে মার খেয়েও অত ক্ষেপত না—ক্ষেপেছে তোমাদের নিন্দা শুনে। সেখানে তখন আমি একটু আফিং খাইতে গিয়েছিলাম। না হলে এ সব কে-ই বা শুনত, জানতই বা কে? ওদের আক্রোশ ঠিক এখন আর নিতাইর ওপর নেই।' দীনু একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

বিপ্রপদ বলেন, 'বুঝেছি সব।'

দীনু এবার একটু এগিয়ে এসে খুব তীক্ষ্ণ একটা বাণ ছাড়ে। 'তোমরা না কি কেরোসিনের ডিবা—এক ফুঁতেই ব্যস! হাঃ হাঃ হাঃ! বুঝলে ভায়া ওদের ধারণাটা?'

বিপ্রপদ মন্তব্য করেন, 'তাই না কি?'

দীনু এবার আর কথা না বলে শুধু চোখ দুটো পাকিয়ে যা বুঝিয়ে দেয়, তা কথার চৌদ্দ গুণ অর্থে ভরা।

জ্বলে ওঠে শিবপদ। 'দাদা, এখন আর চুপ করে থাকা যায় না। আমি এক্ষুনি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসি, তোমরা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাও নাকি? তোমাদের—'

'চুপ কর শিবে। তালুকটা আগে খরিদ করে নি—তারপর দেখা যাবে। কি বলেন দীনুদা?'

অনভিপ্রেত হলেও দীনুর এবার বলতে হয়, 'আলবৎ, এই ত বাঘের আড়ি!' কিন্তু মনে মনে সে ক্ষুণ্ণ হয়—শেষ অধ্যায়টা তার বাঞ্ছনীয় নয়।

আহারান্তে শিবপদ ও দেবপদর সংগেই দীনু চলে যায়।

'বাইরে যে দুজন অতিথি আছে, তাদের কি ব্যবস্থা করেছে বড়বৌ?'

'তারা অনেক আগেই খেয়ে গেছে।'

'কি করব, তালুকটা কি কিনব?'

'এর মধ্যে আর দ্বিধা দ্বন্দ্বের কি আছে, আমি তো বুঝি নে।'

'কিন্তু এতগুলো টাকা…মেয়েদের বিয়ে…এত চাপ কি এক সময় কুলোতে পারব?'

'ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে পারতেই হবে।'

'তা ঠিক। ইচ্ছা থাকলে পথ হয়। বাবাও তাই বলতেন—আমি এখনও সে কথাটা ভুলিনি।'

'তা হলে সুবোধ ছেলের আর চিন্তা কি !'

'তুমি রহস্য করছ বড়বৌ ? করতে পারো করো। কিন্তু দু এক জনার দু একটা কথা এমন মনে থাকে যে জীবনেও ভোলা যায় না। সেই মহা বাক্যই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।'

রাত্রে শুতে গিয়ে বিপ্রপদ দেখেন যে, বিছানাটা একটু নতুন করে পাতা হয়েছে। অমরেশ আজ আর এ বিছানায় স্থান পায়নি। সখ করে শ্যামলা সেবাকে নিয়ে গেছে, না কমলকামিনী ইচ্ছা করেই তার ছোট বালিশ লেপ তোষক ওদের বিছানায় দিয়ে এসেছেন, তা ঠিক বোঝা যায় না। একান্ত দুজনের জন্যই আজ রাতের শয্যা রচিত হয়েছে। সুন্দর ধবধবে বিছানা। এখনও গ্রাম-গাঁয়ে একটু একটু শীত পড়ে—উত্তপ্ত শয্যা লোভনীয় বটে। তবে কি তাঁর কমল সবই বোঝেন ? তাঁর বোবা ব্যথায় ওঁকেও উন্মনা করেছে ? তাই এত কাজের মধ্যেও এমন সুন্দর ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। ফাল্গুনী শুক্লা তিথি আজ বুঝি ব্যর্থ হবে না। তিনি যা কামনা করেন তাই বুঝি পাবেন। এ গৃহের জননী, রমণী রূপে তাঁকে ধরা দেবেন—নত নেত্রে লঘুপদ সঞ্চালনে। ওঁর কামিনী ওঁর চির সংগিনী আজ নিবেদন করে দেবে তাঁর সর্বস্ব।

'একটা পান খাবে ?'

'দাও, খাবো।'

'এখনও ঘুমোওনি ?'

'না, আজ আর ঘুম আসছে না।'

'কেন ?'

'জানি না।'

আর কেউ কোনও কথা বলে না।

কমলকামিনীর কুঞ্চিত চুলগুলো এখনও শুকায়নি। ওঁর ললাটে ওই যে সিন্দুরবিন্দু—ও কার দেওয়া ? একান্ত বিপ্রপদর এঁকে দেওয়া পৌরুষের

জয়চিহ্ন। 'আমরণ ওঁকে শয়নে জাগরণে বহন করতে হবে। ওঁর বিজয়ের জয়লেখা আজ বড়ো উজ্জ্বল, বড় সুন্দর মনে হচ্ছে।

ধীরে ধীরে চার পাশের মশারি নেমে আসে। ধীরে ধীরে ফুঁ দিতে দিতে প্রদীপটা নিবে যায়।

শুধু অনির্বাণ থাকে বিপ্রপদর উদগ্র আকাঙ্ক্ষা।

মৃদু হাস্যে দুরু দুরু বক্ষে তাই কমলকামিনী আত্মসমর্পণ করেন সে আগুনে।

প্রদীপ শিয়রে জ্বলছে—

অতি প্রত্যূষে বিপ্রপদর ঘুম ভাঙে। তিনি দেখেন, সেবা ঠিক তার পুরোনো জায়গাটা দখল করে জননীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঘুমোচ্ছে। কমলকামিনীও নিদ্রামগ্ন। যেন একটি বৃন্তে দুটি ফুল। একটি প্রস্ফুটিত, অন্যটি কোরক। কিছুক্ষণ বিপ্রপদ চোখ ফেরাতে পারেন না। তিনি শিয়রের প্রদীপটা একটু বাড়িয়ে দেন। তার পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্নান আহ্নিক করতে যান।

তাঁর হৃদয় আজ পূর্ণ!

চঞ্চলা এসে বিপ্রপদকে বলে, মার কথা দিদিরা শোনে না, তুমি একটু বলে দাও বাবা। ও কি, হাতের কাজ রেখে উঠে এসে একটু বলে দাও —মা কিছু বললে ওরা হাসে।'

'কি বলে দেবো পাগলী, কি?'

'আমি মাঘ মণ্ডলের ব্রত করব, ওরা একটু দেখিয়ে দেবে।'

'সাধে কি হাসে তোর দিদিরা—এখন যে মাঘ মাস উতরে গেছে মা।'

'তা হলে এটা ফাল্গুন মাস। এখন কোন ব্রত নেই বাবা?'

'আছে বই কি। তোর কাকীমা এসব জানে ভাল—তোর মাকে না বলে তাকে ধর গে শক্ত করে।'

চঞ্চলা ছুটতে ছুটতে কাকীমার সন্ধানে যায়—চুলগুলোও তার যায় দুলতে দুলতে।

'কি রে অমন করে ছুটে এলি যে?'

'আমি এ মাসে একটা ব্রত করব, বলে দাও কি ব্রত?'

'এটা কি মাস? ফাল্গুন—গুন্-ফাগুনের ব্রত করতে পারিস।'

'তা হলে এক্ষুনি দেখিয়ে দাও, বলে দাও কি করতে হবে?'

'মেজবৌকে সে একেবারে ঘাট থেকে টেনেই তুলত যদি না সে ওকে আশ্বাস দিয়ে শান্ত করত। 'কাল খুব ভোরে উঠে আসিস, আমি দেখিয়ে দেব। সকাল সকাল উঠতে পারবি তো?'

'হুঁ খুব পারব।'

'মেজবৌ একটু তাড়াতাড়ি এদিকে এসো, আজ [illegible]ক কাজ আছে, ও পাগলীর সাথে আবার কি বকবক করছ?'

'আসি দিদি, এই তো আমার ঘাটের কাজ শেষ হলো ব[illegible]।'

চঞ্চলার মন আবার উসখুস করে ওঠে। সে পুনরায় প্র[illegible] করে, 'বল না মেজমা, কাল কি করতে হবে? তোমার শাড়ীখানা [illegible]মি কেচে দেবোখন।'

'পাগলী! তুই কি পারিস এত বড় শাড়ী সামলাতে? আচ্ছা বলি শোন, সুন্দর করে আলপনা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা বৌ-ছত্তর আঁকতে হবে। তারপর একটা ছোট ঘটে জল ভরে রেখে, হাতে দূর্বা নিয়ে শুনতে হবে ব্রতকথা। খুব মন দিয়ে কিন্তু।' সে রান্নাঘরের দিকে চলতে থাকে আর বলে যায় এমনি আরো অনেক কথা।

'তা হলে আজ বিকেলে দূর্বা তুলে রাখতে হবে?'

'হ্যাঁ, রাখিস তুলে।'

'ঘটি ?'

'সে আমি কাল জোগাড় করে দেব। এখন যা, খেলা কর গে। ঐ তোর মা আসছে, এখন পালা।'

'এখনও তুমি ওর সংগে বকবক করছ মেজবৌ ?'

'না দিদি, না। এই তো আমি আসছি। কি করতে হবে, বলো তো ?'

'আজ সকাল সকাল আরম্ভ না করলে কি অতগুলো চিঁড়ে শেষ করা যাবে? মেয়েদের সব ডেকে ডালা-কুলো নিয়ে ঢেঁকি ঘরে যাও, আমি আসছি এক্ষুণি। ভিজে ধান ঢেঁকি ঘরে রেখে এসেছি।'

কিছুক্ষণ বাদেই ঢেঁকি ঘরে পাড়ের শব্দ শোনা যায়। মেয়েরা বৌরা মিলে চিঁড়ে কুটছে। ঢেঁকির পাড়ের শব্দে বিপ্রপদ এসে উঠানে দাঁড়ান। কমলকামিনী মেয়েদের শিখিয়ে দিচ্ছেন: এমনি করে এতটুকু ভাজলে চিঁড়ে ভাল হয়। পাড়—প্রথম দিতে হবে ধীরে ধীরে, তারপর জোরে। বিমলা ভাজে ধান, শ্যামলা 'আলায়' চিঁড়ে। পাড় দেয় চঞ্চলা ও মেজবৌ। এরপর আবার অদল বদল হবে। মেয়েরা আলাতে চায় বেশী, কিন্তু ওতেই ওদের ভয় বেশী—হঠাৎ ঢেঁকির পাড় হাতে পড়লে সর্বনাশ! কি আশ্চর্য, বিপদের মুখেই ওদের হাত দিতে বেশী উৎসাহ। সোণালী ধান থেকে কেমন অজস্র সাদা ফুলের মত চিঁড়েগুলো বেরিয়ে আসে। কেমন একটা সুন্দর গন্ধ। নরম মোলায়েম খুঁড়োগুলো ছিটে ছিটে পড়ছে, হাতে পায় গায় পাড়ের তালে তালে।

বিপ্রপদ স্মিত মুখে বলেন, 'আইবুড়ো মেয়েদের দিয়ে তুমি এ সব করাচ্ছ—হাত সাবধান! আমার তো ভয় করে।'

'চোখ বুঁজে থাকলেই পারো। এ সব মেয়েদের কাজ, তোমরা বুঝবে না।'

'তুমি আলাতে পারো না ?'

'আমার হাতের দামও তো তোমার মেয়েদের চেয়ে কম না। একটা কথা, তুমি আলালে কিন্তু দুদিক রক্ষা হয়!'

মেয়েরা বৌরা হেসে ওঠে।

বিপ্রপদ একটু লজ্জিত হন।

'এই, এখন তুই আয় শ্যামলা। বিমলা আর কতক্ষণ ভাজবে?'

আগুনের গনগনে আঁচে বিমলার মুখখানা একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে।

শ্যামলা মিনতির সুরে বলে, 'আচ্ছা, এবারেরটা আমি শেষ করে যাই মা।'

বিমলা সাগ্রহে অপেক্ষা করে। আর একটু পরেই তার পালা। সে মুঠো মুঠো ধবধবে চিঁড়েগুলো নাড়বে, তুলে তুলে সরিয়ে রাখবে—পাড়ের তালে তালে সে নিপুণ হাতে যাবে কাজ করে। তার মনটা উৎসাহ ও গর্বে ভরে ওঠে।

কমলকামিনীর বিশ্রাম নেই, তিনি এটা-ওটা কত কি যে করছেন! সকল কাজেই তাঁর ছোঁয়া লাগছে, তাই সব সুন্দর ও মার্জিত হয়ে ওঠে। বিপ্রপদ যেতে পারেন না, চেয়ে চেয়ে দেখেন। গত রাত্রের কথা মনে ভেবে কেমন একটু লজ্জা বোধ করেন। আজ এ বয়সে কমলকামিনীর প্রাচুর্য ও সার্থকতা বোধ হয় এখানেই। তিনি বুঝি সমস্ত সম্ভোগ-লিপ্সার বাইরে চলে গেছেন। তাঁর কাজের ছন্দে ছন্দে গৃহিণীপনার ললিত রাগিণীই বুঝি বেজে উঠছে। একের ধরার বাইরে যেতে যেতে তিনি সকলকে ধরা দিতে চান। সকলকে বিলিয়ে দিতে চান ওঁর শিক্ষা সংযম তিতিক্ষা! যুগপৎ সুখ ও দুঃখ এসে বিপ্রপদকে ঘা মারে। তিনি হাঁটতে হাঁটতে বাগানের দিকে চলে যান। কমলকামিনী জানতেও পারলেন না—যাঁর সংসারের জন্য তিনি এত খেটে মরছেন তাঁর অন্তর ক্ষুব্ধ, চিত্ত বিচলিত।

কিছুক্ষণ পরের কথা।

'তোরা কেমন মানুষ মা, ওঁকে দুটো টাটকা চিঁড়ে মুখে দিতেও বলতে পারলিনে! আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু তোদের তো একটু খেয়াল থাকা চাই। কি করে যে পরের ঘরে গিয়ে ঘর করবি তোরা তা আমি ভেবেই পাইনে। তোরা—'

'বেশ, তোমার সুমুখ দিয়েই তো গেল। এখন যত দোষ আমাদের!' বিমলা জবাব দেয়।

'কার দোষ কার গুণ এখন সে বিচারে কাজ নেই—এখন তোরা এক জন যা, গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়। গেল কোন্ দিকে?'

'ঐ নতুন কলা বাগানটা যে—ঐ দিকে!'

'কাজে হাত দিলে আজ আর দুপুরের মধ্যে পেটে কিছু পড়বে না। হয়ত বেলা তৃতীয় প্রহর উতরে যাবে—নিজের ক্ষুধা তেষ্টার দিকে তো এতটুকু নজর নেই। যা মা, কেউ ডেকে নিয়ে আয়।'

মেয়েরা এ ওর মুখের দিকে চায়—কে যাবে ডাকতে? সকলেরই কেমন যেন একটা লজ্জা বোধ হয়।

উৎকণ্ঠিতা কমলকামিনী বলেন, 'এই তোদের ডালা কুলো চিঁড়ে ঝাড়া রইল, আমিই চললাম ডাকতে। বাপের কাছে যেতে লজ্জা!'

মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে দ্রুত পদে কমলকামিনী চলতে থাকেন। নতুন বাগান, পুরোনো বাগান সবই তাঁর চেনা। কিন্তু বিপ্রপদ কোথায়? আলো ছায়ায় তিনি এখানে সেখানে অনেক খুঁজে দেখলেন। তন্ন তন্ন করেই খুঁজলেন। অবশেষে একটা খেজুর কাঁটার খোঁচা খেয়ে ঘরে ফিরলেন। তাঁর রাগ হল, পেটটা তো আর তাঁর নয়। তবে কিসের জন্য এত মাথা ব্যথা? ক্ষিদে পেলেই ছুটে আসতে হবে। এত মান অভিমানের তিনি ধার ধারেন কি? রোজ রোজ তাঁকে ডেকে কে খাওয়ায়? তিনিও ত একটা মানুষ! একটা কাঁটা দিয়ে ভাঙা কাঁটাটা

তুলতে তুলতে তিনি অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের সংগে এক-তরফা লড়ে চলেন। তাঁর আর এত খেটে খুটে লাভ নেই—শুধু ছাইতে জল ঢালা। আজ তাঁর বাল্য কৈশোর ও যৌবন তিন কালের সব বাছা বাছা দুঃখের কাহিনী-গুলি মনে পড়ে। তার অনেকগুলির সংগে বেচারা বিপ্রপদ মোটেই জড়িত নন—তবু সকল কাহিনীই যেন তাঁরই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। ক্রমে পায়ের টাটানি কমে কিন্তু বুকের জ্বলুনি কমে না।

তিনি আর ঢেঁকি ঘরে যান না। সেবা কাছে এলে তাকে নিয়ে শুয়ে থাকেন।

'মা, ক্ষীর বাতাসা দিয়ে কেমন চারটি চিঁড়ে মেখে এনেছি তোমার জন্যে। উঠে দুটো মুখে দাও। তুমি তো আর নিজের হাতে ধরে কিছু মুখে দেবে না। সকলে খেয়েছে, মেজমা সকলকে দিয়েছে—এখন তুমি শুধু বাকী।···তোমার হলো কি মা?' একটা বাটি ও এক গ্লাস জল নিয়ে বিমলা দাঁড়িয়ে থাকে।

'আমার পেটে তো আর রাক্ষস নেই মা, তোমরা গিয়ে খাও।'

বিমলা অপ্রস্তুত হয়ে চলে যায়। মাকে আর অনুরোধ করতে তার সাহস হয় না।

অপরাহ্ণ বেলায় বিপ্রপদ যখন বাড়ী ফেরেন, তখন রোদের উত্তাপ কমে গেছে। গরুগুলো বাগান থেকে বেরিয়ে চরতে নেমেছে মাঠে। ছেলেরা যাচ্ছে কলরব করে খেলতে।

বিপ্রপদর সর্বাংগ বেয়ে ঘাম ঝরছে। মুখমণ্ডল আরক্ত। কমলকামিনী তাড়াতাড়ি একটা কিছু বসতে দিয়ে পাখা নিয়ে আসেন। সেবা এসে বাপের কোল ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'না বলে কোথায় গিয়েছিলে?'

'পোষ্টাফিসে।'

'একটা লোক পাঠালেই হত। না খেয়ে দেয়ে এই যে তাড়না করে এলে তাতে লাভ হলো কি ?···বিমলা, বিমলা, তেলের বাটি নিয়ে আয় মা।'

'আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। একখানা জরুরী চিঠি আজ ডাকে না দিলে চাকরী থাকত না। চিঠিখানা আগেই লেখা উচিত ছিল, কিন্তু নানা কাজে কি সব কথা স্মরণ থাকে ? সেই জন্যই তো রোদে পুড়ে এত দূর হেঁটে যেতে হলো। যাওয়ার সময় অমরেশকে বলে গেছি—সে তোমাদের বলেনি ? হয়ত খেলতে খেলতে ভুলে গেছে। ছেলেবেলায় আমাদেরও ও-রকম ভুল হতো—নিতান্ত পাগল, পড়া-শুনো নেই, শুধু খেলা !'

ইতিমধ্যে কমলকামিনী দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলের ওপর যেটুকু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, সেটুকু আর থাকে না। কারণ, যাঁর প্রতি এ অপরাধ তিনিই তো অবহেলায় ক্ষমা করে গেলেন।

কমলকামিনী আর অপেক্ষা না করে নিজের আঁচল দিয়েই বিপ্রপদর বুকের, মুখের ও পিঠের ঘাম মুছে নেন। ততক্ষণে বিমলা তেল নিয়ে আসে। তিনি কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে বিপ্রপদর হাতে পায়ে গায়ে তেল মাখাতে বসেন।

'থাক থাক, আমার এমন কোনও কষ্ট হয়নি। আমিই পারব। তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো ?'

বিমলা বলে, 'সকলে খেয়েছে কিন্তু—'

'তোর মা খায়নি। ও ওঁর চিরকেলে স্বভাব। নিজে ইচ্ছা করে কষ্ট করলে, অপরে কি করতে পারে ? যাক, এখন তুমিও স্নান করতে যাও—আমি তো এলাম বলে।'

'মা আর দিনের বেলা খেয়েছে ! ছুটো চিঁড়ে পর্যন্ত মুখে দিলে না। কত বললাম—তা—'

'চুপ কর বিমলা—নিজের কাজে যা।'

এক বেলার চাল বাঁচিয়ে তোমার লাভ হলো কি? তোমার শক্তি-সামর্থ আছে, তুমি পেরেছে—আমি কিন্তু তা পারব না। আমার ব্যবস্থা করো গে—যাও। এই তো একটা ডুব দিয়ে এলাম বলে।'

কমলকামিনী কিছুই বলেন না। এ জাতীয় অভিযোগ যেন তিনি জীবনে বহু বার শুনেছেন—এমনি একটা ভাব তাঁর মুখে ফুটে ওঠে।

•

বিপ্রপদ সবে একটা ডুব দিয়ে উঠেছেন, এমন সময় এক জন প্রতিবেশী মুসলমান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে, 'বাবু, আইজ হাট বার, কেউরে দেখি না। আমার সাধের গরুডা বুঝি মরে।' তার সর্বাংগে কাদা ও মুখে দারুণ উদ্বেগের চিহ্ন। মাথায় জড়ান গামছাটা খুলে পড়ছে, কিন্তু সে বার বার চেষ্টা করেও ঠিকমত গুছিয়ে বাঁধতে পারছে না!

'কেন মরবে?'

'কেউরে না পাইলে আর বাঁচবে ক্যামনে? আমার গায় তো আর সে জোর-বল নাই! আমি একলা একলা অনেক চেষ্টা করইয়া দেখছি।'

'কি চেষ্টা করে দেখেছ? ব্যাপার কি, আবদুল?'

'কার কাছে কমু, কেউরে তো দেখি না।'

'কেন, এই তো আমি রয়েছি—আমাকেও কি দে[illegible] পাচ্ছ না?'

'তুমি কি আর যাবা বাবু? যে কাদা! আমার পোড়া কপালে অমন লক্ষী টেকবে ক্যান?' সে একটা নারকেল গাছের ওপর মাথা কুটে কাঁদতে থাকে।

'আরে, বল না আবদুল, হয়েছে কি? শুধু শুধু কেঁদে কপাল কুটলে হবে কি?' বিপ্রপদ জল থেকে উঠে গিয়ে আবদুলকে ধরেন।

পুকুর ঘাটে ছেলে মেয়ে স্ত্রীলোকের ভিড় জমে যায়। অনেক প্রশ্নের পর সে বলে যে তার একটা গর্ভবতী গাভী ঘাস খেতে খেতে খালের নরম কাদা চরে কখন যেন নেমেছে। এখন একেবারে কাদায় পুঁতে বসে

গেছে—উঠতে পারছে না। এতক্ষণ ছিল ভাটা, এখন আবার জোয়ার এসেছে। তাড়াতাড়ি তুলতে না পারলে এখনই জল খেয়ে মারা যাবে। কিন্তু লোক কোথায়? কে এ বিপদে তাকে সাহায্য করবে? বিপ্রপদকে সে অনুরোধ করতে সাহস পায় না। কারণ তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

দেরী না করে বিপ্রপদ দ্রুত ছুটে যান খাল পারের দিকে। গরুটার অবস্থা দেখে তাঁরও মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। নিজে যে অভুক্ত—পরিশ্রান্ত, সে কথা ভুলে যান। তাঁর নিজের শক্তির ওপর কেমন যেন সন্দেহ হয় একটা। তিনি কি পারবেন ওই ভারী জন্তুটাকে অতখানি কাদা থেকে টেনে তুলতে? তাতে আবার যে হেউলী ঘাস কাদা চরে! কেন পারবেন না? নিশ্চয় পারবেন। বুকে বল করে তিনি নেমে যান। গরুটার নাকের ডগা পর্যন্ত জল এসেছে। ঘোলা জল ঘুরে ঘুরে ছাপিয়ে উঠছে কেবলি। গরুটা অনিবার্য মৃত্যুর দিকে মুখ তুলে কাতর চোখে চেয়ে আছে। পেটে একটা বাছুর—কি যে কষ্ট হচ্ছে ওটার! বিপ্রপদকে দেখেই ও দুচোখের জল ছেড়ে দেয়।

‘এখনও দাঁড়িয়ে আছ আবদুল—শীগ্‌গির নেমে এসো। তিনি অসীম শক্তিতে গরুর শিং দুটো ধরে খালের জলের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যান। খালের নীচের দিকের মাটি অনেকটা শক্ত। এখন গরুটা পায় জোর করে দাঁড়াতে পারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নেয়।’

‘এবার এটাকে নিয়ে যাও সাঁতার কাটিয়ে ওপারের দিকে—ওপারের মাটি শক্ত, উঠতে কষ্ট হবে না। খুব বরাত-জোর তোমার, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেল।’

‘বাবু, এই পশ্চিম মুখ ফিইর‍্যা তোমারে দোয়া করি, তুমি লক্ষেশ্বর হও। তুমি আজ আমার যে উপগার করলা তা জান থাকতে ভুলুম না। কখনও ঠেকলে, একবার ডাইক্যা দেইখ্যো।’

খালের জলেই স্নান করে বিপ্রপদ একটা মরা খেজুর গাছের থাক-কাটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেন। এখন আর বেলা নেই। সূর্য নীলাভ গাছগুলোর ফাঁকে দূরে ডুবে গেছে। ছোট ছোট ডোঙা নায়ে হাটুরেরা ফিরে আসছে। দু একটা পাখীর ঝাঁক বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে। দু একটা দেখা যাচ্ছে আকাশের গায়।…

বিপ্রপদর হাসি পায়! আজ কি স্বামী স্ত্রীর জন্য বিধাতা এক বেলাই বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। একটা ভক্তি ভাবে তার মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

কয়েকটি মুসলমান তখন অজু করে নামাজ পরতে খাল পাড়েই একখানা গামছা বিছিয়ে নিল। পাশে তাদের চাষের যন্ত্রপাতি—কোথায় যেন এইমাত্র কৃষাণ খেটে এসেছে তারা। একটু যেন দেরীই হয়ে গেছে তাদের।

তখন চার পাশের বামুন কায়েত তাঁতি বাড়ী [illegible] শাঁখের আওয়াজ, কাঁসর-ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা গেল। একটা আলোড়ন [illegible] সান্ধ্য বাতাসে। ক্ষণিকের জন্য মুখর হয়ে উঠল গ্রাম্য নীরবতা। দীপা[illegible]ক দেখা গেল দূরে অদূরে। সুগন্ধী ধূপের অপূর্ব আবর্ত যেন ছড়িয়ে পড়ল [illegible]ল পাড় পর্যন্ত।

মুসলমানদের নতজানু হয়ে নামাজ পড়ার প্রণালীটা [illegible]পদর কাছে বড় মনোরম লাগে। তিনি চেয়ে থাকেন। ইচ্ছা করে, [illegible]র প্রার্থনার মাধুর্যটুকু আহরণ করে নিতে। এ গাঁয়ের বাসিন্দারা [illegible]দু, শুধু ওরা তিনটিতে মুসলমান—তবু যেন কি মধুর একটা সমন্বয় ঘটে আজ দিনান্তে!

তিনি সমস্ত পরিশ্রমের কথা ভুলে গিয়ে মুক্ত হৃদয়ে বাড়ী ফেরেন।

'একটা সুসংবাদ আছে মা ঠাকরুণ!'

'সংবাদটা কি, সরদারের পো?'

'বাবু কোথায়?'

বিপ্রপদ আগ্রহে বেরিয়ে আসেন।

'তুমি যখন নিতাই সরদারের মা তখন আমারও মা—নিতাই আমার মিতা। আদাব মাঠাইন—আদাব বাবু আদাব।'

বিপ্রপদ প্রত্যভিবাদন করেন—কমলকামিনী বলেন, 'সুখে থাকো। বসো, বসো। তোমার নাম কি?'

'ওর নাম ইমাম।' তার পর খুব ছোট্ট করে ওর মেয়ের বিবাহিত জীবনের করুণ কাহিনীটা বিপ্রপদ কমলকামিনীকে শুনিয়ে দেন।

অব্যক্তবেদনা মুসলমান কন্যার জন্য আজ এই পূর্ব-বাঙলার হিন্দু নারী আর চোখের জল সামলাতে পারেন না। তাঁর চোখ ঘন ঘন ভিজে ওঠে। তিনি কেন জানি অধীর হয়ে পড়েন।

ইমামের চোখে জল দেখা যায় না। ক্ষণিকের জন্য ওর চোখ দুটো রক্ত পিপাসু বাঘের মত জ্বলে ওঠে। সে বলে, 'কার জন্য কান্দ মাঠাইন? খোদার ধন খোদায় নেছে, তুমি-আমি করুম কি! কিন্তু ঐ শালা এন্তারে লক্ষীন্দরের খোপে রাখলেও আমি গিয়া ছোবল মারমু—ছাড়মু না।'

'মন সুস্থ করো মিতা। এখন তামাক খাও, তামাক খাও।'

ইমাম দাঁতে দাঁত চেপে হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরে।...সুস্থ হতে তার বেশ একটু সময় কেটে যায়। নিতাই তার হাতে সর্বদুঃখহারী তামাকের কল্কীটা দেয়। সে টানতে থাকে একমনে, আর কি যেন ভাবতে থাকে।

'বাবু, মামলায় জিত হয়েছে, নিলাম রদ হয়েছে। হুকুম শুনে কড়

ঘোষালের মুখখানা একেবারে চুন। আমি আর দেরী না করে অমনি কাছারীর মধ্যে দিলাম একটা সেলাম ঠুকে। হাকিম হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? আমি বললাম, আমি ওর মিথ্যা রাইওৎ, উনি আমার মিথ্যা হুজুর। তবু একেবারে খালি হাতে যাবেন কেন—একটা সত্যি সেলাম দিলাম ওকে পথ-খরচা। এজলাসের সব লোক হো হো করে হেসে উঠল।'

বিপ্রপদও একটু হাসেন।

'শিবপদ কোথায় ছিল, এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর, তারপর কি করল বুড়ো শয়তানটা? বললে না কেন যে, এমনি ধারা যদি মিথ্যে-মিথ্যে কেউকে হয়রান করো, দেবো ঘরের চালে রাঙা ঘোড়া ছুটিয়ে।'

'শিবে, তুই বড় উত্তেজিত হয়ে পড়িস একটুতেই। ও-সব কথা কি মুখে আনতে আছে? ও-রকম পাপের কাজ করলে কি রক্ষে আছে—তোর আমার কার ও ভয় নেই বল তো? বুদ্ধিমানের লড়াই বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে—আদালতে। সাবধান, ও-কথা আর মুখেও আনিস নে কখনও।' বিপ্রপদর কথায় শিবপদ চুপ করে যায়।

'তারপর শুনুন বাবু, বুড়ো ঘোষাল রাস্তায় বেরিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে বলল, 'তোর বাবা আমাদের জন্যে না করেছে কি? কত লাঠি সড়কি চালিয়েছে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে—এখন সময় দোষে যদি কিছু ঘটে গিয়ে থাকলে মনে রাখিসনে বাবা—বাড়ী গিয়ে আমার সংগে দেখা করিস, তোর নিমন্তন্ন রইল আমাদের বাড়ী। বল যাবি, মনে রাখবি নে এই সব? আমি আর কি বলি, হয়-নয় করে তার হাত ছাড়িয়ে এলাম। কুমীরের চোখের জল কি আমার আর দেখতে বাকি আছে!'

'এখন কি করতে চাও?'

'সেই জন্যই তো এসেছি। আপনি একটা বুদ্ধি দিয়ে দেন যাতে ওরা আর আমাকে হয়রান না করতে পারে গোপনে আর্জি দিয়ে।

আমার বাড়ীতে আর আদালতে প্যাদা না আনতে পারে কোনও সুযোগে। বড় ঝামেলা বাবু!'

'এর ওষুধ হলো, বলব কি—তুমি কি তা করতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারব—না পারলে চলবে কি করে?'

'তোমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি এক জন বিশ্বাসী লোকের নামে বেনামী করে রাখো গে। একটা মাত্র কবলা রেজিষ্ট্রী করতে হবে।'

প্রতি বছর অযথা উৎপাত নিবারণের এমন যে সহজ একটা পথ আছে তা নিতাই জানত না। সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। 'বলেন কি বাবু, এত সহজে নিষ্কৃতি পাবো, নির্বিবাদে ক্ষেত-খামার-হাট-বাজার করতে পারব? এ বছর আমি সময় মত ধান কাটতে পারিনি, খড় কুটো রাখতে পারিনি গরুর জন্য। উপোস করে কেবলই ছুটোছুটি করেছি সদরে। তাতেও কি রেহাই পেতাম, আপনি না সাহায্য করলে? আর দেরী না করে কালই আফিসে যাবো। কিন্তু এক জন লেখাপড়া-জানা পরিচিত চাই তো!'

'কেন, এই তো আমি রয়েছি সরদারের পো, তোমার ভাবনা কি?'

সকলে অবাক্ হয়ে যায়। আলোর সুমুখে বসে বাইরের দিকে চেয়ে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার শুধু গাঢ়তম মনে হয়। পেত্নীতে জবাব দিল না কি? কিন্তু গলাটা তো সকলেই চেনে। একটু হাসতে হাসতে সুমুখে এসে দাঁড়ায় দীনু।

'আমি ব্রাহ্মণ, তুমি বৈশ্য—তোমার কাজে কোনও দক্ষিণা চাই নে আমি—শুধু ছুটো টাকা ধার দিও, আসছে হপ্তায় শোধ করে দেব।'

'ছুটো টাকা কেন আড়াই টাকা দেব ঠাকুর ভাই, আপনি একটু দেখে-শুনে আমার কাজটা সেরে দেবেন—আমরা মুখ্যু লোক, ও-সব কাজ তো করিনি কোনও দিন।'

'তোমার কোনও ভাবনা ভাবতে হবে না, সরদারের পো—এই তো

বিপ্রপদ—তোমাদের বাবু—আমায় সবিশেষ জানে—আমি সব ঠিক করে দেবো। তুমি কেবল একটা সই করে দিয়ে খালাস। আফিসের পিওনটি থেকে হাকিমটি পর্যন্ত আমার সব চেনা। দেখবে, গেলে কি খাতিরটাই না করে! উঠে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়, আমি বসলে তখন সকলে বসে। তামাক-টামাক পাবে কোথায়—হাকিম সুগন্ধি ছিক্‌রেটের বাক্সটাই খুলে ধরে। একেবারে কতগুলো ছিক্‌রেট, কি মিঠে গন্ধ সরদারের পো—যদি একটা খেয়ে দেখতে!'

'আমরা চাষা-ভুষো লোক—ও-সব সাহেবী জিনিষ পাবো কোথায়, কে-বা দেবে আদর করে খেতে। ও-সব যুগ্যি লোকের জন্য। আচ্ছা, একটা ছিক্‌রেটের দাম কত আমাদের?'

দীনুও তা জানে না···

'টাকা টাকার কম নয় নিশ্চয়, কি বলো বিপ্রপদ?'

বিপ্রপদ চুপ করে শোনেন। দীনু সগর্বে এমনি বাস্তব অবাস্তব অনেক কথা বলে যায়। 'সরদারের পো, তুমি তো জানো না, কেন হুজুর দুনিয়া-ভরা লোক থাকতে আমাকে এত খাতির করে। তুমি ভাবতে পারো মিছে কথা, কিন্তু একটি বর্ণও মিছে বলে না এই মনু ঠাকুরের ব্যাটা দীনু ঠাকুর। সেবার নাতি হবে হুজুরের, মহা আনন্দের বিষয়—কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে না। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা। ডাক্তার বৈদ্য সব ফেল—আমরাই জলপড়া ও মা-মনসার-বস্তু যে মুহূর্তে দিলাম সেই মুহূর্তেই খালাস। বাস—আর কি চাই। কাছারী শুদ্ধু লোক আমাকে মাথায় করে নাচবে, না কি করবে, তাই ঠিক করতে পারে না। শরীরে গুণ থাকা চাই, সরদারের পো, খাতির পেতে হলে শরীরে গুণ থাকা চাই।'

'তা ঠিক বলেছেন ঠাকুর ভাই, ঠিক! গুণ থাকা চাই। বাবা বলতেন 'নিগুণো পুরুষ ভূষা'—আমরা হয়েছি তাই। একে ছোট লোক, তাতে না জানি লেখা পড়া।'

দীনু নিজের বাহাদুরী নিয়ে ব্যস্ত। তামাকে একটা জোর টান দিয়ে বলে, 'শোনো আর একটা ঘটনা—'

সকলে মসগুল হয়ে গিয়েছিল, বিপ্রপদ একটা বাধা দিয়ে বলেন, 'আর এক দিন শোনা যাবে। আজ রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'ও! ঠিক তো। আমারও যে গামছায় চাল বাঁধা। এই চাল যাবে, তবে ভাত রাঁধবে। এখন তা হলে উঠি—কাল একটু সকাল সকাল এসো, বুঝলে সরদারের পো।' ঘরে তামাক নেই, ছিলিম তিনেক তামাক নিয়ে দীনু উঠে পড়ে।

আজ আড়াই টাকার লোভে ব্রাহ্মণ দীনু অসংকোচে কম পক্ষে আড়াই হাজার মিথ্যা কথা বলে যায়, এতে তার এতটুকুও চিত্ত-বিকৃতি ঘটে না।

বিপ্রপদ ভাবেন: এরা গ্রাম্য পরগাছা—এদের বাস্ত ভিটাটুকু মাত্র সম্বল। অন্য দেহের রস শোষণ করেই এরা বেঁচে থাকবে। সেই জন্যই হয়ত তিনি রাগ করেন না। বরঞ্চ একটা সহানুভূতির সুরই তাঁর অন্তরে বেজে ওঠে। এদের অর্থ নেই, স্বাস্থ্য নেই, না আছে পুঁথিগত বিদ্যা—শুধু মাত্র সম্বল ক্ষুরধার বুদ্ধি। সেই বুদ্ধির বেসাতি না করে এরা খাবে কি? কি করে চলবে এদের জীবনযাত্রা? এদের বাঁচিয়ে রাখাও একটা ধর্ম। গ্রাম্য রাজনীতিতে এদের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। সত্য মিথ্যা সাক্ষী দিতে এরা ভয় পায় না—জাল জুয়াচুরি করতেও এতটুকু চঞ্চল হয় না। এরা অর্থের বিনিময়ে সকল পরমার্থ বিসর্জন দিতে পারে, দিতে পারে অতি প্রিয় বান্ধবের গলায় শাণিত ছুরিকা বসিয়ে—তাই এদের সম্বল করে প্রতিষ্ঠার সৌধ শিখরে উঠতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে শক্তিগড়ের সমস্ত কলহের ইতিহাসে।...

'কিন্তু দলিলটার গ্রহীতা কে হবে, নিতাই?'

'কেন আপনি।'

'না, না, আমি তা হতে যাবো কেন? আর তুমিই বা তা করতে যাবে কেন? তোমার কাকা, খুড়ো কি মামার নামে কর গে।'

'এখন আর আমাকে পরামর্শ না দিলেও চলবে। আমার মন যাঁকে চাইবে, তাঁকেই লিখে দেব।'

এমন দৃঢ় ভাবে নিতাই বলে যে, বিপ্রপদ আর কোনও উচ্চবাচ্য করেন না।

'রাত কম হয়নি, এখন খাওয়া-দাওয়া করে যাও সরদারের পো। তোমাদের কথা বোধ হয় শেষ হয়েছে।' কমলকামিনী বলেন, 'চলো বাড়ীর ভিতর—ঠাঁই পিঁড়ি হয়েছে তোমাদের।'

'না, না, মা ঠাকরুণ—আজ আর খাব না। আর এক দিন...'

'না না, তা কি হয়! তোমার লজ্জা, কি সংকোচের কিছু নেই। আমি ইমামের জন্যও ব্যবস্থা করছি। সে যখন তোমার বন্ধু আমারও ছেলে। কিন্তু মুসলমান ছেলে যে, ভাত খাবে না—এই দুঃখ। তোমরা দুজনে উঠে ভিতরে যাও—এখানে ইমামের কাছে আমিই রইলাম।'

একটা সুন্দর সতরঞ্চি বিছিয়ে তার ওপর একটা [illegible]ার গ্লাসে জল এনে রাখেন কমলকামিনী। দুখানা থালে আসে চিঁড়ে[illegible]। বাটি-ভর্তি আসে দৈ ও ক্ষীর।...একটু পরেই বিমলা দিয়ে যায় এ[illegible]টি মধু।...

'এখন তুমি ইচ্ছা মত নিয়ে খাও ইমাম। দেখো, [illegible] করলে কিন্তু আমি রাগ করব—তোমার বাবুও।'

আয়োজন দেখে ইমাম সংকুচিত হয়ে যায়। সে কি ভাবে বসে কি ভাবে খাবে দিশাই করতে পারে না। অমন নতুন সতরঞ্চির ওপর পা তুলতেই সাহস হয় না তার। কত রাজ্যের মাটি যেন তার পায়ে রয়েছে।

কমলকামিনী দেখিয়ে-শুনিয়ে ভয় ভাঙিয়ে দেন। বুঝিয়ে দেন কোন্‌টা আগে—কোন্‌টা খেতে হবে পরে।

ইমাম ধীরে ধীরে খায়। কিছুই ফেলতে পারে না পাতে। ইমাম শক্তিশালী এবং মহাসাহসী বলে দেশে তার খ্যাতি থাকলেও, কমলকামিনীর সুমুখে কিছু পাতে ফেলে উঠে যেতে তার সাহসে কুলায় না। সুবোধ ছেলের মত তার সব কিছু খেয়ে উঠতে হয়। সে উঠে এসে বলে, 'তুমি মিতার মা—আমারও মা। কও তুমি আইজ থাইক্যা আমারে ছাওয়ালের মত জানবা। না হইলে এ খাওন মিথ্যা।'

কমলকামিনী স্মিত মুখে সম্মতি জানালেন।

'তুমি মধু দিয়া পরিচয় করলা, আমারে চিরদিন মধুর চোখেই দেইখ্যো মাঠাইন।'

এ কথার আর কি জবাব দেবেন কমলকামিনী! ছেলে আনন্দে মুখর হয়ে উঠলে জননীর এমন কি সাধ্য আছে যে তার আবোল-তাবোলের উত্তর দিতে পারেন!

এমন সময় নিতাই ও বিপ্রপদ খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাইরে আসেন। আমরা সব শুনেছি বড়বৌ, সব শুনেছি—এতগুলো ছেলের ঝক্‌কি কি তুমি একা সামলাতে পারবে?'

'একা সামলাব কেন, তুমিও তো রয়েছ।' বলে কমলকামিনী ইমামের উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলো নিয়ে ঘাটের দিকে চলে যান—সংগে বাতি নিয়ে যায় বিমলা।

'তারপর তোমরা তো আর এলে না ইমাম। তালুক বিক্রির বিষয় তো আর কিছু জানালেও না।'

'সেন মশাই না কি এখানে নেই! বাড়ী গেছেন—কোন ঢাকার জেলায়। সদরে এলে এরা খোঁজ নিয়ে জানাবে আপনাকে। পথে পথে এ সব কথাই ইমাম বলছিল আমাকে। ওরা ওৎ পেতেই আছে—ওদের ঘুম নেই।'

'আচ্ছা বেশ।'

মুখ যখন ওরা বের করেছে তখন কচ্ছপের মত সুর ভিতরে টেনে নেবে না—সে রক্তে ওরা জন্মেনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'বেশ, আমি যেখানে থাকি খবর দিও।'

অন্ধকার রাত। চোখে কিছু দেখা যায় না। দু বন্ধুতে দুটো নারকেল পাতার মশাল জালিয়ে মাঠের পথে নেমে পড়ে। জোয়ারের জল ছোট ছোট সোঁতা খাল দিয়ে তখন মাঠে এসে পড়েছে। আসছে মাসে আরো বেশী জল উঠবে মাঠে—চাষের মরসুম এলো বলে—এমনি নানাবিধ আলোচনা করতে করতে ওরা হেঁটে চলে। দূর থেকে ওদের চলার শব্দ শোনা যায়···ছপ্‌, ছপ্‌, ছপ্‌।···

সেদিন রাত্রে হঠাৎ দীনুর তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়।···

আজ তার গভীর নিদ্রা হওয়ার কি জো আছে! কত চিন্তা তার মাথায়! আগামী কাল একটা ঘোর পরিবর্তন হবে শক্তিগড়ের রাজনৈতিক আকাশে। এমন পরিবর্তন দশ-বিশ বছরের মধ্যে যে হয়েছে তা তার স্মরণ হয় না। একটা গন্ধকের কাঠি জ্বলন্ত তুষের তাওয়ায় চেপে ধরে কেরোসিনের ডিবাটা সে জ্বালায়। আফিংয়ের কৌটোটা খুলে কয়েক রতি আফিং সে মুখে দেয়। এবার তামাক সেজে নিয়ে ভাবতে বসে:

বড্ড চাল চেলেছে বিপ্রপদ। একেবারে এক চালেই মাৎ। ঘোড়ার না, ব'ড়ের না—একেবারে দাবার। একটি পয়সাও ব্যয় না করে, প্রায় ষাট-সত্তর বিঘে ধানী জমির ও হবে কবলাগ্রহীতা। আগামী কাল ওর জীবনের একটা শুভ দিন। নিতাই বেটা চাষা, একেবারে বেকুব চাষা! তা না হলে কি এমন সোণার ফসল-ফলা জমি কেউ কারুর নামে করে বেনামী? শুধু জমি না, ঘর বাড়ী মায় গরু বাছুর পর্যন্ত। আর 'জরুটা' বাকী না রেখে ওটাও কবলা করে দিলে হতো কি? এক দিন তো

ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে ওর বিপ্রপদর বাড়ী গিয়েই উঠতে হবে। সে পথ তো বেশ নিষ্কণ্টক করে দিল নিজের হাতেই ও। হায় রে মূর্খ! দলিলখানা বিপ্রপদ এক দিন মিঠা কথায় হাত করবে।

এ যে এক হিসেবে সেনের তালুকের চেয়েও ঢের মূল্যবান সম্পত্তি। আর কিছু নয়, ধানী জমি। বিনা টাকায়, বিনা ক্লেশে শুধু একটু বিশ্বাসের মূলধন খাটিয়ে কিনে নিল। আবার কেউ বিপ্রপদকে প্রবঞ্চকও বলবে না—কারণ নিতাই দিচ্ছে স্বেচ্ছায় লিখে। গ্রহীতার নামটা উল্লেখ না করলেও কি দীনুর বুঝতে দেরী হয়! তার বুকটা যেন কাঁকড়া বিছায় দংশন করতে থাকে।···এই ত পাশাপাশি বাড়ী। ওঁর জুতের ঘর, আর তার কি না খড়ের। নিতাই কি তার নামে বিশ্বাস করে দলিল করতে পারে না? ও তো আর নিতাইর পাকা ধানে মই দেয়নি? তবে ওকে এত অবিশ্বাস কেন? দীনু একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যাহ্নিক না করে জলও স্পর্শ করে না। ও কি যেতো ওর জমির ধান খেতে? শুধু একটা সম্মান। কি চাও মনু ঠাকুরের ছেলে দীনু ঠাকুর মহাবিশ্বাসী—মহা সৎ, ঠিক বাপের মত গুণী। তাই তো নিতাই ওর নামে করেছে এমন সোণার সম্পত্তি বেনামী! থুথু ফেলে সেদিকে ও চাইত, কিন্তু নিতাই লিখে দিলে ও সম্পত্তি তো দূরের কথা, হীরা-জহরৎ হলেও, সে সেদিকে একটি বার ফিরেও তাকাত না। ভিক্ষা করে যেমন দিন যাচ্ছিল তেমনি দিন কেটে যেত। ও কত দূর নির্লোভ, কতখানি নিষ্পাপ, তা তো যাচাই করা হলো না!···

নিতাইটা একেবারে গজ-মূর্খ। তার চেয়ে বেশী নাকি কে জানে? ওর সম্পত্তি পরের ভোগেই লাগবে। তবে বিপ্রপদর স্থানে দীনু ভটচায হলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? ওর অপরাধ ও দরিদ্র? ওর মানুষ বলে যতটুকু ওজন থাকা চাই তা নেই এ জগতে? ও নিঃসম্বল পিতার ঔরসে জন্মেছে—জন্মাবধি ও সুখের মুখ দেখেনি। যখন বিপ্রপদ

লেহ্য-পেয় খায়, ও চুপ করে ঘরে বসে ঝিমায় দু হাঁটু বুকে করে—এ সব যদি ওর অপরাধ হয় এবং তা দূর করার আর যখন কোনও পন্থাই নেই, তখন ও একটা রাহাজানী করবে—বুদ্ধির রাহাজানী। বিপ্রপদর নামের জায়গায় শুধু ওর নামটা বসিয়ে দেবে। আর ইংরেজ রাজার গোমস্তার হাতে দেবে টেবিলের তলা দিয়ে ছুটো মাত্র টাকা গুঁজে। এখন শুধু একটু হুঁ বললেই রেজেষ্ট্রী। নিতাইটা ভ্যাবাচাকা খেলে ও-ই না হয় নিতাইর মত করে আনুনাসিক স্বরে ছোট্ট করে, হুঁ-টা বলে দেবে। তার-পর টিকিটখানা 'বরাত' নেওয়া অতি সহজ। দীনু জীবনে কখনও পাপের কাজ করেনি, পরম বৈষ্ণবের মতই দিন কাটিয়েছে। কেবল একটি বার ডাকাতি করবে—একটি বার! তার পর ঐশ্বর্যের অন্তরালে বসে শ্রীভগবানের নাম করতে করতে এই পার্থিব দিন কয়টা কাটিয়ে দেবে। সে আর কাউকে, এমন কি বিধাতাকে পর্যন্ত বিরক্ত করবে না!…

কিন্তু যখন নিতাইটা সব টের পাবে, যখন সমস্ত কারসাজী ধরা পড়ে যাবে তখন সে কি করবে? গোঁয়ার-গোবিন্দটা কাউকে কিছু বলবে না, তলিয়েও দেখবে না কিছু—একটা সুতীক্ষ্ণ ল্যাজা নিয়ে ছুটে আসবে—ওর হৃৎপিণ্ডটা লক্ষ্য করে বসিয়ে দেবে। দীনু তন্দ্রার ঘোরে উঃ উঃ করে ওঠে।…

ওর কাজ কি এত ঝামেলায়। ওর আড়াই টাকাই ভাল। ওর এক সপ্তাহ দিব্যি কেটে যাবে মৌতাতে।

৮

সেই বোসেদের সুপারি বাগানের এক প্রান্তে ছোট খালটার ওপর ভেসে যাওয়া সাঁকোটা কে যেন ঠিক জায়গায় এনে রেখেছে।

বিপরীত দিক থেকে এসে দুজনের সংগে দেখা ঐ এক গাছের সাঁকোটার ওপর—উভয় প্রান্তে। বেলা তখন দুপুর উতরে গেছে।

কিন্তু তা এই ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে দেখে বোঝা যায় না। এখানে রোদ তেমন কড়া নয়। বেশ স্নিগ্ধ। মাঝে মাঝে গাছগুলো নড়লে ঝিকমিকিয়ে কালি ফালি রোদ এসে পড়ে তির্যক ভাবে। সোণালীর মুখের ওপর ও চুলের ওপর অমনি একখানি আলো দুলছে, ছায়াও এসে পড়ছে।

'তোমায় যদি ফেলে দেই তবে কেমন মজা হয় সোণালীদি? এই—এই দিলাম ফেলে—এই সাবধান।'

'এই দুষ্টু ছেলে, 'চারটা' দোলায় না, দোলায় না অমন করে! ওরে আমি যে পড়ে যাবো ভাই!'

'পড়ে গেলে আমার কি?' অমরেশ আর একটু ঘন দোলা দিয়ে বলে, 'আমার কি পড়ে গেলে? আমার গায় তো আর কাদা লাগবে না?'

'থাম, ভাই, থাম—আমি আগে পেরিয়ে আসি।'

অমরেশ তবু দোলা দেয়—সোণালীর ভীতি-বিহ্বল মুখখানা দেখে হাসে। সে কি যে-সে ছেলে!

'অমরেশ, ঐ দেখ, এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যাচ্ছে—গুণতে পারিস কটা? বাইশটা না পঁচিশটা—কটা দেখ ত গুণে!'

'কই, কোন দিকে?'

'ওই তো ঠিক তোর মাথার ওপরে। বলতে বলতে সোণালী সাঁকোটার অপর প্রান্তে এসে হাসতে থাকে। 'হিঃ হিঃ হিঃ, কেমন জব্দ!'

'এ্যাঁ এ্যাঁ, মিথ্যে হাঁস দেখালে কেন?'

'না হলে তুই যে দুষ্টু ছেলে, আমাকে ফেলে দিতিস খালের মধ্যে—অসময়ে কাদা মেখে ভূত সেজে উঠতাম। হয়ত হাত পা ভাঙত, তোর খুব ভাল লাগত, না রে?'

'উহুঁ, এখন কোথায় যাবে বলো?'

'যে দিকে দুচোখ যায়।' সোণালীর কণ্ঠে হঠাৎ একটা অপূর্ব পরিবর্তন আসে। চল অমরেশ, আমরা চলে যাই যে দিকে দুচোখ যায়, তোর সংগে এক পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে।...আমার আর ভাল লাগে না ভাই—ওরা কাল আবার আমায় নিতে আসবে।' সোণালীর দুচোখ আজ কেন জানি জলে ভরে ওঠে। এই স্নিগ্ধ মেদুর আধো আলো আধো ছায়ায় ঘন বাগানের নির্জনতায় তার মনে হয়, ওই যে অতটুকু অমরেশ ও যেন রাজপুত্র। সমস্ত বিপদ বিঘ্ন থেকে ওকে যেন উদ্ধার করে নিয়ে চলে যেতে পারে এক অজানা স্বপ্নের কল্পলোকে।

অমরেশেরও মন নেতিয়ে পড়ে। ও যেন কবে কার কাছে শুনেছে, সোণালীর মূর্খ স্বামীটা ওকে মার-ধর করে। রাগ হয়—মূর্খটাকে ওদের ঘরের রামদাটা এনে কেটে ফেলতে ইচ্ছে হয় ও।

'তুমি যদি না যাও, আমাদের ঘরে লুকিয়ে থাকো, কেমন হয় তা হলে? ওরা খুঁজে হয়রাণ হয়ে ফিরে চলে যাবে।'

'দূর পাগলা, তা কি হয় রে?'

এ যে কেন অসম্ভব, তা সোণালী বুঝতে পারলেও, অমরেশ পারে না। সে ম্লান মুখে কামিনী ফুল গাছটার তলে বসে পড়ে। সোণালীও এসে তার পাশে বসে।

আবার স্বপ্নলোক ভেসে আসে।...

'তার চেয়ে চল, তুই আর আমি ময়ূরপংখী নায়ে চড়ে রূপকথার দেশে যাই।'

'কোন পথে যেতে হয় ভাই, তা তো আমি জানিনে!'

'আমিও তো জানিনে অমরেশ!'

'ব্যাঙোমা-ব্যাঙোমীর কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবো।'

'তারা কোথায় থাকে, কোন বনে, কোন নদীর ধারে, কে বলে দেবে আমাদের?'

'কেন মেজ মা—সে-ই তো রোজ গল্প বলে। আজ জেনে নেবো তার কাছ থেকে।'

কৈশোরের ফুল-বাগিচায় নিরালায় ওরা বসে আছে। ওরা নিরালায় স্বপ্ন দেখে—কত দুঃখ জানায় সোণালী! তার বুকের বোবা ব্যথাগুলি ফুটে ওঠে কথায় কথায়। অমরেশ হয়ত বোঝে, হয়ত সকল বোঝেও না! তবু ভাল লাগে পাশটিতে বসে দরদ দিয়ে শুনতে। ইচ্ছা করে মুছিয়ে দিতে ওর সোণালীদির চোখের জল!....

আবার নতুন ছন্দে কথা বলে সোণালী।

'হ্যাঁ রে, অমরেশ, তুই গজমতির হার দেখেছিস?'

'না।'

'পাতালপুরীর রাজকন্যা দেখেছিস্?'

'না।'

'বলতে পারিস, সে রাজকন্যা দেখতে কেমন?'

'হয়ত এই তোমার মত হবে দুধে-আলতা রঙ।'

অন্য দিন হলে সোণালী হয়ত লজ্জা পেতো, রাঙাই হয়ে উঠত ওর কথায়। আজ সে কল্পলোকে মগ্ন হয়ে গেছে। তৃষ্ণার্ত আত্মা তার কল-কল্লোলিনী জলধারা দেখেছে।

'রাজকন্যার ক মহলা বাড়ী?'

'সাত মহলা বাড়ী, চারদিকে তার ফুলের বাগান। হীরা-পান্নার সব ফুল দিয়ে ভুর ভুর করে গন্ধ বের হচ্ছে।'

'কোন পালংকে শোয় সে, জানিস, বলতে পারিস?'

'প্রবাল-পালংকে। শিয়রে তার মণি দীপ জ্বলছে। আমি যেন দেখছি, ঠিক তুমি শুয়ে রয়েছ।'

'গজমতির হার পেলে তুই কি করিস অমরেশ?'

'ঘুমন্ত রাজকন্যার গলায় পরিয়ে দি।'

সোণালী চোখ বুঁজে যেন স্পর্শ-সুখ অনুভব করে।

এভাবে বিভোর হয়ে তাদের যে কত সময় কাটত বলা যায় না। হঠাৎ একটা মেঘ ভেসে আসে দক্ষিণা বাতাসে। শুকনা লতাপাতা ঝর ঝর করে ওঠে। সুপারি গাছগুলো মাথা দোলাতে থাকে। যেন অনেকগুলো চামর ঢুলাচ্ছে কেউ। একটা রাধাঝুমকার লতা শিউলী গাছটার আশ্রয়চ্যুত হয়। অমরেশ ছুটে যায়। একগুচ্ছ ফুল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। গাছটা একেবারে শীতলা তলায়, তাই সে যাওয়ার সময় মা শীতলাকে মনে মনে প্রণাম করে নেয়। সোণালীও উঠে আসে। ফুলের গুচ্ছটার প্রতি তারও নজর পড়েছে। সেও ছোটে। কে আগে আনতে পারে? সোণালী না অমরেশ? অমরেশেরই জয় হয়। প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে সোণালী হাঁপাতে থাকে। ধরি ধরি করেও সে ধরতে পারল না! অমরেশই ছিঁড়ে নিল। ওর অন্য দিন হলে হয়ত দুঃখ হতো, আজ আর তা হয় না। নিলেই বা ও। সে তো চলেই যাচ্ছে। আবার কত দিন পরে দেখা হবে কে জানে? সোণালীর চোখে জল আসে। কার জন্য, কেন সে কাঁদে, সঠিক বুঝতে পারে না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

অমরেশ বলে, 'তুমি এই সামান্য ফুলের জন্য কাঁদছ? ছিঃ ছিঃ! এই নেও, এই নেও ফুল—ও আমি কত পাবো, কত তুলব, কত বিলোব—তোমাকে তো আর দিতে পারব না! এই নেও, কেঁদ না সোণালীদি।' তার খোঁপায় রাধাঝুমকার গুচ্ছ পরিয়ে দেয় অমরেশ।

হাওয়া থেমে যায়—মেঘ অদৃশ্য হয়। ফালি-ফালি রোদ হাসতে থাকে —ওরাও হাসে। কতক্ষণ আর দুঃখ বাসা বাঁধতে পারে ওদের বুকে, এই বয়সে!

থালের ওপারে অমরেশদের বাগানে একটা আম গাছ মুকুলে

মুকুলে ভরে গেছে। মৌমাছিরা ঘুরে ঘুরে গুনগুনিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদিকে নজর পড়তেই অমরেশ বলে, 'সোণালীদি, পাকা তেঁতুল দিয়ে আমের মুকুল মেখে খাবে? ঐ দেখো, কেমন দেখাচ্ছে থোকা-থোকা মুকুলগুলো।'

তেঁতুলের কথা উঠতেই দুজনের জিভে জল আসে। কি মিষ্টি পাকা তেঁতুল! মুকুল দিয়ে মাখলে গন্ধে আমেজ করবে।

'মুকুল না হয় পাড়া গেল কিন্তু তেঁতুল পাড়বে কে? যে উঁচু গাছ, পড়লে কি আর রক্ষে আছে!'

'হুঁ, পড়ব না আরও কিছু। সেদিন কত বড় বটগাছে উঠে টিয়ার ছা পেড়ে আনলাম। সেই উই কুমুদদের গাছ থেকে।'

'তবে যা, পেড়ে নিয়ে আয় তেঁতুল। মুকুল পাড়তে আমিই পারব।'

'তুমি পারবে? ভালই—আমি যাই তেঁতুল আনতে।'

'আমাদের বাড়ী যাস চুপ করে রান্নাঘরের পিছনে, বুঝলি?'

সোনালী লাফিয়ে লাফিয়ে একটা আম গাছের ডাল টেনে ধরে—দু তিন থোকা মুকুল পাড়ে—পেড়ে বাড়ীর দিকে চলে যায় ডালটা ছেড়ে দিয়ে। ডালটা সড়াৎ করে ওপরের দিকে উঠে দু চার বার দোলা খেয়ে স্থির হয়।

নুন লংকা দিয়ে সোণালী বেশ করে ওগুলো মাখাতে থাকে রগড়ে রগড়ে। অমরেশও এসেছে কথা মত। যতক্ষণ সোণালীর মাখা শেষ না হয় ততক্ষণ ও বসে এক রগ তেঁতুল চাটে। কি মিষ্টি! চাটতে চাটতে জিভে কেবলই জল আসে।

'এমন তেঁতুল কোনও দিন খাইনি সোণালীদি।'

মাখা শেষ হলে নরম পাতলা জিভটার ডগায় ফেলে সোণালী একটু চাখে। 'ঠিক হয়েছে, এই নে অমরেশ।'

'তুমি এতখানি নেবে আর আমি এতটুকু? আর একটু দাও ভাই, আর একটু—'

'নে—বেশী খেলে অসুখ করবে।'

'তোমার বুঝি করবে না—খুব চালাক মেয়ে!'

'আমার করলে তো ভালই!' একটু গাঢ় কণ্ঠে সোণালী জবাব দেয়, 'ওরা নিতে এসে ফিরে যাবে।'

'তা হলে আর একটু নেবে নাকি আমার ভাগ থেকে? নেও না, নেও!' অমরেশ বলে, 'একটু জ্বর হলে আর হয় কি! দিব্যি কাঁথা মুড়ি দিয়ে হুঁ-হুঁ করবে—ওরা ফিরে যাবে—যাক চলে।'

'তুই ভেবেছিস, ওরা ফিরে যাওয়ার মানুষ! একটু জ্বর দেখলেই আমায় ফেলে যাবে? কক্ষনো না। ওরা যমের মত বসে থাকবে, না নিয়ে যাবে না।'

'তা হলে কি করবে?'

'সব চেয়ে ভাল হয় আমার জ্বর যদি খুব বেশী হয়—মরে যাই আমি। তবু মার কোলে শুয়ে তোদের দেখতে দেখতে মরব—কেমন অমরেশ, তাই ভাল না?' আবার সোণালীর চোখ ভিজে ওঠে।

অমরেশ তাড়াতাড়ি বলে, 'না না না। তা হলে কাজ কি অতখানি তেঁতুল নিয়ে—বেশী বেশী টক খেয়ে।'

০

পরের দিন সোণালীর স্বামী আসে, ওকে নিয়ে যাবে।

লোকটা দেখতে নিতান্ত কদাকার।

অমরেশ কাছে ঘেঁযে না ওদের! দুবার উঠানের ওপর দিয়ে রান্নাঘরের কোণে এসে গোপনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুঁজে গেছে সোণালীকে। আজ সোণালীর বের হওয়া নিষেধ। মার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ—শাসন রূঢ়।

হঠাৎ এক ফাঁকে অমরেশকে দেখতে পেয়ে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সোণালী। হাসতে হাসতে ওকে নিয়ে একটা ঝাপড়া-ঝুপড়ো পাতা বাহার ও কামিনী কুঞ্জের মধ্যে যায়। এখানে প্রায় প্রত্যহ দিনের বেলা বসে চব্বিশ ঘুঁটি বাঘ-চাল খেলে ওরা দুজনে। স্থানটা বেশ পরিষ্কার ও খুবই নির্জন।

হাসতে হাসতে অমরেশের গায়ের ওপর. সোণালী গড়িয়ে পড়ে, অতর্কিতে একটা চুমো খায় ওর গালে।

খাড়া ঝিলকির মত অমরেশ চমকে ওঠে। সে রাগ হবে, না ছুটে পালাবে দিশা করতে পারে না। সে গন গন করতে থাকে।

'দেখনা ছেলের রকম! দিদিরা বুঝি তোকে চুমো খায় না!'

'দিদিরা তোমার মত অসভ্য না।'

'আর গোঁজ হয়ে থেকো না—তোমার সংগে আর ঠাট্টা করব না।'

'তুমি ও রকম করলে আর কক্ষনো আসব না তোমার কাছে।'

'দোষ হয়েছে, মাপ চাই—আর তোর সংগে ফাজলামি করব না—এখন হলো তো? অমরেশ, একটা রাক্ষস দেখবি? মারতে পারবি? একেবারে জ্যান্ত রাক্ষস!'

'কোথায় রাক্ষস?' অমরেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'কোথায় সোণালীদি, রাক্ষস কই?'

'ঐ দেখ!' বলে সোণালী অমরেশের হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসে—একেবারে নিজেদের উঠানে। একটু আবডালে থেকে বলে, 'ঐ দেখ, আমাদের বারান্দায় খাটের ওপর বসে।'

'কই?'

'ঐ তো।' সোণালী নির্বিকার চিত্তে তার স্বামীকে দেখিয়ে দেয়।

অমরেশ বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে।

রাক্ষসই বটে।

ইমাম ও নিতাই এসেছে আবার। ওদের সংগে দুজন মানুষ। এক জন স্ত্রীলোক, অপরটি পুরুষ। স্ত্রীলোকটি হিন্দু—পুরুষটি মুসলমান। স্ত্রীলোকটি নিখুঁত সুন্দরী না হলেও, ওর রূপে, গড়নে, চলনে এমন একটা কিছু জ্বালা আছে, যা দেখলে, পুরুষের চোখ টাটায়। ও জাতে ধোপা, নাম সুখী। ওর পরনে একখানা দামী ছেঁড়া শাড়ী। গত বার যখন এ-বাড়ীতে এসেছিল তখন ওর কাপড়ের অবস্থা দেখে কমলকামিনীই ওকে দিয়েছিলেন।···মুসলমান যেটি এসেছে তার দেহ ক্ষীণ—চোখে একটা নিরাশার দুর্বল ছায়া।

এদের উভয়ের নালিশ ঘোষালদের বিরুদ্ধে।

দেশের মধ্যে বিপ্রপদই এখন বর্ধিষ্ণু—মানে সম্মানে টাকা পয়সায়। তার কাছে এলেই বোধ হয় সকল পুরোন জটিল ব্যাধি, দুঃসহ ক্ষত নিরাময় হবে—দূর হবে সকল জ্বালা।

বিপ্রপদ সকলকে বসতে বলেন। স্ত্রীলোকটি ব্যতীত সকলে এসে পাশাপাশি বসে। শুধু সুখী একটু গুণ্ঠন টেনে দূরে স[illegible] গিয়ে ভিন্ন-মুখী হয়ে একটু মুচকে মুচকে হাসে এবং আংগুলে আঁচলটা [illegible]তে থাকে।

বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'ওর নাম? বাড়ী কোথা[illegible]

ইমাম উত্তর দেয়, 'বাড়ী এই শিউড়ী। নাম রহিম সেখ—রমজানের ছাওয়াল—সেই ফকির রমজান। নাম শোনেন নাই তার?'

'শুনেছি। কি জন্য এসেছে ও? রমজান তো এখন আর বেঁচে নেই—সেবার নাকি মাথায় বাজ পড়ে মারা গেছে।'

'হয় বাবু। ওর মাথায়ও বাজ পড়ছে, তয় ওর জানডা শক্ত দেইখ্যা ও মরে নাই।'

'মানে?'

'মিতা, এখন কও বাবুরে সব।'

নিতাই বলে, 'ওর যেন বাবু স্মরণ শক্তিটাই নষ্ট হয়ে গেছে। যদি একটা সুবিচার না হয়, তবে হয়ত মানুষটার মাথাই খারাপ হয়ে যাবে। দুঃখ হয় ওর মুখের দিকে চাইলে!…ওর দুটো ছেলে একটু বড় হয়ে উঠেছিল। চাষ-আবাদ করত ঘোষালদের জমি। কৃষাণ খেটে বাপ মা ও ছোট ছোট ভাই বোনকে খাওয়াত। ওরা ঐ ঘোষালদেরই ঘর ভিটি প্রজা। ডাকা মাত্র হাজির হওয়া চাই। প্রতি বছরের মত এবারও ওরা গেল ঘোষালদের ধান আনতে বিলে। একটা গেল বাঘের পেটে—আর একটা মরল সাপের ঘায়। সাক্ষাৎ যম যেন ওৎ পেতে ছিল দক্ষিণের বিলে। ঘোষালদের কিছু বেশী খরচ হল বটে, কিন্তু এক কণা ফসলও নষ্ট হয়নি, এমন ভাবে খবরদারী করে রেখে ওরা মরেছিল।

'তুমি এ-সব এমন করে জানলে কি করে, নিতাই ?'

'রহিমের বৌটা ঘোষালদের শেষ কালের ঘা-টা আর সামলাতে পারেনি, মারা গেছে এই অল্প কদিন হয়। সে-ই মরণ কালে ইমামকে খবর দিয়ে নিয়ে, বলে গেছে। আমিও গিয়েছিলাম ওর সাথে।'

'তারপর ?'

'ছেলে দুটো মরল বটে, কিন্তু লোকে এখানে সেখানে বলাবলি করত, এমন নেমকের গুণ মেনে চলে খুব কম লোকেই। ওরা না গেলে এ দেশে এমন কোনো লোক ছিল না যে ঐ বিলে যেতো ধান আনতে! বরাবর ওরা চাষ ক'রে, বিনা খরচে ধান ঘরে এনে দেয় ঘোষালদের, তাই ওরা বছর ভরে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত মনে পরের সর্বনাশ করে।'…

'ইমাম, তামাক খাও।' বিপ্রপদ বলেন।

'রহিম নিতান্তই গরীব। ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে পাঁচ ছটা লোক, একটার গায় আর একটা ঠাশাঠাশি করে শোয়—শিথানের বালিশ নেই,

না আছে একখানা কাঁথা—কটা মেটে বাসন ... কলসী মাত্র সম্বল—কলসীটা আবার ফুটা। আমরাও গরীব বটে, নেবু আনতে আমাদেরও পান্তা ফুরায়, কিন্তু এরা যে কি, তা ধারণা করা যায় না। একটা দিন, সময়ন্তে একটা বেলা না খাটলে হাঁড়ি চড়ে না। যদি খাটিয়ে ভাইদের কখনও শরীরের কল একটুও বেকল হয় তা হলে অমনি উপোষ। সাত সরিকের বাড়ী—ভাগে একটা নারকেল গাছও পায় না, বছরে চার গণ্ডা পয়সা নেই আয় ফসল থেকে!'

একটু জিরিয়ে নিয়ে নিতাই আবার বলতে সুরু করে, 'এক দিন এদের পূর্ব-পুরুষেরা ভালই ছিল—বাড়ীতে সরিক-সরাকত ছিল না বেশী। জমিতে ধান, গোয়ালে অন্তত চাষের গরু, গাছে প্রচুর ফল ছিল। দু বিঘে ভদ্রাসন ভাগ হতে হতে একটা তামার টাটও রাখার স্থান নেই এখন। রাখলে অমনি ঝগড়া, অশ্লীল গালাগালি। তবু এরা ভদ্রাসন আঁকড়ে কুকুর-কুণ্ডলী দিয়ে কি মোহে যে পড়ে থাকে তা ওরাই জানে!...ফাগুন, চোত, বোশেখ, জোষ্ঠি ওরা দেশে করে কৃষাণের কাজ—কোনও প্রকারে আধ-পেটা খেয়ে চালায়। তারপর চাষ-আবাদ করতে যায় কোনও বিল-বাঁদাড়ে, জোক-পোকের মুখে। চাষের মরসুমে মনিবেরা চারটি পেট-ভরা খেতে দেবে, এই তো প্রলোভন। আর ভাবে: যখন তারা চারটি ধান নিয়ে ঘরে ফিরবে তখন বাপ মা ভাই বোনদের শুকনা শরীরে লাগবে একটু মাংস—ওরা আনন্দে হাসবে। দু এক দিন দু এক সের চাল নিয়ে হাটেও যেতে বলবে কিছু বেসাতি আনতে। কত দিন ওরা শুকনা লংকা খায়নি, একটু পেঁয়াজ-রসুনের মুখ দেখেনি!'

নিতাই কি ভেবে কি বলে একমাত্র সে-ই জানে কিন্তু বিপ্রপদ যেন শুনতে পান, ওর কণ্ঠে সমস্ত বাংলার ভূমিহীন কৃষাণ মজুরের মর্মব্যথা ধ্বনিত হয়ে উঠছে। তিনি চুপ করে শুনতে থাকেন।

'রহিমের ছেলে দুটো যখন আর দেশে ফিরল না, তখন তাদের কৃষাণ-

খাটা ভাগের ধান ঘোষালদের গোলায়। রহিম অবশ্যি তা জানে না। ও প্রথম কিছু দিন শোকে দুঃখে কাটায়। পরে ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে প্রবোধ দেয়ঃ ভয় কি তোদের, বাবুরা রয়েছেন। যাদের জন্ত ছেলে দুটো জান কবুল করল, তাদের বুড়ো বাপ মা, নাবালক ভাই বোন কি না খেয়ে মরবে? ধান দেশে এলে দেখিস বাবুরা তোদের ভাগের ধান বাড়ী বয়ে দিয়ে যাবেন। আমরা নেমক্‌হারাম হতে পারি, আমরা ছোট লোক। বাবুরা কক্ষনো তা হতে পারেন না। রহিম ছেলে মেয়েদের নিয়ে ভিক্ষা করে, ধানের আশায় কাটায় কিছু দিন। এতগুলো পুষ্যির ভিক্ষায় পেট ভরে না। লোকে বলেঃ এখন টন্‌টনিয়ে বেড়াও, খাটতে পারো না? ছেলে মরেছে বলে তো ক্ষিদে মরেনি?...'

এমন সময় রহিম একটা চাপা শ্বাস ত্যাগ করে। বিপ্রপদর কানে তা যায়। তিনি মুখ তুলে ওর মুখের দিকে চাইতে ভয় পান।

'রহিমের মনটা বাবু ঘোষালদের বাড়ী যাবো-যাবো করে। আবার লজ্জাও হয়। হয়ত ধান-পান আসেনি। তাই ওঁরা খোঁজ-খবর নিচ্ছেন না এদের। যদি ও গিয়ে ওঠে লজ্জা পাবে বাবুরা। কাজ কি তাঁদের লজ্জা দিয়ে! ওরা না হয় আরো দুদিন কষ্ট করবে। ধান এলো বলে!'

নিতাই এবার গলার স্বর একটু পরিবর্তন করে একটু বিষাদের হাসি হেসে বলতে থাকে, 'এর মধ্যেও বেকুব আবার স্বপ্ন দেখে। ধান ঘরে এলে যাট যোয়ান ছেলে দুটো, খেত তো। তাদের খোরাকীটা এখন বেঁচে যাবে। আর ওদেরটা তো আছেই। কিছু দিন, এই হপ্তাখানেক ও একটু ফুরসুৎ পেলে—এর মধ্যে কয়েক কাঠি ধান ভেনে চাল তৈরী করে হাটে নেবে। চাল বেচে ধান কিনবে, বাড়তি চালটা খাবে। এমনি করে কায়ক্লেশে ওরা টিকে থাকতে পারবে—হয়ত কিছু ধানের জমা বাড়তেও পারে। এ রকম তো ওদের গাঁয়ে কত লোক বেঁচে আছে। ওদের চেয়ে সুখেও আছে। কেউ উঠানে এসে দাঁড়ালে পান-তামাক

দিয়ে আপ্যায়িতও করতে পারে। ছেলেমেয়েরা শীতে হিঃ হিঃ করে কাঁপে না। ও সব জানে, সব বন্দেজ করতে পারে—কিন্তু এত দিন পারেনি শুধু জমার অভাবে। খেয়ে-দেয়ে ও কোন দিন আট কাঠি ধানের জমা কল্পনাও করতে পারেনি। আট কাঠি ধানের কি বা দাম! মাত্র চার টাকা। কত গেরস্থের তো হাঁস-মুরগীর খোরাকীও ওর বেশী। যোয়ান জল জ্যান্ত ছেলে ভুগে মরেছে, মুস্কিল বটে! কিন্তু যত মুস্কিল তত আসান। এ খোদারই মেহেরবাণী। ও বুড়ো মানুষ, একা খেটে সংসার রাখবে—তাই ওর জন্য খোদাই না কি এ পথ করে রেখেছেন।'

নিতাই থামতেই বিপ্রপদ বাধা দেন, 'থেমো না—থেমো না, বলে যাও। তারপর—?

'তারপর বাবু, কিছু দিন যায়, ঘোষালেরা খোঁজ-খবর নেয় না। এখন উপোষে পেট-পিঠ ফোঁড়া যায়। ছেলেমেয়েগুলোর বুঝি হাঁপাতেও কষ্ট হয়। ওরা জিজ্ঞাসা করেঃ আর কত দিন দেরী বাপজান ধান আসতে? ছোট মেয়েটা বলেঃ নুন দিয়ে একটু ফ্যান খেতাম! কত দিন পেট ভরে খাইনি ফ্যান। রহিম না কি তখন আশ্বাস দেয়ঃ সবুর কর—সবুর কর। ফ্যান খাবি কেন, দিব্যি মোটা চালের ভাত খাবি। আর দুটো দিন! কিন্তু মনটা ওর হতাশায় ভেঙে পড়ে। বাবুরা কি আর ফাঁকি দেবেন? ও আবার নিজেকেই নিজে আশ্বস্ত করে। না, না, তা কিছুতেই সম্ভব না। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা! ও আর ভাবতে পারে না। সকাল বেলাই ঘরে ঢুকে শুয়ে থাকে। সেদিন ভিক্ষায়ও বের হয় না।'

শুনতে শুনতে বিপ্রপদ যেন অধীর হয়ে পড়েন। নিতাই একটু থামতেই তিনি আবার বলে ওঠেন, 'থামলে কেন নিতাই, বলে যাও।'

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে নিতাই বলে যায়, 'তারপর সব ক্ষেত্রে যা হয়, এখানেও তাই হলো! না খেয়ে খেয়ে ছেলে

মেয়ে দুটো এমন হলো যে, মা বাপের একটু চোখের আড়ালে যেতে পারলেই ওরা গিয়ে ঘুরত এ-ঘর ও-ঘরের আনাচে-কানাচে। মনে আশা, কেউ সাধে না কি একটু ফ্যান নিয়ে, কেউ ডাকে না কি দুটো ভাত নিয়ে। ওরা এক দিন বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওদের চাচির ঘরে নাদুস-নুদুস ছেলে দুটোর খাওয়া দেখছিল। তাদের পাতের কাছে কত ভাত পড়ে! ওদের জিভ ভিজে ওঠে। চাচির চেহারা কেমন তেল-কুচকুচে—আর ওদের মার পাঁজরার হাড় কখানা গোণা যায়। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওদের চোখ চারটে জ্বলছে। ওদের চাচি তা দেখতে পায়। ছুটে আসে ঝাঁটা নিয়ে—ওদের কপালে মুখে পিঠে ক ঘা বসিয়ে দেয়। সোরগোলে রহিমের বৌ বেরিয়ে আসে, খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে ঝগড়া করে খানিক—তাও পারে না, ওতেও শক্তি চাই—কলিজায় বল থাকা চাই—পূরো দস্তুর খানা-পিনা চাই।

ইমাম মন্তব্য করে, 'খোদা!'

নিতাই থামে না, একটা গামছা দিয়ে মুখ মুছে বলতে থাকে, 'এখন ওরা চারটি প্রাণী বসে থাকে দাওয়ায়—চারটা পেত্নীর কংকালের মত। কখন হয়ত ঘোষালদের বাড়ীর প্যাদা আসবে, কাউকে না দেখলে হয়ত ফিরে যাবে। বাবুরা কি বাড়ী বয়ে ধান দিয়ে যাবে নাকি? তাতে তাঁদের মান থাকে, না সম্মান বাঁচে? রহিমকে খবর দিয়ে নেবে। ওদের তো ধান পাওনা কম না! প্রায় বিশ কাঠি। বর্ষাকালে যা ধার করে এনে খেয়েছে সুদসমেত তা কেটে কুটে দিয়েও পনর ষোল কাঠি আনতে পারবে। না হয় আর দুকাঠি কম হবে। অত চুল-চেরা হিসেব কি রহিম মনিবদের সংগে করতে যাবে? দূর, দূর! লোকে বলবে কি? নিতান্ত ছোট লোক! রহিম বরঞ্চ দু দশ সের বেশীও ছেড়ে দিয়ে আসবে। ফের বর্ষাকাল আসবে, এই রোদ আর হপ্তার পর হপ্তা দেখা যাবে না। ওই আকাশটা

গোঙানি আর চোখের জল থামবে না। চার দিকে করবে জল থৈ থৈ! তখন যদি কিছু ধার কর্জ আনতে হয়? এক দিন অসন্তুষ্ট হলে আর এক দিন দেবেন কেন?…বাবু, বলব কি, তখনও এই মুখ্যুটা ঘোষালদের মন রেখে চলতে চায়!'

বিপ্রপদ বলেন, 'নিতাই, এ তো অস্বাভাবিক নয়। ওর মত অবস্থায় যে না পড়বে সে বুঝবে কি করে ওর দুঃখ। ওর কি তখন জ্ঞান-বিচার থাকতে পারে?'

'তা ঠিক বাবু। যাক, তারপর শুনুন—ছেলে দুটো ওর কি ভালই ছিল, মরে গিয়েও বাপ মা ছোট ভাই বোনদের জন্য রোজগার করে রেখে গেল! সত্যি সত্যিই এক দিন ঘোষালদের বাড়ী থেকে প্যাদা এসে উঠল ওদের দাওয়ায়। ওরা ওদের কি করে যে সন্তুষ্ট করবে তা ভেবেই পায় না। একটু তামাক নেই, পান নেই ওদের! যে জা ঝাঁটা দিয়ে মেরেছিল ছেলে-মেয়ে দুটোকে, সেই জার কাছেই গিয়ে হাত পাতল রহিমের বৌ এক ছিলিম তামাক আর গোটা দুই বড় পানের জন্য। আজ আর তার লজ্জা করে না। কেনই বা করবে? আর দু এক দিনের মধ্যেই তো তাদের ধান আসছে। তখন তারা ইচ্ছামত হলুদ মরিচ পান তামাক কিনে আনবে, দরকার হলে দেবে ধার। ওদের এ অবস্থা খোদার দোয়ায় আর কদিন!'

'রহিম প্যাদার সংগে সংগেই যায়। কষ্ট হয় ওর ঠ্যাং দু… নিয়ে চলতে ওই যোয়ান তাগড়া মর্দটার সাথে। রহিমের সাথেই না কি যাবে ছেলে-মেয়ে দুটো। মা শুধু জল দিয়ে মুখ মুছিয়ে আংগুল দিয়ে রুক্ষ চুলগুলো একটু আঁচড়ে দিয়েছে। ওরা ঘোষালদের বৈঠকখানায় গিয়ে ওঠে। তখন অনেক লোকজন—নানাবিধ কথাবার্তা, নানাবিধ লেন-দেন হচ্ছে। ওদের দেখেই বড় ঘোষাল উঠে আসে। বলে: তোমার ছেলে দুটো ছিল বড্ড নেমক-এক্তারি। কিন্তু হিসেব ছিল না মোটেই। মরে

গিয়েও আমাদের যা সর্বনাশ করে গেছে, তা তোমাদের কাছে বলব কি! তোমারও হালে পানি রেখে যায়নি। বর্ষা কালে যা দাদন নিয়ে খেয়েছে, এখন আর এক গোটাও হিসেবে পায় না। তবু দেখ, আমাদের অধর্মের সংসার না, তাই তোমাকে প্যাদা পাঠিয়ে ডেকে এনে এক কাঠি ধান দিচ্ছি। তুমি ছেলে-পেলে নিয়ে খেয়ো, দোয়া করো। ঐ ধান কাঠি বাপু উঠানে মেপে রেখেছি, নিয়ে যাও—ইচ্ছা হলে হিসেবটাও দেখে যেতে পারো।'

'ছোট ঘোষালটি মাঝখান থেকে বলে উঠল: দাদার বড় দয়ার শরীর! এজমালী জিনিষ দিয়ে দান-ধ্যান করতে উনি চিরদিনই ওস্তাদ! শুনছ রহিম, ওই ধান থেকে আমার ভাগের বার সের ধান তুলে রেখে বাকীটা তুমি নিয়ে যেও। আমার ভাগেরটা আমি দিতে রাজী নয়।'

'বড় ঘোষাল তখন বলে: ছোট, তুই দিন দিন বড্ড চামার হয়ে যাচ্ছিস, চুপ কর।…'

'রহিম তখন ফিস্ ফিস্ করে জবাব দেয়, ও আমি কিছু নেব না, এই আমি চললাম। ও টলতে টলতে নেমে আসে।'

সব শুনে বিপ্রপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। অবশেষে বলেন, 'নিতাই, এক কাঠি চাল আর আট কাঠি ধান আমার গোলা থেকে মেপে ওর বাড়ী এক্ষুনি পৌছে দিয়ে এসো।'

এত কাল পরে রহিমের চোখে জল দেখা যায়।

'বাবু, এ তো একটা ব্যবস্থা হইল, বিচার?'

'যে দিন বিধাতা আমাকে সে ক্ষমতা দেবেন সে দিন আমি চুপ করে থাকব না।'

সে দিন সুখীর কাহিনী আর শোনা হয় না। ওকে আর এক দিন আসতে বলা হয়।

গ্রাম্য রাজনীতির ক্ষেত্রে পট-পরিবর্তনের সময় এসেছে।

স্বভাব-ভীরু তাঁতিরাও তাঁদের মাকু ঠেলার তালে তালে রাজনীতির আলোচনা করে। লাঙ্গল চালাতে চালাতে গ্রাম্য চাষারাও নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে। প্রাচীনপন্থীরা ঘোষালদের কায়েম রাখতে চায়। নবীনপন্থীরা চায় নতুন কোনও ব্যক্তিত্বকে সিংহাসনে বসাতে। মুখে-মুখে জনমত গঠিত হয়ে ওঠে। প্রচার চলে মুখে মুখে। দ্বন্দ্ব হয় নবীনে প্রবীনে। যে যার প্রতিপক্ষকে দমন করে, আক্রমণ করে, বিপর্যস্ত করতে চায়।

বুধবার প্রত্যুষে এমনি একটা আলোচনা হচ্ছিল ধোপা বাড়ীর প্রাংগণে। রজনী শীল জাতে নাপিত, কিন্তু পেশা ও ডাক্তারী, কখনও কবিরাজী, কখনও বা ওঝালি! ও এসেছে ধোপা ওষুধ দিতে। সংগে একটা পুরোন পিতলের ঝাঁপি। তার মধ্যে ওর সপেন্সারী। ঐ ঝাঁপির মধ্যে এক কোণে একটা ডিপার্টমেণ্টও আছে, যা ইংরাজীতে বলে সার্জিকেল ডিপার্টমেণ্ট। একটা দেশী নরুণ, একট দেশী ক্ষুর ও একখানা কাঁচি নিয়ে এই ডিপার্টমেণ্টটি বহু দিন ধরে থা য়ে আছে। ব্যাখ্যা করে বললে বলতে হয়, মান্ধাতার আমল থেকে। জ্ঞরা বলেন: রজনী ঘরে বসে যে ক্ষুর দিয়ে তার শিষ্য, যজমান সংগোপনে ক্ষৌরি করে, বাইরে এসে সেই ক্ষুর দিয়েই দুষ্ট ব্রণ নির্মূল করে।

সে পান চিবোতে চিবোতে আরম্ভ করে, 'বিদেয়-আদায় চিরদিনই ঐ ঘোষাল বাবুদের বাড়ী ভাল। ও-বাড়ীতে আমার ওষুধ-পত্তর যেমন চলে, তেমনি মাসুলটাও মেলে। বনেদী ঘর কিনা, একটু সর্দি হলেই ডাক্তার চাই।'

ধোপা বৌ জবাব দেয়, 'কিন্তু বাবুরা কোন দিন একখানা কাপড়ও

কাচায় না বা মা ঠাকরুণরা মাস কাপড় ছাড়া একখানা শাড়ীও ধুতে দেয় না। আমরা পান চুনও ফেরি করি, কখনও তো একটি পয়সার পান চুনও কোনও ভাই কেনে না! আর মানুষ দেখলে যে অবেজ্ঞা! ভুলে গেছ সেদিনের কথা?'

কথাটায় রজনীর বুকেও আঘাত লাগে। কারণ এই শক্তিগড়ের হিন্দু সমাজে শুভ কাজে যাওয়ার সময় তার মুখখানা দেখাও না কি ঐ ধোপা বৌর মুখ দেখারই সামিল! সে তো স্পষ্টই এক দিন নিজের কানে শুনেছে—ছোট ঘোষাল যাবে সদরে কি একটা কাজে, বড় ঘোষাল বলছে : আগে ধোপা পাছে নাই (নাপিত), সে কাজে যেও না ভাই। ধোপা বৌও এসেছিল মাস কাপড় নিতে, না, কি করতে যেন উঠানে, এমনি অশুভ যোগাযোগ! রজনী বলে, 'আর ও-সব সামাজিক বড় বড় কথা নিয়ে তোমার আমার মাথা ঘামান চলে না। তবে ঐ যে পান-চুন-কাপড়-কাচানর কথা বললে, ওসব তারা ব্যয়-বাহুল্য মনে করে—হাজার হলেও তারা বনেদী হিসেবী লোক কিনা!'

'তা হলে তারা বাবু না ঘোড়ার ডিম! আর আমাদের বোসেরা উঠতি ঘর হলেও বাবু বটে! গেলে তুসের চুনও কিনবে, দশখানা শাড়ীও কাচতে দেবে। ঘরে মজুত পান থাকলেও মা-ঠাকরুণ তুগোছ পান কিনে রেখে দামের চেয়েও বেশী এক সের চাল দিয়ে দেবে। আর ওদের বাড়ীর এতটুকু ছেলে মেয়ে পর্যন্ত দেখলেই বসতে বলবে—পানের বাটাখানা তাড়াতাড়ি এনে দেবে। বাবু কত দিন ঘুম থেকে উঠে আমার মুখ দেখেছেন, কই, হেসে ছাড়া তো কথা বলেননি!'

'আরে ও হাসি মুখের, মনের না। সব শেয়ালের এক রা।'

ধোপা বৌ সজোরে প্রতিবাদ করে, 'মিথ্যা কথা। তোমার ওষুধ আমরা খেতে পারি, ঘোষালেরা রাখতে পারে, কিন্তু যাদের দুটো কাঁচা পয়সা আছে, বিদেশে পাঁচটা ডাক্তার-বদ্যি দেখেছে তারা রাখবে কেন?

ঘোষেদের আর সেদিন নেই যে তোমার মেটে বড়ি সস্তা কড়ি দিয়ে গিলবে।'

ওর কথার ঝাঁজে রজনী জ্বলে ওঠে। 'যত বড় মুখ না তত বড় কথা! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি ঘোষাল বাবুদের বাড়ী, এক্ষুনি গিয়ে বলছি তোমার অহংকারের কথা।'

মুখরা সুধীর মাও সহজ পাত্রী নয়, সে বলে, 'যাও না, যাও—আমি কারুর খানাবাড়ীর রাইওৎ না যে ভয়ে গর্তে ঢুকোব!'

ধোপা বৌর উচ্চ কণ্ঠ শুনে দু-চার জন করে লোক জড়ো হয়। দাঁড়িয়ে দেখে আর হাসে।

রজনী শ্লেষের স্বরে বলে, 'মানুষ দেখলে অবেজ্ঞা করে ঘোষাল বাবুরা। বলি, ধোপা দেখলে কি নাচবে তারা, না বাজনা বাজিয়ে তুলবে ঘরে—'

কোমরে কাপড় জড়িয়ে চুনের পাতিলে জল ঢালতে ঢালতে ধোপা বৌ জবাব দেয়, 'মুখ সামলে কথা বলিস নাপিতের পো, ভুলে যাস নে যে তোর মুখ দেখলেও অযাত্রা!'

'কি, নাপিত-ছাঁপিত যা-তা বলবি?'

ধোপা বৌ ঘরে যায়। লোকে ভাবে, এই রে, ঝাঁটা আনতে গেল বুঝি—নিয়ে আসে অন্য জিনিস। 'এই নে তোর মেটে বড়ি, আর কক্ষনো আমার বাড়ীমুখো হসনি মুখ্যু-বদ্যি।'

'আমি মুখ্যু! আর তোকে ছুঁলে যে জাত যায়, তুই হলি বুদ্ধির ঢেঁকি!'

'হারামজাদা নাপিত, তোর এত বড় কথা, দাঁড়া হারামজাদা, তোকে একটু শিক্ষে দিয়ে দি।' বলে ধোপা বৌ চুনের পাতিলটা তুলে রজনীর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে! পাতলা পাতিলটা ভেঙে-চুরে চুরমার হয়ে ওকে চুনে-চুনে একাকার করে দেয়।

রজনী ধবলবর্ণ শৃগালের মত ঝাঁপিটা ফেলে পালায়।

ধোপা বৌ গোখুরা সাপের মত ফোঁস্-ফোঁস্ করতে থাকে। 'জনমে-মরণে যাদের না হলে চলে না, তাদের ছুঁলে জাত যায়—একটু বসতে দিতে হাত খসে পড়ে!' তার ইচ্ছা করে যে এই সব অবজ্ঞাকারী লোকগুলোকে তার মুড়ো ঝাঁটাটা দিয়ে এক চোট ঝেঁটিয়ে বায়ু রোগ ছাড়িয়ে দেয়।

সেই সময় নিতাই প্রবেশ করে, 'ধোপা বৌ, তোমার মেয়ে কোথায়?'

নিতাইকে দেখেই ধোপা বৌ ত্বরায় ক্ষিপ্রা অভিনেত্রীর মত রূপ পরিবর্তন করে—সংহারিণী মূর্তি সহসা অতিথিবৎসলা হয়ে ওঠে। 'এসো এসো সরদারের পো, এই দাওয়ায় উঠে বসো। সুখী একটু তামাক দে মা। তোমরা কি চাও, এখন বাড়ী যাও।'

ধোপা বৌকে গ্রামের সকলে চিনত, কেউ আর দেরী করতে সাহস পায় না। একে একে সরে পড়ে।

'কাল বাবুর সময় হয়নি, আজ সব শুনবেন।'

ধোপা বৌ বলে, 'আমরা কোনও দর দস্তর করব না—একটা পয়সাও চাই নে, ওর যা ধম্মে কম্মে নেয় তাই যেন করেন।'

'তোমাদের কোনও ভয় নেই। তোমরা তো কিছু পাচ্ছ না—যদি তোমাদের একটা পথ করে দিতে পারি, তা হলে চিরদিন বসে বসে খেতে পারবে। বাবু কোনও দিন জাল-জুয়াচ্চুরি ঠকাঠকি পছন্দ করেন না—তোমাদের এমন সুযোগ ছাড়া উচিত না।'

'সে কথা কি আমরা বুঝি নে! অত বড় লোক কি আমাদের ঠকাবে? এমনি কত লোকের উবগার করছেন।'

এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে একটি মৃতকল্প লোক বলে, 'সুখী, আমাকে একটু জল দে মা।'

সুখী জল নিয়ে যেতেই সে জলের ভাণ্ডটা পাশে রেখে পিপাসার

[illegible] বড় [illegible] বলে, 'খন্ন ঠেকিয়ে কান্না-কাটি করে তুই দে গে নিখে বাবুকে। কপালে থাকলে তোদের ওতেই সুখ হবে। দেশের ছোট বড় যাকে বিশ্বেস করে তাঁকে তোরাও বিশ্বেস কর গে। মরণ-কালে বলে যাচ্ছি, তোদের ওতেই ভাল হবে। তোর মা মাগীকে কিন্তু বিশ্বেস নেই—ওর মন টুস টুস করছে।'

সুখী একটু হেসে চলে যায়।...

নিতাই বসেছিল—একটু পরেই সেজে গুজে নিতাইর সাথে সুখী রওনা হয়। ধোপা বৌ তাকে সাজিয়ে দেয়। যে কাজের জন্য সুখী যাচ্ছে—সজ্জাটা তার চেয়েও বেশী বলে মনে হয়। চোখে কাজল, খোপায় ফুল।

১১

বিপ্রপদ অন্দর মহলে বসে যেন কি একটা দলিল দেখছিলেন।

নিতাই গিয়ে পায়ের ধুলো নেয়—সুখীও তদনুকরণ করে। দুজনকেই ইংগিতে বসতে বলেন বিপ্রপদ। 'আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, বিশেষ কাজে আমাকে কোথায় যেন শিবচর কাছারীতে বদলী করেছে। সেই জন্য এখন আর বড় বৌর আমার সংগে যাওয়া হবে না। ভালই হলো—উনি বাড়ী থাকলে মেয়েদের দু একটা সম্বন্ধ আসতে পারে। কিন্তু আমার একটু অসুবিধা হবে। তা হোক।'

'কবে পর্যন্ত যেতে চান?'

'এই দু চার দিনের মধ্যেই—বলতে গেলে কি, এখন আর পরের গোলামী করতে ইচ্ছা করে না।'

কমলকামিনী ছিলেন নিকটেই দাঁড়িয়ে, বলেন, 'এত বুড়োও তুমি হওনি বা এমন পয়সাও তোমার নেই যে বসে বসে খাবে। ও আলস্য!'

'তা ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ!'

'মেয়েদের বিয়ে হলো না, ছেলেমানুষ হয়নি—এর মধ্যে এত আলস্য হলে চলবে কেন ?'

বিপ্রপদর মনে একটু আঘাত লাগে, বলেন, 'না, না, ও কথার কথা বলেছি—জীবনে এমন কিছু করিনি যে ছুটি চাইতে পারি।'

নিতাই ও সুখী বুঝতেই পারে না যে এই ধনী পরিবারের অভাব কোথায়। এত থাকতেও কেন এরা সুখী নয় !

কমলকামিনী যা বলেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। এতগুলো যাঁর পোষ্য, তাঁর চাই বিস্তীর্ণ ধানী জমি। দেশে যে জমি আছে তা অতি সামান্য—তিন মাসের খোরাকীও হয় না। নগদ টাকা এদিক-ওদিক ঘোরে—বছরে এক সময় চাল কেনা পড়ে। লোকে বুঝতে পারে না, পুরোন ধান সর্বদা গোলায় মজুত থাকে। ও ধান খোরাকীতে খরচ না করে বর্ষাকালে ধার কর্জ দেওয়া হয়। মাঘ ফাল্গুনে তা আদায় হয়ে যায়। এত যে জৌলস, তার কোথায় গলদ, তা গৃহিণী কমলকামিনী মর্মে মর্মে জানেন। বিপ্রপদ যে জমি চান, তা এ দেশে মিলবে কোথায় ? এখানে বহু লোকের বাস, যদিও বা পাওয়া যায় এক আধখণ্ড, তা লবণ-পোড়া দর। তা কিনে কি এগুন যায়, 'না আশা মেটে ! তিনি চান বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড—বিঘার পর বিঘা তাঁরই জমি, তাঁরই ধান। কোনও সরিক নেই, ভাগী নেই—শুধু তাঁর, একান্ত তাঁরই জমি। এক নজরে সীমানা নির্দেশ করা যায় না, বর্ষায় সবুজের বন্যা, পৌষে সোনার ঢেউ। এ জমির সন্ধান তাঁকে কে দেবে ?

নিতাই বলে, তিনশ কি চারশ বিঘে নাল (ফসলের) জমি এক বন্দে। তার দক্ষিণ সীমানায় একটা বিল—তাতে যেমন মাছ, তেমনি পাখী। এই মেয়েটিই একমাত্র ওয়ারিশ।'

বিপ্রপদ চমকে ওঠেন, 'বলো কি ! তিনশ কি চারশ বিঘে নাল জমি একবন্দে—তার একমাত্র ওয়ারিশ আমাদের ধোপা বৌর মেয়ে সুখী !'

'হ্যাঁ বাবু, আমি কি মিছে বলছি? এই দেখুন নক্সা, এই দেখুন পরচা।'

উপস্থিত সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ওর কাপড়-চোপড় যতই ধোপ-দুরস্ত হক, তার সংগে এ ঐশ্বর্যের সামঞ্জস্য কোথায়? অন্ধকারে যেমন একটা স্ফুলিংগ জ্বলে ওঠে, তেমনি করে মুহূর্তের জন্য এই ধোপার মেয়ে সুখী জ্বলে উঠে—এমন কি কমলকামিনীকেও যেন ম্লান করে দেয়।

কাগজ-পত্র বিপ্রপদ দেখে বলেন, 'এখন ও চায় কি?'

'বেচতে চায়?'

'জমি এখন কার দখলে?'

'ঘোষালদের।'

'ঘোষালদের!' বিপ্রপদ প্রশ্ন করেন, 'তার মানে?'

নিতাই বলে, 'বড্ড কষ্ট করে ওর এক দাদাশ্বশুর, এই জমি করেছিল। তখন জমিতে ধান হতো না—হতো শাপলা আর শালুক, পানিফলের জলো লতা। পাঁচ সাত হাত জল! শাপলা আর শামুক বেচে খাজনা দিয়েছে এই আশায়, যে পর পুরুষে হয়ত বিল জাগবে, চর পড়বে, তারা সুখ স্বচ্ছন্দে ভোগ দখল করবে। কিন্তু বুড়োর এমনি কপাল, নিজের দু দুটো বিয়ে—একটা বৌরও ছেলে হল না। বরঞ্চ ধারে কাছে যারা ওয়ারিশ হবে তারাও গেল মরে। তখন বুড়া সুখীর নামে একটা দানপত্র করে যায়। সে আজ প্রায় দশ বছরের কথা। ঘোষালরা এই সব কেমন করে যেন টের পায়। একটা জাল মেয়েমানুষ খাড়া করে একটা ভুয়ো দলিল নেয় রেজিষ্ট্রী করিয়ে। তারপর করে সুখীকে বেদখল। ওরা যেমন গরীব, তেমনি দলিল-পত্রও বোঝে না, সেই থেকে চুপচাপ।'

'হুঁ।' বিপ্রপদ একটু চিন্তা করে বলেন, 'ব্যাপারটা বেশ জটিল

এবং কঠিনও বটে—ঘোষালদের মর্মস্থলে গিয়ে ঘা লাগবে। কিন্তু এ বিবাদ তো কেউ টাকা দিয়ে কিনবে না। প্রতিপক্ষ দুর্দান্ত ও মামলাবাজ। সুখীরা কি চায় ?'

'ওরা টাকা পয়সা কিছু চায় না। মামলা মোকর্দমা নিষ্পত্তি হলে কিছু জমি চায়।'

'তা মন্দ না। আচ্ছা, যদি বছর বছর কিছু কিছু ধান দেই তবে কেমন হয় ?'

'সে ব্যবস্থা আরো ভাল—ওদের কোন ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হলো না।'

'কিন্তু জমি দখল করতে লোকজন চাই—দাংগা হাংগামা খুন জখম হতে পারে, এ সব করবে কে ?'

'তার জন্য ভাববেন না বাবু। আমি আর ইমান থাকলে হাজার লোক ফিরিয়ে দিতে পারব দুখানা লাঠি দিয়ে।'

'কিন্তু তোমরা তা করতে যাবে কেন ? কি স্বার্থ তোমাদের ?'

'আমরা চাষা-ভূষো লোক, স্বাত্থ-টাত্থ বুঝিনে—বুঝি, ডাক পড়লে জান দিয়ে মান রাখতে হবে।'

'তা হলে কালই দলিল রেজিষ্ট্রী কর।'

নিতাই বলে, 'আমারও তাই ইচ্ছা। তোর মত কি সুখী ?'

আগুনের টুক্‌রার মত সুখী শুধু হাসে।

কমলকামিনী ভাবেন: ছোট লোক!

বিপ্রপদ বিরক্ত হন।

নিতাই বলে, 'বাবু, ওর মত আছে।'

পরের দিন অবশ্য দলিল রেজিষ্ট্রী হওয়া অসম্ভব। এত বড় একটা দলিল লিখতেই প্রায় দু তিন দিন সময়ের দরকার। নিতাইকে পাঠান হলো ষ্ট্যাম্প কিনতে। সে ষ্ট্যাম্প কিনে খুঁটি-নাটি কথা জেনে আসবে। সন্ধ্যার সময় নিতাই ছ ক্রোশ পথ হেঁটে বৃথাই ফিরে এলো। এখানের আফিস ছোট, এত দামী ষ্ট্যাম্প পাওয়া যাবে না। জেলা থেকে আনতে হবে। আর একটা কথা নিতাই জেনে এসেছে, সেইটাই বিশেষ জটিল কথা। কবলার মূল্য কত লিখতে হবে এবং নিয়ম সে টাকাটা কবলা-দাতার স্বীকার করে নিতে হবে যে নগদ বুঝে পেয়েছি। সাধারণত দাতা স্ত্রীলোক হলে এঁ নিয়মটা বিশেষ কড়াকড়ি ভাবেই প্রযুক্ত হয়। বিপ্রপদ নগদ টাকা দেবেন না। যদি আফিসে গিয়ে রেজিষ্ট্রীর সময় সুখী কারুর পরামর্শ মত গোলমাল করে, কিম্বা হাকিমের কাছে বলে যে, আমি নগদ কিছু পাইনি। তখন দলিল তো রেজিষ্ট্রী হবেই না, বরঞ্চ এই ষ্ট্যাম্পের টাকা ও অন্যান্য যাবতীয় খরচের ব্যয় সম্যক নষ্ট হবে। আগে ওদের ডেকে বিস্তারিত বুঝে-সুঝে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাজে লাগতে হবে। স্ত্রীলোকের মন টলতে কতক্ষণ? নিজের দলিল রেজেষ্ট্রী করতে গিয়ে ইদানীং নিতাই পাকা হয়ে গেছে। অনেক ভাল মন্দ দেখেছে সে। তাই পূর্বাহ্ণেই আঁট-ঘাট বেঁধে যাবে। বাবুর টাকার মমতা ওর নিজের টাকার চেয়েও বেশী। দলিল লেখার পর যদি এমনি একটা গোলমালে রেজিষ্ট্রী পণ্ড হয়ে যায়, লোকে মুখে চুন কালি দেবে—যারা ভিতরের কথা না জানবে তারা ঠক-জুয়াচোর বলবে। একটা বিধবা স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করতে এসেছে এতগুলো লোক দল বেঁধে। এ কথা গ্রামেও এসে ছড়িয়ে পড়বে কাকের মুখে।

বিপ্রপদ নিতাইর মুখে সব শোনেন। তাঁর মনে বিগত দিনের

সুধীর হাসির ভংগিটা চকিতে খেলে যায়। কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়। মনটা সংগে সংগে তিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'নিতাই, কাজ নেই এত ঝঞ্ঝাটে—সুধী সহজ মেয়ে নয়।'

নিতাই বলে, 'বিনা ঝঞ্ঝাটে কি হয় বাবু? কোনও কাজই তো হয় না। এতগুলো জমি, বিশেষ করে উঠতি (চাষের যোগ্য) জমি, বিল শুকিয়ে যাচ্ছে—আর কি কখনও কোনও সুযোগে হবে?'

কথাবার্তা শুনে কমলকামিনীও এসে বিপ্রপদর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেন, 'ওঁর চিরদিনই ঐ এক দেখলাম—এগোতে সংকোচ পিছোতে লাজ। ও-করে কি কোনও কাজ হয়? যা করবে তা ধর-মার করে করে ফেলতে হয়।'

'আমি কি না বলছি নাকি? তবে দেখে শুনে তো করতে হবে।'

'বেশী কিছু দেখার দরকার নেই—দলিলটা শুদ্ধ কি না তাই শুধু দেখ।'

'আমিও তো তাই বলছি!' বিপ্রপদ ধাক্কা খেয়ে বলেন, 'আমিই তো তাই বলছি, তুমি ভুল বুঝলে কেন?'

'বেশ, তা হলে আমার কথা তুলে নিলাম।'

নিতাই বলে, 'বাবু ধান যখন উঠবে তখন ধানের রাশ হবে পাহাড়ের মত উঁচু। কি করে যে সে সকল জমি আবাদ করে ফসল জন্মাতে হয়, তা ঘোষালেরা জানে না, ওরা বিলের চরে দু চার বিঘে চাষ করিয়ে সারা বছর বসে খায়। কিন্তু আমি চাষার ছেলে, আমি জানি সব। দিব্য চোখে দেখছি মা-লক্ষ্মী হাসতে হাসতে বোসের বাড়ী নেমে আসছেন। এখন একটু ঝঞ্ঝাট করে মাকে বরণ করে ঘরে তুলতে হবে।'

বিপ্রপদর মন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'তুমি বরণ কুলো সাজাও নিতাই তোমার মা ঠাকরুণকে নিয়ে—আমি তো তোমাদের সংগে-সংগেই আছি।'

বিদায় নিয়ে নিতাই চলে যায়।

কত দূর গিয়ে নিতাই হঠাৎ ফেরে। একটা কথা তার মনে পড়েছে। সে মেঠো-পথ ছেড়ে আবার গ্রামের দিকে ঘুরে চলে। রাতও মন্দ হয়নি—অন্ধকারও কম নয়। মাঠের মধ্যে তবু তারার আলোতে দিশা পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রাম্য পথে যেন অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। যে ঘন নারকেল সুপারি বাগান! মোটে কিছু ঠাহরই করতে পারে না নিতাই। কোন রকমে সে এক বাড়ীতে উঠে নারকেল পাতা চেয়ে নিয়ে ছোট ছোট গোটা চারেক মশাল তৈরী করে। এবং একটা জ্বালিয়ে নিয়ে হাঁটতে থাকে। তবু পথের পাশের ঝোপ জংগল এড়ান যায় না। বেতের শাণিত আঁকড়া পরম বান্ধবীর মত নিতাইর কাপড়-চোপড় টেনে টেনে ধরে। জরুরী একটা বৈষয়িক পরামর্শের জন্য যাচ্ছে, এখন আর যেন এ সব ভাললাগে না—সে মহা বিরক্ত হয়ে আঁকড়াগুলো ছাড়াতে গিয়ে কাঁটার ঘা খায়। আর একটু এগোতেই পড়ে একটা সাপের সুমুখে। সাপটা ফোঁস ফোঁস করে একেবারে ফুঁসিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এখনই বুঝি ছোবল মারবে। নিতাই একটা আর্তনাদ করে ভিন্ন পথে লাফিয়ে পড়ে ঘুরে চলে। বাপ রে, কি কাল কেউটে! তার বুকের ধড়ফড়ানি থামতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। সে মশাল ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সাপটা পিছনে পিছনে আসছে না কি। নিতাই মনে মনে ভাবে, 'যে মাগীর পাল্লায় পড়েছি তার সুরুতেই এই, এখন শুভে-লাভে কাজটা হলে বাঁচি।'

'ঠাকুর ভাই, ঠাকুর ভাই, সজাগ আছেন?'

'এত রাত্রে কে ডাকে?' দীনুর বুকটা ধুক-পুক করে ওঠে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করে, 'চোর-টোর নাকি?'

দীনু বলে, 'চোর ডাকে, না মশাল নিয়ে আসে মাগী?'

'তবে ভূত-পেত্নী নাকি?' গৃহিণী দীনুকে জড়িয়ে ধরে।

'কি করে বলি, অসম্ভব না!'

গৃহিণী আরও একটু শক্ত করে ধরে।

'একটু ঢিল দে মাগী, আমার যে শ্বাসরোধ হওয়ার জোগাড়।'

নিতাই আবার ডাকে, 'ঠাকুর ভাই, ঠাকুর ভাই!'

দীনু মনে মনে গনে, 'এই, দুই···।' তিনবার ডাকলে নিশ্চয় মানুষ!

ফিস-ফাস করে কথা বলে অথচ জবাব দেয় না। দোরও খোলেনা, নিতাইর মন এমনিতেই খিঁচড়ে হয়েছিল, এখন একটু বেশী বিরক্ত হয়ে ওঠে। সে বেড়ার ওপর বেশ জোরে কয়েকটা চড় মেরে ডাকে .'ঠাকুর-ভাই, ঠাকুর-ভাই! আমি নিতাই সরদার।'

গৃহিণী তখনও ছাড়ে না দীনুকে, বলে, 'নিতাই না গো, ডাকু। হাতে মশাল যে!'

'ডাকু আসবে তোর ঘরে কি লুটে নিতে রে মাগী? তোর কি সে দিন আছে?'

নিতাই মশালটা নিবিয়ে ফেলে।

'ছাড়, ছাড়, বাতিটা জ্বালি।'

অগত্যা গৃহিণী দীনুকে ছেড়ে দিয়ে এই দারুণ গ্রীষ্মের রাত্রেও আপাদ-মস্তক একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে।

'এত রাত্রে যে সরদারের পো?'

নিতাই চড়া গলায় বলে, 'দোর খুলুন, কাজ আছে।'

দীনু চমকে ওঠে। এ কি নিতাইর গলা? ওর তো শত্রু মিত্রের অভাব নেই!

নিতাই এবার রীতিমত চটে যায় ন্যাকামী দেখে। সে গোটা আষ্টেক কিল-চড় মেরে দোরটার কলজে নাড়িয়ে দেয়। 'আপনি কি ভাবলেন? আপনার হলো কি? দোর খুলুন!'

দীনু কাঁপতে কাঁপতে এক হাতে হুঁকো-কল্কি ও কেরোসিনের

[illegible] ডিবাটা এবং অন্য হাতে একটা বাঁশের ঠ্যাংগা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

'এই নেও' বলে নিতাইর হাতে হুঁকোটার বদলে ঠ্যাংগাটা এগিয়ে দিয়ে নিরস্ত্র সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

'এ কি লাঠি-সোটা কেন?' নিতাই বলে, 'চোখ মেলে দেখুন, আমি নিতাই।'

দীনু প্রকৃতিস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এত রাত্রে যে?'

'বাবু কাল সকালেই কোথায় যাবেন যেন—এই টাকা দুটো দিয়ে বললেন যে, তুমি যাওয়ার পথে দীনুদাকে দিয়ে যেও—কাল হাটবার আবার, আমার সংগে দেখা হয় কি না কে জানে!'

নিতাইর রচিত কাহিনী অবিশ্বাস করবার আগেই দুটো রজত মুদ্রা গিয়ে দীনুর হাতে পড়ে। দীনু গলে যায়। 'বিপ্রপদ তোমাকে পাঠিয়েছে টাকা দিয়ে! এমন ভাল লোক আর এ গাঁয়ে নেই সরদারের পো, কেমন সত্যি কি না? বসো বসো—তামাক খাও!'

এই তো নিতাই চায়! সে তামাক খেতে খেতে সব সমস্যার কথা খুলে বলে। সুধীর কথা, বিপ্রপদর কথা কোনওটা বাদ যায় না। এখন কি করা উচিত, তাই জিজ্ঞাস্য। কেবল জমির পরিমাণ ও মূল্যের কথাটা চতুরতা করে এড়িয়ে যায়।

একটা একটা করে সব শুনে দীনু জবাব দেয়, তুমি গিয়ে এখন একটু ঢিল দাও—বলো গে, সুধীর মা, তোমরা ঘোষালদের কাছে যাও। কাকুতি মিনতি করে যা পাও তাই নিয়ে ঘরে ওঠো। বাবু টাকা দিয়ে কেন, এমনিতেও কোন বিবাদ কিনতে রাজী নন। দেখবে তখন ধোপা বৌ খুব ধরা-পড়ি করবে তোমাকে। কারণ, ওরা কিছুতেই ঘোষালদের কাছে যাবে না এবং গেলেও রস পাবে না। বরঞ্চ তোমাদের কাছেই পায়ে ধরে ফিরে আসবে। তুমি তারপর দুচার দিন বাদে বলো, যদি

তোমরা একেবারে কোনও দাবী-দাওয়া না করো, তবে আর একবার বাবুকে বলে-কয়ে দেখতে পারি। কথার ফাঁকে-ফাঁকে জমি-জমা দখল হলে যে ওদের প্রচুর পরিমাণ ধান দেবে, এই আশ্বাসটা বারবারই দিও। তারপর দলিল হলে দেওয়া না দেওয়া তো নিজের হাতে, আমার কথা মত চলো দেখবে বিনা পয়সায় কাজ হাঁসিল হবে। কিন্তু শীতলাতলা থেকে একটা কিরে-কাণ্ড করিয়ে নিও। ছোটলোক, একবার প্রতিজ্ঞা করলে আর কাঁচাখেগো দেবতার ভয়ে ফিরবে না।' তামাক টানতে টানতে দীনু জিজ্ঞাসা করে, 'জমি কতটা ?'

নিতাই মিথ্যা কথা বলে, কারণ পরশ্রীকাতর দীনু না আবার একটা ভেজাল বাধায়। 'জমি বিঘে দশেক হবে।'

'দশ বিঘে দক্ষিণা জমির জন্য এত তেল-নুন খরচ ?'

'তেল-নুন ঠিক না হলে খেতে ভাল লাগবে কেন ? এখন উঠি তাহলে ঠাকুর ভাই, পেন্নাম।'

'এসো, তা হলে আবার কবে দেখা হচ্ছে ?'

'কাল পরশু যখন এদিকে আসব।'

'সংবাদটা জানিয়ে যেও, বুঝলে ?'

কবলার বহায় ধার্য হয়েছে তিন হাজার টাকা। সুধীর মা গত্যন্তর না দেখেই রাজী হয়েছে। কিন্তু তার প্রাণটা আগাগোড়াই ব্যথায় টন-টনিয়েছে। এতগুলো টাকা সুধীর হাত-ছাড়া হলো! কবে জমি-জমা সুসার হবে, কবে তারা ধান পাবে, কে জানে! এখন তো যথাসর্বস্ব লিখে দিয়ে টাকা না পেয়েও টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিতে হবে! ঘোষালদের কাছে গেলে তারা গ্রাহ্য করবে না, এদিকে বাবুও অসন্তুষ্ট হবেন, তাহলে ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। অতএব নিতাই যা বলে, তাই করা ভাল। কিছু ফসলের তো আশা রইল।

আরও একটা দুরাশা তার অন্তরে উঁকি মেরে যায়—সে দুরাশা গৃহস্থ-

বিপ্রপদ কার্যস্থলে রওনা দিচ্ছেন। সাথে কেউ যাবে না—কেবল ইমাম যাবে ষ্টীমার ঘাট পর্যন্ত। নৌকা-পথ ব্যতীত যাওয়ার উপায় নেই। একখানা ডিঙি নাও কেরায়া করে আনা হয়েছে। এই মাত্র মাঝি চাল ডাল তেল নুন নিয়ে গেছে। ভাড়ার টাকা ছাড়া মাঝি মাল্লাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কিম্বা যত দিন পর্যন্ত ভাড়া খাটান যায় সেই অনুপাতে সম্যক খোরাকী ও পান তামাক দেওয়া এ দেশীয় রীতি। এর জন্য কোনও গরীব গৃহস্থও ঝগড়া করে না। বরঞ্চ যত্ন করেই তার যা প্রয়োজন পূর্ণ করে। মাঝিরাও দেশে দেশে সুনাম করে বেড়ায়।··· কিছুদিন হয় নতুন ষ্টীমার লাইন এদিকে হয়েছে। তা না হলে বড় কষ্ট ছিল যাতায়াতে।

মাঝি বলে, 'এখন আর দেরী করলে জাহাজ পাবা না বাবু—জহুরের ওক্ত উৎরা গেছে। ভাটা পেরায় শ্যাষ, জোয়ার হয় হয়।'

এবার কমলকামিনী স্বামীর সংগে যাবেন না কিন্তু বিপ্রপদর যাতে বিদেশে গিয়ে অসুবিধা না হয় তার জন্য কত কি যে দেবেন তার আর ইয়ত্তা নেই। একটু আচার, চারটি চিঁড়ে, কিছু ঘি, কয়েকটা গাছের বারমেসে ফল ইত্যাদি করতে করতে দশটা-পাঁচটা শিশি-বোতল-পোঁটলা-পুঁটলী জমা হয়। কিন্তু পুরুষের পক্ষে এ সব গুছিয়ে রেখে খাওয়া অসম্ভব। তবু কি স্ত্রীলোকের মন মানে! অল্প শীতে পাতলা কাঁথা, বেশী শীতে লেপ—কোনটা কখন লাগে বলা যায় না! সবই বেঁধে দেওয়া হয়। বিপ্রপদ হেসে বলেন, 'এ সব রাখবে কে ঠিক-ঠাক করে?'

'কেন, একটা চাকর জুটবে না?'

'মাইনে, খোরাকী, মাসে কত টাকা বাজে খরচ—নিজেরটা নিজেই করে নেব।'

'চাকরী করে তা করা অসম্ভব—আর তুমি সেখানে কর্তা,—তোমার তো একটু মান সম্মান রেখে চলতে হবে।'

'সত্যিই আমার এখন এক জন চাকরের দরকার। তুমি থাকলে একটা ঝি-টি রাখলেই চলত—কি বলো?'

'না গো, এখন আর তা চলে না। ঘরের কাজ না হয় ঝিতে করল, বাইরের কাজ করে কে? লোক না থাকলে এখন মান বাঁচান দায়।'

'যাক, সাবধান-মত বাড়ীতে থেকো।'

বহু লোক বাইরে অপেক্ষা করে আছে। পুরুত ঠাকুর এসেছেন শালগ্রাম শিলা নিয়ে যাত্রা করিয়ে দিতে। দীনু এসেছে দেখা করতে, বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছেন দু এক জন। নাট মন্দিরে ভিড় জমে গেছে।

সকলকে অল্প কথায় তুষ্ট করে দেবালয়ে প্রণাম করে বিপ্রপদ নৌকায় গিয়ে ওঠেন। 'ইমামও আসছে না, নিতাইকেও দেখা যাচ্ছে না—এরা কেউ আমার সংগে যেতে পারবে না, তা আমাকে আগেই বলা উচিত ছিল। আমার আর দেরি করে ষ্টীমার ফেল করাও তো অসম্ভব।'

আজ কাল বিপ্রপদর খুব সাবধানে চলা ফেরা করা দরকার। প্রতিষ্ঠা যত বাড়ে শত্রুতায় বীজ তত বৃদ্ধি পায়।

একে একে সকলে খালপারে এসে জমা হয়। ছেলেরা এসেছে, মেয়েরা এসেছে, সেবাও টলতে টলতে বলতে বলতে আসে—'উই বাবু যায়!' এ বিচ্ছেদ দীর্ঘ দিনের নয়—এ বিচ্ছেদ স্থায়ী কোনও দুঃসংবাদ নয়, তবু পোড়া বাঙালীর প্রাণে বিষাদ আনে। যারা ভালবাসে তারা ঘন ঘন চোখ মোছে। যারা পাড়া প্রতিবেশী তারাও অশ্রুরোধ করতে পারে না। বিদেশী পথিক পথের কথা ভুলে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়ায়—এ বিদায় দৃশ্যে তারও প্রাণ কেঁদে ওঠে। সে হিন্দু হক, মুসলমান হক—সেও তো বাঙালী। এক বাঙলার কোমলতা দিয়ে তারও তো মন গড়া!

অমরেশ বিপ্রপদর দিকে তাকাতে পারে না! তার জীবনে এ দৃশ্য এই প্রথম। চোখ দুটো বারণ মানে না!

কমলকামিনী ছেলেকে কোলের কাছে টেনে এনে গাঢ় কণ্ঠে বলেন, 'কাঁদে না বোকা ছেলে! আবার তো উনি এলেন বলে।'

মাঝি নৌকা খুলতে চায়, কিন্তু কমলকামিনী বাধা দেন, 'আর একটু দেরী করে দেখো—পথে কত আপদ-বিপদ আছে, একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলা ভাল। ঘাটে পৌঁছুতে রাত তো কম হবে না।'

'কিন্তু ওদিকে যে আমার ষ্টীমার না পেলেও ভীষণ ক্ষতি। বাবুদের তাগিদের কথা তো তুমি জান।'

কে যেন বলে, 'ঐ নিতাই আসছে।'

কমলকামিনী এবং উপস্থিত সকলের মনেই একটা আনন্দ হয়! বিপ্রপদ বলেন, 'ইমাম কোথায়? তুমিও যে এত দেরী করলে? যাক, সে না আসে তুমিই চলো একটু সংগে।'

'বাবু, ইমামের ছেলেটার কলেরা।'

'কোনটার?'

'বড়টার—সিরাজের।'

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি নৌকা ছেড়ে ওঠেন। বলেন, 'আজ আর আমার যাওয়া হবে না। মাঝি তুমি খেয়ে-দেয়ে এখানে থাকো—কাল যাবো।' তিনি দেশের মধ্যে ভাল ডাক্তারটিকে ও প্রয়োজনীয় অষুধ-পত্র নিয়ে রওনা দেন।

কমলকামিনী বলেন, 'আমিও যাবো—তোমরা একটু দাঁড়াও।'

'তুমি যাবে? বলো কি?'

'আজ আর কোনও বলা-বলি নেই—ওদের তো কোনও কাণ্ড-জ্ঞান নেই। এ রোগ যে কি ভীষণ এবং কত ছোঁয়াচে, তা ওরা জানেই না। একটার জন্য ঘরের সব কটা মরবে।'

'তুমি গেলে কি বাঁচাতে পারবে ?'

'রোগীকে বাঁচান ঈশ্বরের হাত—তবে নিরোগীকে রক্ষা করা মানুষের সাধ্যের মধ্যে—তাই আমি যাবো—এই নৌকাতেই ওদের ঘাটে যাওয়া যাবে। আমি উঠলাম, তোমরাও এসো—আর হেঁটে যেয়ে দরকার নেই।'

কোলের মেয়ে সেবার দিকে একবার ফিরে না চেয়েও আধ ময়লা শাড়ীখানা না বদলেই কমলকামিনী নৌকায় গিয়ে ওঠেন।

খালপারের স্ত্রী পুরুষের জনতা স্তব্ধ হয়ে থাকে। থাকার কথাও। আজ পর্যন্ত কেউ কখনও শোনেনি যে কোনও হিন্দুমহিলা কোন নৈতিক দায়িত্ব কিম্বা আর্থিক প্রয়োজনেও কোন দিন কোন মুসলমানবাড়ী গেছে ! শক্তিগড় কেন, আশপাশ গাঁয়ে এ এক নতুন আদর্শ সৃষ্টি !

কমলকামিনী সকলের সংগে সংগেই ওপরে ওঠেন। তাঁকে দেখে এ-ঘর ও-ঘর থেকে বৌ-ঝিরা অস্ফুট বিস্ময়ের শব্দ করে ওঠে। ইমামের বৌ রোগী ফেলে দৌড়ে যায় ! একটা অভাবনীয় তোলপাড় পড়ে যায় মুসলমানপাড়ায়। একে একে গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ে ব্যাপারখানা দেখতে। গর্বে আনন্দে আশ্বাসে দুঃখে ইমামের চোখে জল আসে। তার মা এসেছেন যত মুস্কিল আসান করতে !

দিনের বাকী অংশটুকু এবং সারা রাত যমে মানুষে টানাটানি চলে। জল খাওয়ান, মাথা ধোয়ান, মল মূত্র পরিষ্কার—এমন কোন কাজ নেই যা না কমলকামিনী সাবধান ও পরিচ্ছন্ন মত করেন। বিপ্রপদ ডাক্তারটিকে ও নিতাইকে নিয়ে সারাটা রাত উঠানে পায়চারী করে কাটান। ছেলেটা ভাল হয়ে ওঠে। ডাক্তার বলে, 'তলপেটে হাত দিয়ে বুঝলাম প্রস্রাব এসে জমেছে—একটু বাদেই হয়ে যাবে ! ইউরেমিয়ার ভয় নেই। এখন আপনারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যেতে পারেন—আর তো সকালের বেশী দেরী নেই, মোরগ ডাকছে, ঐ তো শোনা যাচ্ছে।'

কমলকামিনী সাবধানতা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক করে ফের নৌকায় গিয়ে ওঠেন! তখন পাশের মসজিদ থেকে একটা একটানা মধুর আজানের ধ্বনি ভেসে এসে ওঁদের দুজনার চিত্ত প্লাবিত করে দেয়। সবই খোদার মেহেরবাণী।

পরের দিন আবার সেই বিদায় অংক আসে।...

খালপার লোকে ভরে যায়।

সেই অশ্রু, সেই বিষাদ, সেই করুণ দৃশ্য মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

বিপ্রপদ নায় উঠেছেন—ইমাম শক্ত একটা পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে গলুইতে দাঁড়িয়ে—এক্ষুনি নৌকা ছাড়বে।...ছাড়লও তাই।

কমলকামিনী জনতার সুমুখ দিয়ে ত্বরায় বাড়ী ফেরেন। তাঁর কোনও দুর্বলতা অশোভন। ফিরে চলে রিক্ত মনে অমরেশ ও সেবা।

ধীরে ধীরে ভীড় মিলিয়ে যায়।...

একটা ঘুঘু ব্যর্থ সংগীত গেয়ে চলে পাশের আমরুল গাছটা থেকে।

ডুবন্ত সূর্যের রাঙা আলো কে যেন বাটিতে গুলে গোলাপী আঙুল দিয়ে আকাশে আলপনা দিচ্ছে। মেঘের পরে মেঘে সে রঙ ছড়িয়ে যাচ্ছে। দু একটা পাখী এখনও সেই রঙের লোভে লোভে যেন উড়ে বেড়াচ্ছে, ডুব দিচ্ছে—আবার স্থির হয়ে ভেসে চলেছে অনির্দিষ্ট মহাকাশের দিকে। নিবিড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে পথ করে শক্তিগড়ের খাল চলেছে নদী-সংগমে। কত আঁকা-বাঁকা পথ তার! অন্ধকার তরুশ্রেণীর মধ্যে যেন তার শ্বাসরোধ হয়ে যাবে—তাই তার স্রোতবেগ দ্রুত, নৌকা চলেছে তীরের মত। হুঁসিয়ার মাঝি বৈঠা ধরেছে শক্ত করে। এখনি একটা ঘুরপাক খেয়ে কচুরীপানাগুলোর সংগে নৌকা গাঙে গিয়ে পড়বে।

এখন একটানা নদী—সিধে মেহেরপুরের বাঁক। তারপর মাত্র দেড় বাঁক জল। কতটুকু বা পথ এই তরতরে ভাঁটায়!

মাঝি সুবিধা বুঝে একটা ভাটিয়ালী গান ধরে। ইমাম তালে তালে মাথা নাড়তে থাকে।

নিরক্ষর একটা বাঙাল মাঝির মুখে কি অপূর্ব গান! কণ্ঠে কি অপূর্ব মাধুর্য! ছন্দে ছন্দে কি অপূর্ব লালিত্য। যেন সমস্ত সুকুমার সাহিত্য ছেনে, নিংড়ে এনে অতি সুকোমল কাব্য—এ পল্লীগীতি রচিত হয়েছে। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে রস, এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে লাবণ্য—এ যেন সংগীতের মধুচক্র। এ সংগীতের রচয়িতা যে কবি তার নাম হয়ত সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পায়নি, কেউ কোনও দিন তাকে খুঁজেও দেখবে না, তবু সে যুগ যুগান্ত ধরে এমনি নিরক্ষর গায়কের মুখে নিরক্ষর সমঝদারদের বুকে বেঁচে থাকবে পূর্ব বাঙলার সান্ধ্য নদীপথে।

গান থেমে যায়, অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে থাকে।

বিপ্রপদ যে ছইর ভিতর আছেন তাও অনেকক্ষণ ধরে বোঝা যায় না।

‘ইমাম?’

‘বাবু!’

‘তোমার ছেলে ভাল আছে শুনে সুখী হলাম।’ একটু থেমে ফের বিপ্রপদ বলেন, ‘জমি তো কেনা হলো—চাষ-আবাদ করবে কে? দক্ষিণ দেশে লোকে যেতেই ভয় পায়—যে সাপ-কোপ বাঘ-ভালুকের হামলা। শুনেছি নাকি দিনের বেলা বাঘ এসে বসে থাকে বিলের ধারে। বিলের দক্ষিণে না কি একটা চরা নদী, তার পর সুন্দরবন।’

‘বাবু, সে ডর আমাগো নাই—কত জ্যাতা শিয়াল (জীবিত বাঘ) ধরইয়া আনুম আপনাগো আশীর্বাদে!’

মাঝি হেসে বলে, ‘কন কি বাবু, শিয়ালে করতে পারে কি? আমাগো বাড়ী থিইক্যা দক্ষিণের বিল দেখায়—আমরা আছি না সে ত্রাশে!’

ইমাম বলে যে কোনও চিন্তা নেই। বিপ্রপদ একটু তাড়াতাড়ি কিছু বেশী দিনের ছুটি নিয়ে ফিরে এলেই হয়। জমি দখল করার সময় দু একটা খুন-টুন হতে পারে—তা তারা চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে, লাস সরেজমিন থেকে গায়েব করে ফেলবে, পুলিশের বাপেও টের পাবে না। চাষ-আবাদের জন্যও তারা ভাবে না। 'জো' মত জমি চাইষা 'গোন' মত রুমু বীজ—তার পর খোদার ইচ্ছা লক্ষীর দয়া। 'যতক্ষণ আমরা দুই মিতায় বাইচা আছি ততক্ষণ আপনার জনের অভাব নাই বাবু।'

উৎকন্ঠিত মাঝি ধীরে ধীরে সব জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়। বলে যে তাদের বাড়ীও বিলের কাছে বেলেরচর—সংগে দরকার হয় সেও দু দশ জন লোক নিয়ে যেতে পারে। কিছু জমি তাকে বর্গা দিতে হবে। সেও না কি এক জন ভাল চাষী, ওদেশের সব হাল চাল জানে!

'আচ্ছা, তোমাকে খবর দেবো।'

কথাবার্তায় ষ্টীমার ঘাটের বাঁকে নৌকা এসে পড়ে। দুরের লাল আলোটা অন্ধকারে একচক্ষু রাক্ষসের মত দেখায়। ঐটাই ঘাটের নিশানী আলো।...

নৌকা ঘাটে ভিড়তে ভিড়তে ষ্টীমারও এসে পড়ে। মাঝি ও ইমাম চটপট বিছানা বাক্স লট বহর ষ্টীমারে তুলে দিয়ে, ফ্লাটে এসে দাঁড়ায়।

'সেলাম বাবু।'

'সেলাম, সেলাম।'

ষ্টীমার ঘটঘট খটখট করে নোঙর টানতে টানতে ঘাট ছাড়ল।...

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই বিপ্রপদর নজর পড়ে ষ্টীমারটার নামের দিকে। এই তো সেই জাহাজ! এখানেই একদিন তিনি কুলী হয়ে মোট

মাথায় ঢুকেছিলেন। আজ আবার বাবু সেজে এসেছেন। সেই আলো, সেই সিঁড়ি, সেই দোকানী—সব ঠিক। শুধু তাঁরই ভাগ্যের অসীম পরিবর্তন ঘটেছে। হয়ত আরো ঘটবে—ঐ সুদূরে দক্ষিণের বিলে সোনা ফলবে। তিনি শুধু শ্রম করে যাবেন, যত্ন করে যাবেন, যাবেন দিনের পর দিন ক্লেশ করে। তার পর তাঁর করণীয় কিছু নেই।...

আজ যা জটিল বলে মনে হচ্ছে কাল তা সরল হতে কতক্ষণ !

অদৃষ্টই সব। এমন দিন তাঁর গেছে যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেটেও তাঁর বিশ্রাম মেলেনি, পেট ভরে নিজে খেতে পারেননি। পরিবারবর্গ রয়েছে অর্দ্ধাহারে। হয়ত কেউ কিছু মুখ ফুটে বলেনি, তিনি তো মনে মনে সব বুঝেও বোকার মত চুপ করে রয়েছেন। সামান্য চেষ্টায়, বলতে গেলে একদিনের চেষ্টায়, তাঁর ভাগ্য ফিরল। তার-পর তিনি কত লোক কত আত্মীয় অনাত্মীয়কে যে থাইয়েছেন, তার মাপ-ঝোপ নেই। হিসেব করতে গেলে তিনি তাঁর এই সামান্য জীবনে কম করে পঁচিশটি শ্রাদ্ধের খরচ জুগিয়েছেন। কত মেয়ের বিয়ের জ্বালিয়েছেন রোশনাই। এ সব তিনি অন্তরালে বসেই করেছেন—তবু আজ একটা তৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে ওঠে। এ সব ভাগ্য তাঁর না সকলের ? তিনি হয়ত নিমিত্ত মাত্র। অন্ধকারে সকলেই সহযাত্রী, তাঁর দায়িত্ব শুধু পুরোভাগে মশাল জ্বালিয়ে চলার।

বিপ্রপদ ঘুমিয়ে পড়েন।

শেষ রাত্রে ষ্টীমারের একটা একঘেয়ে তীব্র হুইসেলে বিপ্রপদর ঘুম ভেঙে যায়। কেবিনে খুব ভীড় হয়েছে। যাত্রীরা ঠাঁশাঠাঁশি করে ঝিমাচ্ছে। কেউ বা ষ্টীমারের গতির তালে তালে দুলছে। বাক্স পেঁটরা বিছানা-পত্রে কেবিনটা একেবারে বোঝাই। পা রাথার স্থান পর্যন্ত নেই। বিপ্রপদর জুতো জোড়ার ওপর কে যেন এক ব্যক্তি একটা

নাক ডাকাচ্ছে। হাঁটু পর্যন্ত মোজা পরিহিত কোনও বৃদ্ধের পা। এক পায় একটা সাদা অপর পায় একটা লাল রঙের মোজা। দেখলে ঠিক ক্লাউনের পা বলেই সন্দেহ হয়। মনে হয়, যেন নিতান্ত তাচ্ছিল্য করেই পরা হয়েছে। ভুল যদি হয়েই থাকে, হক গে। এখন আর পারিপাট্য দিয়ে কি হবে—শীত নিবারণ হলো বিষয়। চামড়া তো ঢিলা হয়ে গেছে, এখন আর ভাল মন্দে কিই বা এসে যায়!

বিপ্রপদর দামী জুতা জোড়া যেন কলার মত চ্যাপটা হয়ে গেছে। তিনি জুতা জোড়া টেনে বের করতেই মোজা পরা পায়ের মালিক সামনের দিকে খানিকটা হড়কে যান। মহা ত্রস্ত হয়ে উঠে বসে প্রশ্ন করেন, 'মহাশয়ের নিবাস?'

বিপ্রপদ জুতা জোড়া সমান করতে করতে জবাব দেন, 'হিন্দু হয়ে আপনি দেখি চামড়া জোড়ারও কাশী বাস করে ছেড়েছেন।'

দো-রঙা পায়ের মালিক একটু বিব্রত হয়ে জবাব দেন, 'দেখুন, আমি বুঝতে পারিনি!'

'আপনি তো অবুঝও না—প্রাচীন বলেই মনে হচ্ছে।'

'আপনিও তো নবীন না, কথায় বেশ প্রবীণ বলেই মনে হচ্ছে।'

চোখ তুলতেই বিপ্রপদ দেখেন যে বুড়ো সেন মশাই। তিনি এতটা লজ্জিত হন যে জুতো হাতেই হাত জোড় করে বলেন, 'নমস্কার সেন মশাই, কিছু মনে করবেন না।'

'কে, বিপ্রপদবাবু নাকি? আরে ওতে মনে করা-করির কি আছে, বিশেষত আমার—ক্ষতি হলে হয়েছে আপনারই। তারপর কোথায় চলেছেন? নমস্কার, নমস্কার।'

'এই চাকরি স্থলে—শিবচর বলে একটা নতুন জায়গায় বদলী হয়েছি।'

'আপনার কথাই ভাবছিলাম। যাক, দেখা হয়ে গেল।'

'আপনাকে তো আমারও দরকার, কিন্তু এখন থাক।'

'না না, বলুন না—তালুক বিক্রীর কথা জিজ্ঞাসা করবেন তো? সে যা শুনেছেন কথা ঠিক। তা, আপনার অভিপ্রায় কি?'

'যদি দয়া করে—'

'বিপ্রপদবাবু, আপনি ক্রেতা আমি হচ্ছি বিক্রেতা—দয়া কে কাকে করবে?'

'সে কথা বলছি নে—সে কথা বলছি নে—তবে কি জানেন, যদি উচিত মূল্যটা শুনতে পারতাম—তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম। তালুক বিক্রী করতে চাইলেও এখনও আপনারা বড় লোক। আপনাদের তুলনায় আমরা নগণ্য—মানে সম্মানে অর্থে সব দিক দিয়ে।'

বৃদ্ধ মনে মনে সন্তুষ্ট হন। 'আপনি মিষ্টভাষী, আপনার সংগে কাজ করায় সুখ আছে। টাকা পয়সা কিছু কম বেশীতে এসে যায় না। এন্তেজদ্দি পাঁচ হাজার পর্যন্ত উঠেছে। ঘোষালেরা কিছু বেশীও দিতে চায়। তাদের ইচ্ছা, যে-কোনও মূল্যে সম্পত্তি খরিদ করা। খারিজা ষোল আনী তালুক, একটা মস্ত জমিদারির সামিল, বিশেষত স্বদেশে—আপনার তো স্বগ্রামে। এটা খরিদ করা মানে গৌরব ও প্রতিষ্ঠার চরম শিখরে ওঠা। মাত্র তিনটি প্রজা শাসন করতে পারলেই সদর খাজনা আদায় হয়ে গেল। তারপর সারা বৎসর নিশ্চিন্ত। যখন আপনার দুটো পয়সা আছে তখন এ সুযোগ আপনার ত্যাগ করা বিধেয় নয় বিপ্রপদবাবু।'

বিপ্রপদ বোঝেন, বৃদ্ধ ঝানু লোক—পাকা জমিদার। কেনা বেচার ব্যাপারে যে কি করে দুটো চারটে মিথ্যা কথা বেশ শ্রুতিমধুর করে বলতে হয় তা তিনি জানেন। এ-ও জানেন যে, এটুকু সত্যের আলাপে বিশেষ কোন ক্ষতিই হয় না। 'দেখুন দরাদরি করে এ সব জিনিস কেনা খুবই কঠিন—যদি অনুগ্রহ করে উপযুক্ত লোকের হাতে দিয়ে যান তবে প্রজারা আশীর্বাদ করবে। অন্যথায় এ বুড়ো বয়সে অভিশাপের ভাগী

হবেন। যদি এতগুলো লোককে কোনও অত্যাচারীর হাতে বলির পশুর মত বেঁধে দিয়ে যান, তবে স্বর্গে গিয়েও সুখী হবেন না।'

'এ অতি সত্য কথা—অতি সত্য কথা! টাকা পয়সা দু দিনের—যশ চিরদিনের। আপনি কি দিতে পারবেন তা তো বললেন না?'

'ওই তো বললাম দর কষাকষি করে এ সব খরিদ করা যায় না। আমি একও বলতে চাই নে, দশও বলতে চাই নে। অংশটা তৃতীয় ব্যক্তির মত আপনিই স্থির করে দেবেন।'

'আচ্ছা—আচ্ছা, সে তো ভাল কথাই। আপনাকে না জানিয়ে কোনও কিছু করা হবে না। ঘোষালদের চরিত্র আমার অজ্ঞাত নয়—তাদের আমি এ সম্পত্তি কিছুতেই দেব না—লাখটাকায়ও না।'

বিপ্রপদ মনে মনে ভাবেন, তবে ঘোষালদের মাঝখানে রাখার অর্থ কি দাম চড়ান? বুড়ো সহজ পাত্র নয়। এর কাছে নীতি কথা স্তব স্তুতি সব এক দিকে, আর টাকা এক দিকে।

আর একটা প্রমাণও সংগে সংগে পাওয়া যায়।

নিকটবর্তী ষ্টেশনে ষ্টীমার থামতেই সেন মহাশয় সবিনয়ে নমস্কার করে নেবে যান। বিপ্রপদও দোতলার রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়ান। ফ্ল্যাটে ও কারা দাঁড়িয়ে? প্রথম ও দ্বিতীয় ঘোষাল নয়? হ্যাঁ, তারাই তো! তারাই তো বুড়ো সেন মশাইকে অভ্যর্থনা করে ভিড় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেন মশাই কখন কোন ষ্টীমারে নাববেন তাই বা এরা জানল কি করে? এ সব পূর্ব পরিকল্পিত, না হলে শেষ রাত্রে নিতান্ত অসময়ে ওদের এখানে আসা অসম্ভব। আর একটি লোক কে? দীনুদা? ঠিক চেনা যায় না—এর মধ্যে ষ্টীমার ছেড়ে দেয়। বিপ্রপদ একটা মানসিক অস্বস্তি নিয়ে নিজের কেবিনে এসে বসে পড়েন।

দীনু পাখীও না, পশুও না। ওর পক্ষে সকলই সম্ভব। কিন্তু ঐ যে প্রাচীন সেন, সেও কি তার সমগোত্রীয় একটা সুবিধাবাদী প্রাণী? আশ্চর্য!

বিপ্রপদর অন্তর ঘৃণায় ভরে উঠে…তার পর একটা আক্রোশ হয় সকলের ওপর। তিনি এক্ষুনি নেমে যাবেন। ঘোষালদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যা কিছু বলার তা বলে আসবেন, তাতে যদি সেন মশাই চটে চটুক।

কিন্তু তখন আর নামার উপায় নেই, ষ্টীমার সশব্দে ডানা পিটিয়ে মাঝ নদীতে এসে পড়েছে।

১৪

জীবন যুদ্ধে সহজে পিছু হটার লোক নন বিপ্রপদ।

তিনি সন্ধ্যার কিছু আগে গন্তব্য ষ্টেশনে নেমে একখানা খামের চেষ্টা করেন। তখন পোষ্ট অফিস আর খোলা নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিকট থেকে চেয়ে-চিন্তে নেওয়া ছাড়া এখন আর উপায় কি? কিন্তু তাও পাওয়া যায় না। পত্রখানা জরুরী, লিখতেই হবে। বাড়ীতে সমস্ত সংবাদ জানালে, ইমাম, নিতাই এবং অন্যান্য সকলে মিলে বুঝে তদ্বির করতে পারবে। তালুকটা খরিদ করতেই হবে। লাভের জন্য নয়, লোভের জন্যও নয়—এখন জিদের জন্যই করতে হবে অর্থব্যয়। 'জিদ-জমিন-জেনানা' এই নিয়ে তো পুরুষে পুরুষে সংগ্রাম।

শিবচরের গয়নার নৌকা ছাড়বে—একটা মাঝি ঘা দেয় চামড়ার 'নাগরাটায়'। 'নাগরা'র শব্দে একটা সতর্কতার ধ্বনি ছড়িয়ে যায় অনেক দূর পর্যন্ত। কূলের যাত্রীরা সচকিত হয়ে ওঠে। তাড়াহুড়ো করে যে যার খাদ্য বিছানা বাক্স নিয়ে নৌকায় এসে জড়ো হয়। কারুর অর্দ্ধেক খাওয়া ফলের খণ্ডটা জলে বিসর্জন দিয়ে আসা ছাড়া উপায় থাকে না। বিপ্রপদও উঠে একপাশে এসে বসেন। নৌকাখানা একশো কি সোয়াশো হাত লম্বা—যেন নদীর বুকে একখানা ভাসান বাড়ী। কত দড়ি কাছি

নোংগর বৈঠা দাঁড়। কেমন সুশৃঙ্খল করে সাজান বয়রা বাঁশের লগি, চিকণ গাব-রঙান গুণের দড়িগুলো। কত বাঁশ বাখারী দিয়ে ছইটা নিপুণ হাতে বাঁধা। পয়সা ব্যয় করে, সার্থক করেছে বটে ; ষ্টীমারের আসবাব সাজ-সজ্জা দেখলে হকচকিয়ে যেতে হয়, কিন্তু গয়নার নৌকায় উঠলে বিপ্রপদকে মোহিত করে। একটা গ্রাম্য শিল্প-চাতুর্যের ছন্দ দেখতে পান নৌকাখানার সর্বাংগে।

হুঁকো কল্কী তামাক টিকা পিছনের খোপে যাত্রীদের জন্য গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ঐদিকেই মাঝিদের খাবার-স্থান—পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ আসছে। তার পরই তেল-কুচকুচে প্রকাণ্ড একটা আস্ত কাঠের হাল— শক্ত করে একটা খুঁটোর সংগে বাঁধা। অমনি করে না বাঁধলে ঝড়-তুফানে, ঝাপ্টা বাতাসে নৌকা আয়ত্তে রাখা যায় না ! ঐটাই নৌকার প্রাণ !

কপিকল ঘুরিয়ে যেমনি প্রকাণ্ড পাল তোলা হলো মাস্তুলের মাথায় অমনি একটা ঝাঁকুনী দিয়ে নৌকা ছুটল তরতরিয়ে। কোথায় লাগে এর তুলনায় চিল ! যাত্রীরা একটা ধাক্কা খেয়ে টাল সামলে নিয়ে যে যার জায়গা মত বসে থাকে। কেউ চেয়ে থাকে বাইরের দিকে, অনেকে আবার ওদিকে চাইতে পারে না। জল তো না যেন মিশমিশে কালি !

না বুঝেই যেন ভুল করল মাঝিরা—কিন্তু ভুলটা হলো মারাত্মক রকমের। চৈত্র মাস, এখন পলকে আকাশে কাল-বোশেখী সঞ্চার হয়। ও কি ? একটা বিদ্যুৎ চিলিক মেরে যায় আকাশে। কে যেন কাকের ডিম ছড়িয়ে দিয়েছে বায়ু-কোণে। কী কালি—ওদিকে আর চাওয়া যায় না ! সুস্পষ্ট একটা ত্রাসের ভাব ফুটে ওঠে যাত্রীদের মুখে। তারা বুঝল, নদীপথে সন্ধ্যা সমাগমে মূর্তিমতী বিভীষিকা এসে যেন দাঁড়াল বায়ু-কোণে। হঠাৎ হাওয়া থেমে গিয়ে ঘুরে উঠলো কালিলেপা মেঘলা কোণে। চিলিক মারল আরোও গোটা কয়েক। তারপর ছুটল হাওয়া, বিষম হাওয়া—বেদম করে দিল মাঝিকে।

'আসমান জমিন পানি' মাঝি মনে মনে বলে, 'আল্লা না রাখলে এ বাতাসে নাও সামলান যাবে না।'

কালো জল নৃত্যরত সাপের মত আকাশে ছোবল মারছে। এপার ওপার দেখা যায় না। নৌকাটা কাৎ হয়ে এক চলক জল গলুই বেয়ে ওঠে। যাত্রীরা চমকে তাকায়।

'সামাল সামাল—কেউ যেন নড়ে না জায়গা ছেড়ে।' নৌকা উড়ে যাচ্ছে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একবার উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে—ঢেউয়ের খাদে আবার ডুবছে—আবার উঠছে ঢেউয়ের মাথায়। তুফান—শুধু কিল তুফান। তাকান যায় না বাইরের দিকে।

বিপ্রপদ দেখেন যে হাল-বাঁধা খুঁটোটা মড় মড়িয়ে ভেঙে যাচ্ছে মাঝি চীৎকার করে ওঠে। আর বুঝি রক্ষা নাই। ভিতরের মানুষগুলো হাঁউ-মাঁউ করে ওঠে। কেউ বা ইষ্টনাম স্মরণ করে। বিপ্রপদ ছুটে যান। তাঁর শিরায় শিরায় শক্তিপ্রবাহ খেলে যায়। তিনি চট করে একটা বয়রা বাঁশের দাঁড়ের হাতল এনে বসিয়ে দেন খুঁটোটার পাশে মাঝি প্রাণপণে চেপে ধরে হাল। তবু বুঝি পারবে না—পারবে না কিছুতেই রুখতে। হাল বিগড়ে পাল বেসামাল হয়ে নৌকা ডুববে মাঝ নদীতে। বিপ্রপদ একটা দড়ি টেনে এনে শক্ত করে হালটাকে খুঁটোটা সংগে বাঁধেন। 'এবার আমার হাতে দাও।'

ক্লান্ত মাঝি অবাক হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে পাখীর মত উড়ে চলে নৌকা। জলের ছাটের ঝাপটায় যাত্রীরা ভিজে যায়! জলখোপ থেকে দুজন মাল্লায় জলডুরি চালায়। বিপ্রপদ প্রথম যৌবন আবার ফিরে এসেছে যেন। তিনি ঐরাবতের মত জড়িয়ে ধরেছেন হাল।

নৌকা ছুটছে হু-হু করে এগিয়ে। আসছে ঢেউ ভাঙছে গায় ও চলছে ফুঁপিয়ে। আবার একটা দমকা এলো। চুরমার হয়ে গে

তুফানের মাথা! এতো সংঘাতিক ঢেউ! এই মাথা ভাঙা ঢেউয়ে দিশা রাখা অতি সুকঠিন। বিপ্রপদর আশংকা হয়, কিন্তু নিরাশ হওয়ার মানুষ নন তিনি। দমকা ক্ষেপুণীটা যাওয়া মাত্র বিপ্রপদ বলে ওঠেন, 'ভয় নেই, ভয় নেই। ঐ কূল দেখাচ্ছে।' কোথায় কূল—কোথায় কিনারা! এ তো শুধু আশা দেওয়া, সতেজ রাখা মানুষের মন। আবার ঝাঁকুনী, আবার ক্ষেপুণী, আবার দুরন্ত হাওয়া। মাস্তল না ভাঙে, পাল না ছেঁড়ে—হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার! তুফানের দাপটে যেন চিরে যাবে নৌকার তলিটা। এখন ঈশ্বর ছাড়া আর ভরসা নেই মানুষের। বিপ্রপদ স্থিরচিত্তে হাল সামলে থাকেন। তুফানের খাদে খাদে নিয়ে চলেন নৌকা। এত বড় গয়নাখানাও যেন মনে হয় মোচার খোলা—এ নিয়ে খেলছে এক দুরন্ত রাক্ষসী।

ক্রমে থেমে আসে ঝড়। মাঝিরা বলে যে কূল দেখাচ্ছে—ঐ তো পশ্চিম পার। কিন্তু নৌকা তো এখন কূলে নেওয়া যাবে না। তাহলে পার ধ্বসে এখনই নৌকার ওপর পড়বে। এ কি?—আবার সোঁ-সাঁ শব্দে গর্জে এলো বাতাস! আবার চলকে চলকে জল। এবার যাত্রীরা যেন ভেঙে পড়ল আর্তনাদে। বিপ্রপদ ভাবেন, শক্তিগড়ের বসু-পরিবারের মতই তিনি আজ এই পথিক-পরিবারের ভাগ্য নিয়ন্তা। আজ তাঁকে দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও এদের রক্ষা করতে হবে, পূর্ণ করতে হবে ক্ষয়-ক্ষতি। তিনি আবার আশ্বাস দেন।...

দর দর করে ঘাম ছুটছে। তবু বিপ্রপদ আজ স্থির। মাঝিমাল্লারা মনে মনে এ বাবুকে ওস্তাদ বলে মেনে নেয়। হঠাৎ একটা গাছ মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়ে মাস্তলের ওপর। নৌকাটাও তখনি এসে ঠেলে ওঠে একটা বালির চরে। ঝর ঝর করে বৃষ্টি নামে—শুভ লক্ষণ। হাওয়া মন্থর হয়ে আসে। আর কোনও আশঙ্কা নেই দেখে বিপ্রপদ হাল ছেড়ে দিয়ে নৌকার গলুইয়ের দিকে এগিয়ে যান। গাছ না, গাছের একটা ডাল ভেঙে

পড়েছে—তাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নি। মাঝিরা সহজে সরিয়ে ফেলতে পারবে।

চরে বসে জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়—জলে না ভরলে এ নৌকা নামবে না এখান থেকে। তারপর যাবে গয়না ঘাটে।

বিপ্রপদর জন্য পাঁচ সাতটা লণ্ঠন ও লোক জন এসে ঘাটে বসেছিল। তারা তাঁকে দেখা মাত্রই সেলাম দেয়। তিনি নৌকা ছেড়ে যখন ওপরে ওঠেন তখন রাত কম হয়নি। তাঁকে উঠতে দেখে যাত্রী ও মাঝিরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়।

বাসায় এসে তিনি আহারান্তে চিঠিপত্র লিখতে বসেন। সব কথা খুলে লেখেন এবং হুঁশিয়ার হয়ে টাকা পয়সার টোপ ফেলতে বলেন। অগাধ জলের মাছ, যেন ছুটে না পালায়।

তিনি শয্যা গ্রহণ করে ঝড়ের চিন্তা করেন—কি দুর্দান্ত ঝড়। আবার সব শান্ত হয়ে গেল। আকাশ এখন জ্যোৎস্নায় ভরা, ঝলমল করছে আলো। তাঁর জীবনটাও তো অমনি ধারা চলেছে। তিনি এখনও ঝড় কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এখনও তাঁর অর্থ চাই, মান চাই, চাই গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। স্থির চিত্তে সে সাধনা তাঁকে করতে হবে—করতে হবে বলেই তিনি দেশের মায়া, মাটীর মায়া কাটিয়ে এখানে এসেছেন। তিনি তাঁর জীবনে জ্যোৎস্নার জোয়ার আনবেন—তখন অর্থের ফুল ফুটবে, ছুটবে খ্যাতির সৌরভ।

বিপ্রপদ সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে চুপ করে আরাম অনুভব করেন।

১৫

এবার সদর থেকে কড়া হুকুম এসেছে যেন একটা টাকাও প্রজাদের কাছে বকেয়া থাকে না। যে নেহাৎ না দেবে তার ভিটামাটি উৎসন্ন করে দিতে হবে। ভয় দেখিয়ে জোর করে যে কোনও ভাবে টাকা আদায় করা

চাইই। বাবুদের মধ্যে কে কে যেন বিলেত যাবেন, খরচা জোগাতে হবে। নায়েব মুহুরীদেরও তো দু পয়সা কামাই করা দরকার—নইলে তারা খাবে কি! তারা প্রজাওয়ারি হিসেবের মধ্যে যারা অল্প খাজনা দেয় তাদের নাম লিষ্টিভুক্ত করে পেয়াদা পাঠায়, হৈ চৈ করে খুব—মার-ধরও চলে, কিন্তু তাতে আসলে পয়সার কাজ হয় না। মনিবের তহবিল প্রায় শূন্য পড়েই থাকে। বড় বড় প্রজারা ঘুষ দেয়—তারা থাকে ঘুষের আবডালে লুকিয়ে। বিপ্রপদ সব খাতা পত্তর খুলে, রাত জেগে, নায়েব মুহুরীর কারসাজি ধরে ফেলেন। ফলে তারা গাল মন্দ শোনে—শুনে, কানে জল বায়। তখন অন্তরালে লুকান জীবগুলো ধরা পড়ে। করকরিয়ে টাকা আদায় হতে থাকে। খাজাঞ্চীর খাটুনী বাড়ে, বাবুদের তহবিল ভারী হয়। বিপ্রপদরও পেট ভরে। সপ্তাহে দু বার সিন্দুক বোঝাই হয়ে টাকা সদরে চালান হতে থাকে।

সেদিন কার যেন একটা গরু এনে কাছারীতে বাঁধল। গরুর মালিক সভয়ে করজোড় করে এসে দাঁড়াল। কিন্তু নায়েব কাজে ব্যস্ত, ওদিকে নজর নেই তার। বেচারী কিছু বলতেও পারে না, করজোড়ও খুলতে পারে না—ঠায় জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। নাকে এসে একটা মাছি পড়ছে, কখনও পড়ছে কানে, ভীষণ বিরক্ত! সে এ পাশ ও পাশ মুখ ঘুরাচ্ছে তবু হারামজাদা মাছি পালায় না। উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে এসে বসে। সে করজোড়ও খুলতে সাহস পায় না, যদি সেই মুহূর্তে বেটা বদমেজাজী নায়েব ওর দিকে চোখ ফেরায়। অতএব সে দাঁড়িয়ে নাক-কান সংকুচিত ও প্রসারিত করতে চেষ্টা করে।

ভাগ্যক্রমে সেই সময় বোধ হয় হরগৌরী সেই পথ দিয়ে অন্তরীক্ষে যাচ্ছিলেন। তাঁদের আশীর্বাদে ও গরুর পুরুষকারে বন্ধনরজ্জু শিথিল হয়। গৃহপালিত জীবটা বারান্দা থেকে গৃহে প্রবেশ করে। সুমুখে নায়েবকে পেয়েই তার সলোম দেহটা চাটতে আরম্ভ করে দেয়। ক্রমে

দেহ ছেড়ে দাড়ি। হয়ত ওটা তাকে এক জাতীয় জীব বলে ভ্রম করে। নায়েব চুপ করে আরামে কার যেন সর্বনাশের মুশাবিদা করতে থাকে।

এমন সময় বিপ্রপদ কাছারী ঘরে ঢুকেই অবাক। 'ও কি নায়েব মশাই, ও কি? গরুতে চাটে বাঘের গাল—শিবচর কাছারীর বাঘ! অবাক করলেন যে! বুড়ো হয়েছেন বলে এত অপমান?'

তড়াক করে উঠেই নায়েব লাগিয়ে দেন একটা লাইন-টানা রোলারের বাড়ি। বাড়িটা অপমানের অনুপাত মত জোরেই পড়ে। বেচারী গরুটা হাম্বা-য়া-য়া করে ওঠে।

এবার ওটার মনিবের পালা।

বিপ্রপদ বলেন, 'তুমি কি চাও হে বাপু?'

'আমি—আমি—দু সন খাজনা, আমার বকেয়া···মাত্র দু সন ঐ একটা গরু···'

বিপ্রপদ সব বুঝতে পারেন। 'তোমার বাড়ী কত দূর?'

'এই তো নিকটেই।'

'তুমি একটু দুধ-টুধ দিতে পারো?'

'কেন পারব না বাবু, খুব পারি—এক্ষুনি দুইয়ে দিতে পারি। দেবো এক্ষুনি? এই শ্যামা!'

গরুটা আবার একটা শব্দ করে—অর্থাৎ অসময়ে তার ওলান টন্‌টন্‌ করলেও মনিবের জন্য সে যে-কোনও দুঃখ কষ্ট বরণ করিতে রাজী।

'কাকে দিতে হবে হুজুর দুইয়ে?' একটা পাত্রের সন্ধান করতে থাকে লোকটা।

বিপ্রপদ বলেন, 'আমাদের শিবচরের বাঘ বুড়ো হয়েছেন—গলিত নখ দন্ত, পলিত কেশ—এখন আর মাছ-মাংস খেতে পারেন না, হবিষ্যান্নভোজী, তুমি এক সের করে রোজ দুধ দিতে পার না? তোমার বছরে খাজনা কত?

'ছ পয়সা।'

'মাত্র! এর জন্য তুমি ভাবো? তুমি নিতান্ত বোকা। রোজ এক সের করে দুধ দিলে তিনশো ষাট সের কি কিছু বেশী হয় বছর—তোমারও ভার কমে। উনিও হাল্কা হন—বকেয়া খাজনার জের টানতে হয় না।'

কর্মচারীর দল মুখ টিপে টিপে হাসে।

'তুমি এখন যাও হে বাপু। কাল কি আজ বিকালে তোমার বাড়ী যাবো, একটু দুধ-টুধ জোগাড় রেখো।'

বিপ্রপদ মৃদুকে একটু হাসেন! লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তুমি এখন আর দাঁড়িয়ে থেকো না—যাও, আমাদের কাজ আছে।'

লোকটা গরুটাকে নিয়ে বিদায় হয়। যাওয়ার সময় সর্বাগ্রে প্রণাম করে নায়েবকে—তারপর অন্যান্য সকলকে।

'নায়েব মশাই শক্তের ভক্ত, নরমের যম। তা না হলে তিন আনার জন্য অগ্রিম একটা গরু ক্রোক!'

নায়েব আর মাথা তুলতে পারে না।

সন্ধ্যার সময় বাস্তবিকই বিপ্রপদ বেড়াতে বেড়াতে গরুওয়ালার বাড়ী যান। সংগে কাউকে নেন না। তাকে দেখেই গরুওয়ালার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়। শিবচর কাছারীর ম্যানেজার, যম যাকে দেখলেও ভয় পায়—তিনি সশরীরে তার দ্বারে।

ও কেঁদে ফেলে। 'হুজুর, আমার একটি মাত্র মা-মরা মেয়ে। আমাকে ধরে নিলে ও মরেই যাবে। আমি আজ দুধটুকু দিয়ে আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু মেয়েটা কখন যেন বেচে চাল কিনে এনেছে। কাল থেকে আর আমার ভুল হবে না।'

ওর কান্না দেখে বিপ্রপদ কি যে বলবেন কি যে না বলবেন, তা ঠিক করতে পারেন না। 'ভয় নেই, তোমার কাছে কেউ দুধ চাইতে আসেনি। সকাল বেলা আমি ঠাট্টা করে বলেছি। তুমি কেঁদ না হে, কেঁদ না।'

একখানা তেরর বন্দ খড়ের ঘর। চার আনা কি পাঁচ আনার মেটে বাসন, কখানা ছেঁড়া কাঁথা ও থান দুই তিন পুরোন কাপড় নিয়ে একটা সংসার। আয়ের জিনিষ ঐ গরুটার দুধ। ওদের মত প্রজার দু-দশ টাকা তমাদি হলে হয় কি? সদরে এ সব জানান যাবে না—কারণ ওপর ওয়ালারা শাসন চায়, শৈথিল্য পছন্দ করে না। তারা ঠিক ধনী দরিদ্র বুঝতে চায় না—এ সব স্থানীয় কর্মচারীদেরই বোঝা দরকার।

ফেরবার পথে বিপ্রপদ ভাবেন: তিনিও তো তালুক কিনবেন। তাঁরও প্রজার মধ্যে এমনি অন্নহীন, কত আশ্রয়হীন প্রজা থাকবে—তাদের বেলা তিনি কি ব্যবস্থা করবেন? তাঁর কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও তো কত নালিশ কত অনুযোগ শোনা যাবে। কত প্রজারা রাত কাটাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে। তিনি আর মুনাফার টাকা কয়টা ঘরে তুলবেন না। যা লাভ হয় ওদের জন্যই ব্যয় করবেন। নিজের সংসার নিজেই খেটে চালাবেন। তালুক থাকবে সম্মান ও খ্যাতির জন্য। দরিদ্র সাধারণের অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান ও খ্যাতিই তাঁর কাম্য।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর গ্রাম্য নির্জন পথ দিয়ে চলতে ওঁর ভালই লাগছে। এ কদিন আর মাটির সংগে পরিচয় হয়নি। বদ্ধ ঘরে বসে বসেই সময় কেটেছে। ধূলোগুলো উড়ে এসে জুতো জোড়ায় একটা প্রলেপ পরিয়ে দিচ্ছে। গাছ পালাগুলো চোখে লাগছে বড় সুন্দর। সারি সারি নধর নারকেল সুপারি গাছ, তার ভিতর দিয়ে চলেছে পথ,—সেই পথের দুপাশে আম জাম খেজুর রয়েছে সাজিয়ে। বাগানের ভিতর স্যাঁতসেঁতে জায়গাগুলোও বাদ যায়নি—সেখানে অজস্র আনারসের গাছ। তার আশে-পাশে কেয়া-ঝোপ। ঢেঁকির লতা কখনও বড় গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরেছে, নয় তো এড়িয়ে গেছে। কোথাও বা অজস্র গাছে সহস্র কাঁটা শানিয়ে রেখেছে। ওঁর বাগানগুলোও তো

এমনি পূর্ব। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। বাড়ী থাকলে নিজের হাতেই বিপ্রপদ যত্ন করেন। সারে জলে তারা এখনও অবশ্য বাড়ছে। একবার দেখতে ইচ্ছা করে নতুন কলমগুলো। রোজই একটু একটু করে বাড়ে, দু চারটে পাতা মেলে। বিকাল বেলা জল দিলে ওদের সবুজ হাসি খোলে। ওরা যেন কি বিপ্রপদকে বলতে চায়। বোবা ভাষা, বোবা চাহনিতে কত যে ব্যঞ্জনা, তা শুধু তিনিই বোঝেন।

বাড়ীর জন্য সহসা মন ব্যাকুল হয়। অমরেশ কমলকামিনী সেবা সকলে এক সংগে ওঁর মনের বাগানের গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এসে দাঁড়ায়। অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থাকেন বিপ্রপদ। সকলের শেষে আসে বড় মেয়েরা—হাত ধরাধরি করে অর্দ্ধবৃত্তাকারে। তারা হাসে, গান গায়, করতালি দিয়ে নাচে। তারপর সবাই শ্যাম সন্ধ্যার তরল আঁধারে বাগানের গহনেই মিলিয়ে যায়। বিপ্রপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

বিপ্রপদ কাছারীতে ফিরে সকল চিঠি ঠেলে রেখে বাড়ীর চিঠিটা খুলে পড়তে বসেন। মৃদু আলোটা উসকে দিয়ে দেখেন একগাদা চিঠি খামের ভিতর। সকলেই লিখেছে। সেবা শুধু লিখতে পারেনি—একটা কচি হাতের ছাপ পাঠিয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা কসরৎ করে, অনেক অকার ইকার যোগ বিয়োগ করে বিপ্রপদ চিঠি পড়া শেষ করেন। বাবাকে সকলের দেখতে ইচ্ছা করে, কবে পর্যন্ত তিনি বাড়ী ফিরবেন, তাই সকলে জানতে চেয়েছে। এই গেল ছেলে মেয়েদের কথা। বুড়োদের কথা : ইছমাইল মিঞারা দু-এক দিনের মধ্যে সেন মশাইর সংগে দেখা করে সংবাদ জানাবে। একখানা খামের একেবারে দাম তুলে নেওয়া হয়েছে। পাকা কাঁচা নানা হরফের চিঠি। তিনি রাত্রে আর নিজের কোনও কাজে মন দিতে পারেন না। এক একখানা করে সব চিঠির জবাব লেখেন। কাউকে তিনি বঞ্চিত

করেন না, এমন কি সেবাকেও। পত্রের উত্তর লিখে তিনি একটা তৃপ্তি বোধ করেন।

সকাল বেলা উঠে আবার কাছারীর কাজে মন দিতে হয়। কিন্তু মন কিছুতেই কাজে বসতে চায় না। বাড়ীর জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। দক্ষিণের বিলের কথা মনে পড়ে। সেখানে যেতে হবে, কত কি যে করতে হবে! নিতাই ইমাম তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। তিনি দেশে না গেলে জমি দখল হবে না। এবার দেশে আউসের বীজ বুনে চারা তুলে নিয়ে বিলে লাগাতে হবে। সারি দিয়ে নুয়ে নুয়ে কৃষাণেরা রুয়ে যাবে, গান গাবে—বর্ষা আসবে পশলায় পশলায়। একবার ভিজে যাবে, আবার শুকাবে ওদের দেহ। সারা দিন ভরে খাটছে, তবু তারা হাসছে—প্রাণখোলা হাসি। কিন্তু বিপ্রপদ তো হাসতে পারেন না। হাসলে গাম্ভীর্য নষ্ট হয়—অধীনস্থ কর্মচারীরা মানবে কেন? রাইওৎ প্রজাই বা শাসনে থাকবে কেন? হুজুর হয়ে শুধু শাসন—মানুষকে পীড়ন। উনি একটা যন্ত্রবিশেষ। ওর ভিতর দিয়ে যেন কতগুলো টাকা তৈরী হয়ে চালান হচ্ছে সদরে। তারপর সেখান থেকে আরও কত দূরে যাবে কে জানে! যাবে হয়ত পারীর কোনও রাঙা ঠোঁটের দাম দিতে—নয়তো যাবে লণ্ডনের কোনও টুকটুকে মেয়েকে ঘর থেকে বের করে আনতে। বাংলা দেশের তাজা রক্ত, চাষীর রক্ত, নিংড়ে পাঠাবেন বিপ্রপদ, চুষে নেবেন ফেলে-ছড়িয়ে খাবেন বিদেশী বিবিরা। পাঁচশালা নয়, দশশালা নয়—এ সব বাবুদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পৈত্রিক ক্ষয় রোগ—অক্ষয় হয়ে রয়েছে তাঁদের ঘরে।

এ কাজে আর মন বসে না—ছুটি চান বিপ্রপদ। চান ফিরে যেতে নিজ গৃহে নিজ পরিবারে। কিন্তু ফিরে গেলে তার সংসার চলবে কি করে? কত যে ব্যয়-বহুল কাজ পড়ে আছে তার তো অন্ত

বিপ্রপদ সহজেই সব বোঝেন। মেয়েটার জন্যই কাজ কর্ম বন্ধ, কোদাল নিয়ে আস্ফালন—একবার রুখে রুখে এগোন, আবার কি বুঝে যেন কয়েক কদম পিছোন। দুদলই সমান তালে ঝগড়া করে যাচ্ছে। একটি কৃষাণও নিরপেক্ষ নেই।

তিনি থামতে বলেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ক্রমশ অবস্থা সঙিন হয়ে ওঠে। স্ত্রীলোকটি এক পক্ষের টানে পড়ে গেল মস্ত বড় একটা শুকনা মাটির ঢেলার ওপর। তৎক্ষণাৎ আর এক পক্ষ টেনে তুলল তাকে। তার কপালটা কেটে রক্ত ঝরছে। পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখছে। পেয়াদা পাইক বা অন্য কেউ কিছু বলছে না। মানুষ যে কুকুরের মত কলহ করতে পারে তা বিপ্রপদর জানা ছিল না। ঘটনাটা আর একটু ঘোরাল হতেই তিনি বিদ্যুতের মত জ্বলে ওঠেন। কিন্তু এতে অবস্থার উন্নতি না হয়ে আর একটু খারাপের দিকেই যায়। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—ফিরে দাঁড়ায় বিপ্রপদর বিরুদ্ধে।

কে যেন পিছন থেকে বলে, 'ওরা ছোটলোক, ভীষণ দুর্দান্ত—ফিরে আসুন বাবু।'

বিপ্রপদ ভীরু লোক নন। তিনি কেন ফিরবেন ন্যায্য কাজে? কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে হঠাৎ লাফিয়ে পড়েন এক জনের হাত থেকে একটা লাঠি টেনে নিয়ে। চরকীর মত লাঠি ঘুরছে, ওরা পালাচ্ছে কুকুরের মত! বাজের মত ছোঁ মেরে অর্দ্ধনগ্ন মেয়েটাকে নিয়ে তিনি ঘুরে আসেন পুকুর পাড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা। দৈহিক শক্তির কাছে ষাঁড়ের গোঁ লুটিয়ে পড়ে। মজুরগুলো তখন হাতজোড় করে এসে দাঁড়ায়—বিচার চাই। একটা পেয়াদার জিম্মায় ঐ মেয়েটাকে রেখে, তিনি কাছারী বাড়ীর দিকে নিজের জামা কাপড় বদলাতে যান—এ-ও বলে যান, বিকালে বিচার হবে।

কাছারী বাড়ীর খোলা স্থানটায় বিচার সভা বসেছে। প্রায় দু তিন

শ লোক জমা হয়েছে। বিচারক বিপ্রপদই স্বয়ং। এখানে তাঁর সম্মান এক জন জেলার জজের চেয়েও বেশী।

একজন দোভাষী উভয় পক্ষের কথা বুঝিয়ে দেবে বলে খাড়া হয়েছে। মানুষটা বুড়ো কিন্তু দেখতে অনেকটা ছুঁচোর মত। দাড়ি গোঁফের বেশী বালাই নেই।

মেয়েলোকটি বিপ্রপদর নিকটে এক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার আশ পাশ থেকে বারবার ভিড় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার মুখখানা দেখলে মনে হয় যেন এতগুলো লোকের সুমুখেই তাকে অক্রোপচার করা হবে।

বাদী বিবাদী দুদল দাঁড়িয়েছে দুভাগে ভাগ হয়ে। সকলেই জোড় হাত—কাঁচু মাঁচু চেহারা! ওরা 'ঘা-খাওয়া' ঘুঘু। সময় বুঝে চলতে ওস্তাদ।

বিপ্রপদ ভাবেন : চাকরী করে মানুষ শুধু পয়সার জন্য নয়, গৌরবের জন্যও বটে! এতে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে, পংগু করে রাখে তার নিজস্ব সত্তা। তাঁর মোহ কাটাতে হবে। সোজা কথায় গোলামীর জাঁকজমকে তাঁকে আর ভুলিয়ে রাখতে পারবে না কিছুতেই। তিনি বাঁধন কাটবেন। এই যে পেয়াদা পাইক কর্মচারী, নায়েব গোমস্তা মুহুরী, পাল্কী ঘোড়া কোষনৌকা—এ সকলই মাকাল ফলের রঙিন প্রলেপ। রঙের আভায় তিনি আর ভুলবেন না।

কৌতূহলী জনতা নিয়ে মুস্কিল হয়েছে। তাই বারবার কটু ও উষ্ণ কথায় ভিড় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

'এখন বলো ঘটনাটা, সকলে শুনুক।'

দোভাষী বলে, 'হুজুর, প্রথম পক্ষ বলছে, ঐ মেয়েটা গত বছর ওদের ছাউনীতে ছিল—তখন ওরা কাজ করত পশ্চিমে কোন এক সহরে যেন, দ্বিতীয় পক্ষের সাথে।'

'সহরটার নাম কি ?'

'বলছে ওদের মনে নেই—ওরা মুখ্যু লোক।'

'এ তো বড় আশ্চর্য ! এতগুলো লোকের ভিতর এক জনও নাম জানে না ?'

'না।'

এ দল ও দলের মুখের দিকে কটাক্ষ করে।

'আচ্ছা বেশ !' বিপ্রপদর সন্দেহ হয় যে এর ভিতর একটা রহস্য আছে ! 'তারপর বলে যাও।'

'প্রথম পক্ষের খুঁদি সেখ ওকে নাকি নিকে করে এনেছে একটা ছোট ছেলে সমেত। তার আগেও নাকি ওর কতকগুলো ছেলেমেয়ে হয়েছে—সেগুলো যাদের ঘর করেছে, তাদের ঘরেই রয়ে গেছে।'

জনতার ভিতর একটা চাপা বিদ্রূপের হাসি শোনা যায়।

'এর আগে কবার ঘর ভেঙেছে ?'

দোভাষী জিজ্ঞাসা করে মেয়েটাকে, 'কবার ? বল না ক ফির ?'

মেয়েটা ধীরে ধীরে ওর কানে কি যেন জবাব দেয়। 'হুজুর ছ সাত ফির—বেশীও হতে পারে।'

'বলো কি !'

দোভাষী সকলকে তাক লাগাবার জন্য একটু মুন্সীয়ানা করে বলে, 'ঘর ভেঙেছে, আর বাচ্চা ফেলে এসেছে !'

বিপ্রপদ মন্তব্য করেন, 'হুঁ। তারপর ?'

'কি করবে হুজুর, পেটের জ্বালা বড় বিষম জ্বালা। সে জ্বালার কাছে ছেলেমেয়ের বালাই নেই। ওর মা ওকে বার না তের বছর বয়সে যেন প্রথম বিক্রি করে কোন এক কসাইর কাছে। কাজ ফুরিয়ে গেলে, সে ওকে মেহেরবাণী করে, জবাই না দিয়ে, বেচে যেন কোন কুলীদের কাছে। তারপর কেবল হাত ঘুরেছে। কাজ ফুরিয়েছে, আর হাত ঘুরেছে।

নেমন্তন্ন বাড়ীর এঁটো পাতার মত কত কুকুরে যে চেটেছে তার কোনও ঠিক-ঠাক নেই। ছানাগুলোরও কি বাপের ঠিক আছে হুজুর—ও নিজেই কি ঠিক রাখতে পেরেছে কিছু! তাই যখন যার ঘাড়ে যেমন সুবিধা ফেলে পালিয়েছে। এ সব আমি ওর কাছে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে বলছি। একটি কথাও মিথ্যা বা 'বানাট' (তৈরী) নয়।

এতক্ষণ মেয়েটাও হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল—সে কাঁপতে থাকে।

বিপ্রপদ তাকে ইসারায় বসতে বলেন। সে মাটিতেই বসে পড়ে।

একটু আগের বিদ্রূপ-মুখর জনতা কেন যেন চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে রইল। সমাজে অধঃপতিতা এই নারী, নিদারুণ ব্যভিচারে এর যৌবন গতপ্রায়, লক্ষ গ্লানির চিহ্ন এর প্রতি অংগে—তবু আর যেন কেউ একে কোনও ইংগিত করতে সাহস পায় না। সকলেই কেমন যেন একটা সংকোচে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে।

স্তব্ধতা ভাঙেন বিপ্রপদ। 'তার পর দ্বিতীয় পক্ষ কি বলেছে?'

'হুজুর, দ্বিতীয় পক্ষ বলেছে: প্রথম পক্ষের জবানবন্দী শেষ হলে ওরা ওদের কথা বলবে।'

'তা ঠিক, তাই ভাল।' বিপ্রপদ একটু যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। প্রথম পক্ষের আর বলার কি আছে?

'দ্বিতীয় পক্ষের ঝুনু সেখ নাকি চুরি করে এনেছে প্রথম পক্ষের ছাউনী থেকে। সেই নিয়েই ঝগড়া! খুঁদির নিকার স্ত্রীকে কোন আইনের বলে ঝুনু জোর করে রাখবে?'

দ্বিতীয় পক্ষ তখনি জবাব দেয়, অবশ্য দোভাষীর মারফতে। 'কে বললে চুরি করে এনেছে ঝুনু? সে-ই ঠিক ওকে নিকে করে এনেছে এক থানকির কাছে থেকে—অর্থাৎ এক বেশ্যার কাছে থেকে। খুঁদির কথা মিথ্যা।'

'না হুজুর, ঝুনুই নাকি মিথ্যা বলছে, খুঁদির কথা একেবারে সত্যি।'

ব্যাপারটা সকলের কাছে বড়ই ঘোরাল হয়ে ওঠে।

বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রথম পক্ষ যে ওকে দাবী করছে তার কি কোনও কারণ দেখাতে পারে ঝুনু—ঐ দ্বিতীয় পক্ষের লোকটা?'

দোভাষী বলে, 'পারে।'

'কি কারণ?'

'প্রথম পক্ষের ওই খুঁদি সেখের বৌটা আর এই মেয়েলোকটা নাকি দেখতে অনেকটা এক রকম। সেই বৌটাতে নাকি ওর অরুচি ধরেছে—এখন ফাঁকে-চক্কোরে নতুন একটা চেখে দেখতে চায়। ও কি কম হারামী! বেশ একটা জটিল মামলা দাঁড়াল হুজুর। এরা কেউ সহজ লোক নয়। হাইকোর্টের উকিলের মাথা খায়।'

'সেই বৌটা আর এই মেয়েলোকটা সত্যিই কি দেখতে এক রকম? এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না।' বিপ্রপদ বলেন।

'একটা আছে, আর একটা এখানে নেই—আছে নাকি দেশে, দুটোকে তো একত্র করা যাবে না, তখন আর যাচাই হবে কি করে? এ প্রমাণ অগ্রাহ্য। হুজুরের কি মত?'

'অগ্রাহ্য তো বটেই। ঝুনু সেখ ওকে নাকি নিকে করে এনেছে এক বেশ্যার কাছে থেকে—তার ঠিকানা কি? নামই বা কি?'

'নাম, রামতারা—থাকে রতনপুর বন্দরে।'

'বেশ্যাটা হিন্দু আর এরা মুসলমান! ভাল মজা!'

'মজা নয় হুজুর—এমন নতুন কিছুও না। আসলে এ লোকগুলো হিঁদুও নয়, মুসলমানও নয়। যখন যেমন তখন তেমন করে জীবন কাটায়। এরা নামাজ-রোজাও করে না, সন্ধ্যাহ্নিকেরও ধার ধারে না। নামের শেষে একটা সেখ কি তারা দিয়েই কিছুই ধরে নেওয়া চলে না। এরা এটাও মানে না, ওটাও করে না। এমন লোক যে কত আছে সংসারে!'

'রতনপুর থেকে যে বিয়ে করে এনেছে, তার কোনও প্রমাণ দিতে পারবে ঝুনু? কোনও সাক্ষী-সাবুদ আছে?'

দ্বিতীয় পক্ষের ঝুনু সেখ বলে, 'আলবৎ আছে, এই যে চোথা।'

'গরু-বাছুর না কি যে চোথা দেখাচ্ছ?'

'গরু আর জরু সমান হুজুর—চোথা তো লাগবেই, নইলে হারিয়ে গেলে, পালিয়ে এলে ধরবে কিসের জোরে?'

প্রথম পক্ষের খুঁদি সেখ প্রতিবাদ করে, 'ও মিথ্যা চোথা!'

দোভাষী ওদের মত করে পরিষ্কার বাংলায় কথাগুলো তর্জমা করে দেয়। কখন বলে জোরে, কখন ধীরে—যেমন যেখানে প্রয়োজন। কিন্তু তাতে যেন বিষয়টা জড়িয়ে যাচ্ছে, পরিষ্কার হচ্ছে না একটুও।

বিপ্রপদ বিব্রত হয়ে পড়েন। এতগুলো লোকের সামনে একটা সুবিচার করে রায় না দিতে পারলে বড়ই লজ্জাজনক। চাকরির জীবনে তিনি এমন কঠিন পরীক্ষায় কখনও পড়েননি। তিনি চোথাখানা হাতে নেড়ে-চেড়ে চিন্তা করতে থাকেন। কাগজটাও অযত্নে রক্ষিত—পেন্সিলের লেখা, একটা অক্ষরও বোঝা যায় না। হয়ত সাদা একটা পুরানো কাগজ নাকি তাই বা কে জানে! এ সব লোকের পক্ষে কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব নয়। এবার একবার মেয়েটাকে জেরা করে দেখা যাক। ও আবার কোন রহস্যের অবতারণা করে কে জানে!

'এখন মেয়েলোকটা কি বলে, ওর নাম কি?'

সকলকে যেন আশ্চর্য করে দিয়ে সহজ বাংলায় মেয়েটি জবাব দেয়, 'হুজুর, আমার নাম আসমানতারা?'

'তুমি এমন বাংলা শিখলে কোথায়।'

'ছোটবেলায় আমার মা আমাকে নিয়ে কলকাতায় আসে—আমি সেখানে অনেক দিন ছিলাম।'

'আসমানতারা, আশা করি, তুমি আমার কাছে সত্য ছাড়া মিথ্যা

কিছু বলবে না—যদি মিথ্যা বলো তবে তোমারই ক্ষতি হবে। ঠিক দোষীকে যদি না ধরতে পারি, তবে সাজা দেব কাকে?'

'হুজুর, আমি আপনার কাছে জেনে শুনে মিথ্যে বলব না।'

'এদের দুজনের মধ্যে কার কথা সত্য? প্রথম পক্ষের খুঁদির না দ্বিতীয় পক্ষের ঝুনুর? কে তোমাকে বাস্তবিক নিকা করে এনেছে?'

আবার সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে আসমানতারা জবাব দেয়, 'এদের দুজনের এক জনকেও আমি চিনি নে হুজুর। আমাকে—'

'চুপ করো।' বিপ্রপদ ক্রুদ্ধ হয়ে তীব্র কণ্ঠে বলেন, 'সবগুলোই মিথ্যাবাদী—এদের দল সমেত চালান দিয়ে দেবো থানায়।'

জনতাও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 'তাই করুন হুজুর, তাই করুন। দেখবেন, থানায় গেলে মারের চোটে কথা আদায় হয়ে যাবে।' কেউ কেউ বলে, 'ও মাগীও কি কম! সাত-ভাতারে খানকি, বলবে আবার সত্যি কথা? ওকেই আগে চাবকান দরকার।'

'এই, তোমরা চুপ করো। তোমরাই যদি বিচার করো তবে আমি এখানে বসেছি কেন? যা-তা কেউ বললে তাকে এক্ষুনি শিক্ষা দিয়ে দেবো। চুপ সব।'

আবার ভিড়টা ঠাণ্ডা হয়। বিপ্রপদ চেয়ে দেখেন, আসমানতারার মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ওর মুখের ব্যঞ্জনার মধ্যে তিনি যেন কোন ছল চাতুরী খুঁজে পান না। খুঁদি এবং ঝুনু শেখের দলকে একটু প্রফুল্ল বলেই মনে হয়। এত সময় জেরার পরও রহস্য শিথিল হওয়া তো দূরের কথা, আরও জটিল হয়ে উঠল। এখন কি প্রশ্ন করবেন?

আসমানতারা বলে, 'হুজুর মা বাপ—আমি সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলছি নে।'

'ওদের কেউকে চেন না তবে তুমি এখানে এলে কি করে—এমন ঠাঁই-ঠিকানায় ওরা তোমাকে দাবীই বা করছে কি করে?'

অবশেষে রহস্য ভেদ করে দেয় আসমানতারা। ও এইমাত্র জানে, ওকে আমতলার ছাউনী থেকে রাত্রে এরা চুরি করে এনেছে দুজনে মিলে। ওর এখন যে বাস্তবিক স্বামী—ওকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে কোথায় তাড়ি না ধেনো-মদ খেতে গিয়েছিল। ওর জ্ঞান হলে দেখে যে, ও এদের ছাউনীতে শোয়া। দু পক্ষের লোকই গিয়েছিল—কিন্তু ওকে কে আগে প্রথম ব্যবহার করবে তাই নিয়েই বচসা। রাত্রের বচসা দিনে ঝগড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। আসমানতারা ধীরে ধীরে থেমে থেমে কখন মাটির দিকে চেয়ে কখনও বা আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে সব কথা বলে যায়।

ক্ষণিকের জন্য বিপ্রপদ নীরব হয়ে থাকেন।

সভাটাও স্তব্ধ হয়ে থাকে। কেউ খুন জখম হয়নি, বিচারে কারুর ফাঁসীর হুকুমও কেউ দেয়নি—তবু সকলে যেন স্তম্ভিত হয়ে কালহরণ করে।

বিপ্রপদ ভাবেন: মানুষের একটা ক্লান্ত দেহ নিয়ে মানুষে মানুষে কুকুরের মত ধ্বস্তাধ্বস্তি! 'আসমানতারা, তুমি কোনও প্রমাণ দেখাতে পারো?' এ কথাটা তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায়ই আইনের খাতিরে জিজ্ঞাসা করেন।

'কিসের প্রমাণ হুজুর?'

'তোমাকে যে আমতলার ছাউনী থেকে আনা হয়েছে!'

'সেখানে আমার একটা দুধের ছেলে আছে!'

বিপ্রপদ পেয়াদাদের ঝুনু ও খুঁদিকে এবং বেছে-বেছে ওদের মধ্যের মোড়লদের আটক করে রাখতে বলেন। এখন মিথ্যা মামলাও ওরা সাজাতে পারে! আসমানতারার কথা সত্য বলে প্রমাণ হলে ওদের থানায় চালান দেওয়া হবে।

ঘোড়ার পিঠে তখনই আমতলা লোক যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে

ফিরে আসে—সংবাদ সত্য। প্রমাণস্বরূপ ছেলেটাকে নিয়ে তার বাপ আসছে হেঁটে।

কিছু সময় পরেই সে এসে উপস্থিত হয়। ছোট ছেলেটা অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে মার কোলে। মার বুক ঠাণ্ডা হয়।

বিপ্রপদ যেন একটা মহা দায় থেকে উদ্ধার পেলেন—তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলেন, 'এখন তুমি তোমার স্বামীর সংগে যাও।'

'না, আমি তা যাব না হুজুর।'

'কেন?'

সভার মধ্যেই মেয়েলোকটা বিপ্রপদর পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে থাকে। সে কিছুতেই যাবে না তার সংগে। সে এখানেই থাকবে হুজুরের কাছে। দুটো ভাত পাত কুড়িয়ে খাবে। ওর গতরে আর সয় না। ওর গতর ক্ষয়ে গেছে অসৎ ব্যবহারে। সাত আটটা স্বামী ওকে চেকেছে, ওর আর স্বামীর সখ নেই। ও আর যাবে না, কিছুতেই যাবে না। ও হুজুরের পায়ের তলায়ই পড়ে থাকবে।

বিপ্রপদ কিং কর্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকাতে থাকেন চারিদিকে।

একটা স্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যায়, 'হুজুরেরই বিহিত করা উচিত!'

অগত্যা বিপ্রপদ আসমানতারাকে স্থান দেন। স্বামীটা বোকার মত ফিরে যায়—কিছু বলতেও সাহস পায় না।

আসমানতারাকে একটা ঘর ঠিক করে তাকে সাবধানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। পরে যা হোক চিন্তা করে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। সেদিনের সভা এখানেই শেষ হয়।

ভালই হলো বিপ্রপদর। কর্মক্লান্ত জীবনের অবসর বিনোদনের একটা সুযোগ জুটল। আসমানতারাকে যে ঘরখানা দেওয়া হয়েছিল, সেখানায় বেশী দিন তার পক্ষে থাকা অসম্ভব। তার আব্রু রক্ষা হয় না।

তার জন্য একখানা পৃথক ঘর চাই। রান্নাঘরেরও একটা ভাল ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাকে একটা কাজও দিতে হবে। বিপ্রপদর হৃদয়ে বড় আঘাত লেগেছে আসমানতারার জন্য। কিশোর বয়স থেকে অত্যাচার ও ব্যভিচারে ওর হৃদয় মন জর্জরিত। ওর নারীজীবনের কোনও কামনাই সার্থক হয়নি। তাই অতি সহজেই স্বামীর সংগ ত্যাগ করতে পারল। বছরের পর বছর ও যাদের সন্তান ধারণ করেছে, তারা ওকে শুধু কামনার যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করেছে। তাই ওর এত ঘৃণা দাম্পত্য জীবনে। ওর অংগে অংগে দাগ পড়ে গেছে লাঞ্ছনার। বিপ্রপদ দেখবেন, ওর জন্য কিছু করা যায় কিনা! যারা এমনি দুর্বিসহ জীবন ধারণ করে দিন কাটাচ্ছে—তাদের প্রতিচ্ছবি যেন ঐ আসমানতারা।

বিপ্রপদ ওর জন্য যে ঘরের ব্যবস্থা করলেন—তার পাশ দিয়েই নিত্য দুবেলা তাঁর যাতায়াত। আসমানতারা ওঁকে দেখলেই জড়োসড়ো হয়ে বলে, 'সেলাম হুজুর।'

বিপ্রপদ কখনও হাত তুলে কখনও বা শুধু একটা আঙুল তুলে প্রত্যভিবাদন করে চলে যান।

কোলের ছেলেটা বিপ্রপদকে আসতে দেখলেই তাড়াতাড়ি গিয়ে মার কোলে লুকায়। তারপর সেখান থেকে একটা ভীরু বানর-শিশুর মত চেয়ে থাকে। কি যেন বলে ওর মার কাছে। আসমান-তারাও গায় হাত বুলিয়ে কি যেন বুঝিয়ে দিতে থাকে—ও চুপ করে শোনে।

ধীরে ধীরে নিত্য দুবেলা ওঁকে দেখে ছেলেটার ভয় ভাঙে। ও-ও ওর মার সংগে বলে, 'সেলাম হুজুর।'

বিপ্রপদ এবার না হেসে থাকতে পারেন না। তিনিও প্রতি উত্তরে বলেন. 'সেলাম হুজুর।'

ছেলেটা খিল খিল করে হাসে। দেখতে বেশ দেখায়। ওর মায়ে মুখের ছাপ ওর মুখে।

বিপ্রপদর দু এক দিন ইচ্ছা হয়, ওর অভাব অভিযোগের কথা জানতে—ওর আসবাব বিছানা মাদুর ঠিক মত কিনে দেওয়া হয়েছে কিনা! কিন্তু লজ্জা হয় এই তুচ্ছ মেয়েলোকটার সংগে আলাপ করতে। ওর জামা-কাপড় আছে কিনা, তাও ঐ এক কারণেই জানা হয় না। ওর জন্য বেশী দরদ দেখানই মানে তাঁর সম্মানের বিশেষ ক্ষতি।

কিন্তু ছেলেটা ধীরে ধীরে আলাপ জমায়, 'সেলাম দাদু।'

ওর সাহস দেখে বিপ্রপদ অবাক হন—আবার মনে মনে সন্তুষ্টও হন। কিন্তু একটু পরেই আবার ঘৃণায় তাঁর মন তিক্ত হয়ে ওঠে। নাম গোত্রহীন ওটা কার ছেলে! ওর মা একটা বেশ্যারও অধম। তারই পেটের ছেলে ওঁকে কি সাহসে দাদু বলে ডাক্‌ছে? আবার ভাবেন: ছেলেটা তো তার জন্মের জন্য দায়ী না। তবে তাকে ঘৃণা করার কোনই তো হেতু নেই। ওর মাকেই বা তুচ্ছ করে লাভ কি? যে নিজের বিগত জীবনের জন্য দায়ী নয়, তাকে অবহেলা করা বিবেক ও বিচারবিরুদ্ধ। ও সমাজে অচল, কিন্তু বাস্তবিক ভাবতে গেলে ওকে তো অচলও বলা চলে না। ও হিন্দু কি মুসলমান তাতে কিছু এসে যায় না—ও বিরাট মনুষ্য সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশ। রুগ্ন হলেও ওকে নিরাময় করে নেওয়া ন্যায় সংগত।

'আসমানতারা, তুমি বসে না থেকে কাছারী বাড়ীটা ধোয়া মোছা করলেও তো পারো। একেবারে বসে-বসে দিন কি কাটে?'

'হুজুর, আমাকে দেখিয়ে দিলেই তো পারি।'

পরের দিন কাছারী বাড়ীটা অনেক পরিষ্কার দেখায়। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে নিয়েই ও কাজ করে যায়। এ সব কাজ ওর গায়েই লাগে না। পুকুর কাটতে, মাটি বোঝাই ঝুড়ি টানতে যে পরিশ্রম তার তুলনায়

এ আর কি খাটুনী! সে উঠানটা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে! ঝুড়ি-ঝুড়ি গাছের পাতা কুড়িয়ে এক স্থানে জমা করে রাখে। কাঠের বদলে পাতা দিয়ে রান্না করা যাবে। ছোট ছেলেটা কচি আমগুলো কুড়িয়ে খায়। বিপ্রপদর আশংকা হয় ছেলেটার অসুখ হবে। ও যে একটা সাধারণ কৃষাণের ছেলে সে কথা তিনি ভুলেই যান। ওর মা দেখে কিছু গ্রাহ্যই করে না। সে বরঞ্চ কোল থেকে নামিয়ে একটু রেহাই পায়। কত আর কোলে কোলে রাখতে ইচ্ছা করে।

ক দিনের মধ্যেই কাছারী বাড়ীর শ্রী ফিরে যায়—দেখতে দেখতে উঠানটারও শ্রী ফেরে। আসমানতারা ঐ সংগে বিপ্রপদর ঘর দুখানাও বেশ করে পরিষ্কার করে আসে। আলনা টেবিলের নীচের ময়লাগুলোও দূর হয়। প্রথম প্রথম আসমানতারার ভয় ভয় করে বিপ্রপদর ঘরের কাজ করতে—শেষে ভয় কমে—সহজ হয় সকল কাজ। কাপড় গুছায়, জুতো সাফ করে, বিছানা ছাড়ে, এটা ওটা ঠিক করে রাখে।

বিপ্রপদ সকলই লক্ষ্য করেন। সময় সময় দু একটা প্রশ্নও করেন। আসমানতারাও উত্তর দেয়। তিনি বুঝতে পারেন মেয়েটার বেশ বুদ্ধি আছে। কাজ কর্মও নোংরা নয়। ও যে অজ্ঞাতকুলশীলা তা ক্রমশ সকলেই ভুলে যায়—এমন কি বিপ্রপদও।

এখন সময় সময় দু একটা ফাই-ফরমাসও করা হয় আসমানতারাকে। সে অতি সযত্নে তা করে যায়। এমনি করে সে অল্প দিনের মধ্যেই কাছারী বাড়ীর এক জন হয়ে ওঠে। ওকে না পেলে অনেকেরই অসুবিধা হয় এখন। দোষ ত্রুটি হলে এখন ওকে মাঝে-মাঝে কৈফিয়ৎও দিতে হয়। লোমশ নায়েব মশাই ওকে খুবই পছন্দ করে। তামাক সেজে দিতে ওর জুড়ি নাকি আর কেউ নেই ভূভারতে। ঘন ঘন তামাক চাইলেও ও কক্ষনো কল্কীতে এমন করে তামাক ঠেঁশে ভরে না যাতে লোমশের টানতে অসুবিধা হয়। আজকাল ও যেন একটু খুশী মনেই

চলে ফেরে। দেখলে মনে হয়, ও যেন নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। ওর স্বাস্থ্যও ফিরছে দিন দিন। কঠোর শীতের পর যেমন বসন্ত আসে, তেমনি একটু একটু করে ওর দেহে ফাগুনের প্রলেপ লাগছে। এ সব দেখে বিপ্রপদর খুবই আনন্দ হয়। ওই যে একটু পাতলা রক্ত জমেছে ওর ঠোঁটে, হাড়ে লেগেছে মাংস—নির্ভয়ে বিচরণ করছে ওর ছেলেকে নিয়ে এই কাছারী বাড়ীটায়—এর অন্তরালে রয়েছে কার কৃতিত্ব? তিনি চেয়ে চেয়ে দেখেন এবং মনে মনে স্ফীত হন। প্রথম দিনের সে ভীতিবিহ্বল চাহনি যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। কত স্বাধীনতা যেন এসেছে ওর প্রাণে।

এক এক দিন ওর বিগত জীবনের কাহিনী জানতে ইচ্ছা করে বিপ্রপদর। কিন্তু কতখানি মর্ম্মস্পর্শী না জানি হবে তাই তাঁর জিজ্ঞাসা করতে ভয় হয়। পাছে আসমানতারার এ জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে, তাই তিনি কৌতূহল দমন করেন।

কেন জানি ক দিন আসমানতারাকে দেখা যায় না।

ঘরগুলোয় আবর্জনা জমে নোংরা হয়ে ওঠে। আনপাতায় কাছারী-বাড়ীর উঠানটা ভরে যায়। লোমশ নায়েব ডাকাডাকি করেও তামাক পায় না সময় মত।

কিন্তু বিপ্রপদর ঘর দুখানা প্রথম দু তিন দিন আসমানতারা কোনও রকমে এসে পরিষ্কার করে গেছে। পরে তাও বন্ধ করতে হয়। ওর ছেলেকে ছেড়ে বের হওয়াই অসম্ভব।

বিপ্রপদ খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে আসমানতারার ছেলেটার অসুখ। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে দেখতে যান। এ আবার কি বিপদ! ছেলেটার ভীষণ জ্বর। ঋতু পরিবর্তনের সময় কেমন করে যেন ঠাণ্ডা লেগেছে। বিছানায় পরে ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। অসুখ এর মধ্যেই যে আকার ধারণ করেছে তা গুরুতর। ওঁকে খবর না দেওয়ার জন্য আসমানতারাকে মন্দ বলেন। তখনই ডাক্তার কি কবিরাজ, যা পাওয়া

যায়, তাই আনতে লোক পাঠান হয়। কিছুক্ষণ পরেই লোক ফিরে আসে। ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে এক জন কবিরাজ আছে, সেও বাড়ী নেই। তখনই পাঁচ সাত মাইল দূরে ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠান হয়।

ক ঘণ্টা পরেই ডাক্তার আসে—পাশ-করা ডাক্তার। ঔষধপত্র নিয়ম মত দেওয়া হয়। বিপ্রপদও নিশ্চিন্ত হন্। কিন্তু সন্ধ্যার সময় অসুখ ক্রমে বেশীর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তিনি আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

সেই রাত্রেই আবার ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠান হয়।

বিপ্রপদ ভেবেছিলেনঃ এই ছেলেটা একটু বড় হলে ওকে লেখা পড়া শিখিয়ে একটু মানুষ করবেন। ও আসমানতারার জীবনের সব দুঃখকষ্ট লাঘব করবে। স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেবে মার বুকে। ওর দিকে চেয়ে আসমান-তারা সব ভুলে যাবে। কিন্তু বিধাতা বুঝি বিবাদী। কি আর করবেন বিপ্রপদ! তবু চেষ্টা যত্ন করে দেখবেন।

সময় মত ডাক্তার আসে আবার। ঔষধপত্র অদল বদল হয়। রাত্রে আর ডাক্তারকে যেতে দেওয়া হয় না। ভোরের দিকে রোগী একটু ভাল বোধ করে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই—নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত। ছেলেটা মারা যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বিপ্রপদ উঠে পড়েন। আশা চোরাবালি! কখন যে কে তার কবলে পড়বে বলা যায় না। আসমানতারার ভবিষ্যৎ ভেবে বিপ্রপদ যথেষ্ট দমে যান। এ বন্ধনহীনা রমণীর উপায় হবে কি?

ছেলেটার জন্য কফিন এলো—একটু দামী কফিনই এলো বিপ্রপদর চেষ্টায়। সুগন্ধি আতর, নতুন কাপড় যা যা প্রয়োজন কিছুই বাদ গেল না। ওকে কবর দেওয়া হলো কাছারী বাড়ীর পশ্চিম সীমানায়—ডালিম বাগে।

যে সব চেয়ে বেশী খাটল, সব চেয়ে বেশী প্রবোধ দিল আসমানতারাকে

সে হচ্ছে কনিষ্ঠ প্যাদা মোবারক। বয়স তার ওর প্রায় সমান সমান, দেখতে শুনতে মন্দ না—একটু লেখাপড়াও শিখেছে। লোকে বলে ওর অবস্থাও ভাল—ও গৃহস্থও ভাল। সংসারে ওর মা ছাড়া কেউ নেই—কিন্তু হাল লাঙল গরু বাছুর সবই আছে।

আসমানতারা ধীরে ধীরে কাজে মন দেয়। ক্রমে ওর শোক পাতলা হয়ে আসে। এক কাজ বারবার করে। কোনও দোষ ত্রুটি রাখে না। ওর সময় এতটুকুও নষ্ট হতে পারে না। ওর এ খাটুনী অনেকের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। বিপ্রপদ স্বস্তি বোধ করেন। যাক, এক ভাবে তো দিন ওর কাটছে! এ ভাবেই কাটুক যে কটাদিন কাটে। কিন্তু তারপর কি হবে? তা তিনি যখন ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে যাবেন তখন ঐ নিরাশ্রয়া মেয়েটা কার আশ্রয়ে থাকবে? কে নেবে ওর শ্লীলতা রক্ষার ভার? এ একটা গুরুতর সমস্যা। ছেলেটা বেঁচে থাকলে ওটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে তিনি রেহাই পেতেন—এখন আজীবন ওকে টানতে হবে, তার চেয়েও অসুবিধা—আগলাতে হবে চিরকাল। হীনতা এবং দীনতাই ওর সব চেয়ে বড় শত্রু। ও দুটোর সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করতে চাইবে। ওর কাছে আর বিয়ের কথাও বলা যাবে না। দাম্পত্য জীবনে ওর আর কোনও বিশ্বাস নেই। কখনও যে ফিরবে সে আশাও সুদূর পরাহত। তখন বিপ্রপদ মানুষের কথায় মাথা পেতে এখন এমন দায়ে ঠেকলেন! ..

আসমানতারার রূপ আছে, বয়সও আছে—যদি ওর ইচ্ছা থাকে, তবে বিপ্রপদ ওর একটা ভাল বিয়েও দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সে প্রস্তাব ওর কাছে কে করবে? এমন দুঃসাহস কার আছে?

তার চেয়ে এক কাজ করলে ভাল হয়। ওকে একজন বুড়োগোছের মৌলবী রেখে লেখাপড়া শেখালে মন্দ হয় না। ওরও সময় কাটবে, মনটাও স্বচ্ছ হবে দিন দিন।

বিপ্রপদ একদিন একজন মৌলভী জোগাড় করে বলেন, 'আসমান, তুমি লেখা পড়া শেখো। মুসলমানের মেয়ে পাঁচ ওক্ত (বার) নামাজ পড়ো, দিল ঠাণ্ডা হবে।'

আসমান সম্মতি জানায়।

সেই থেকে বিপ্রপদ আসমানতারার ঝাড়া পোঁছার কাজ বন্ধ করে দেন। ওকে চলতে বলেন আক্রমত। ও একাগ্র মনে মেধাবী ছাত্রীর মত লেখা পড়া করে যায়। এতটুকুও সময় নষ্ট করে না। কিন্তু একটা কাজ সে কিছুতেই ছাড়তে পারে না। কখন কোন সময় গিয়ে যেন বিপ্রপদর ঘর, জামা, জুতো সব কিছু পরিষ্কার করে আসে। বিপ্রপদ বারণ করলেও আসমান শোনে না। ও সব প্রলোভন ত্যাগ করেছে, কিন্তু এটুকু ও কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। বিপ্রপদ খুশী হন—খুশী হন এই ভেবে, মেয়ে যদি পিতার পরিচর্যা করে, করুক না—তাতে দোষের কি-ই বা আছে!

মৌলভীটি স্বল্পভাষী ধর্মভীরু। সে সুললিত কণ্ঠে কোরাণের ব্যাখ্যা করে, আসমান কান পেতে শোনে। দু-এক সপ্তাহ সে হাঁ করে থাকে, কিছুই বুঝতে পারে না। তারপর একটু একটু করে আস্বাদ পায়, বুঝতেও পারে বেশ। ও যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করল। সেখানে সকলে শান্ত নিরীহ খোদার দিকে চেয়ে আছে। সেদিকে চেয়ে চেয়েই তাদের দিন কাটে। ও যত শোনে তত ওর মন ভরে যায়। বিপ্রপদ দিন দিন লক্ষ্য করেন, আসমানের মুখে চোখে প্রগাঢ় শান্তির ছায়া পড়ছে, ওর জীবনে আসছে নব চেতনা। ও কোন ঘৃণ্য সমাজ থেকে ক্লেদ-পংক ঠেলে যে এখানে এসেছে, তা এখন ওকে দেখলে কে বলতে পারে? ওর শিক্ষা সার্থক হচ্ছে, ওর অজু করার ভংগি, ওর নুয়ে-নুয়ে নামাজ পড়ার প্রণালী বিপ্রপদর কাছে অপূর্ব বলে মনে হয়। কি অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটল

একদিন আসমান অভিযোগ করে। অভিযোগটা গুরুতরই বটে। শুনে বিপ্রপদ রেগে আগুন। কি এত বড় দুর্নীতি প্রশ্রয় পাবে—বর্ধিত হবে তাঁর আমলে এই কাছারীতে? সামান্য একটা প্যাদার এই সাহস! সে নাকি যখন-তখন চেয়ে থাকে আসমানের দিকে কুকুরের মত? তবে আর পৃথক বন্দোবস্তে লাভ হল কি? ওঁর মেয়ের তুল্য আসমানতারা—তাকে অপমান! পর্দা আব্রু সকলি গেল বিফলে? আচ্ছা, আসুক গাঁয়ের তাগাদা থেকে ফিরে। জুতিয়ে লম্বা করে দেবেন বিপ্রপদ।

আসমান খুশী হয় সব শুনে।

নালিশটা মোবারকের বিরুদ্ধে।......

একটু বেশী রাত্রেই মোবারক কাছারীতে ফেরে।

'হুজুর ডেকেছেন তোমাকে।' সংবাদটা জানায় বংশী দারওয়ান।

মোবারক ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়। এ রকম ডাক তো কত দিন পড়ে, কিন্তু আজকের ডাক যেন স্বতন্ত্র। তবু না গিয়ে উপায় নেই।

মোবারক সেলাম দিয়ে দাঁড়াতেই বিপ্রপদ বলে ওঠেন, 'তোমার সংগে কথা আছে, দাঁড়াও—হাতের কাজ শেষ করে নি।'

এরপর ওর গলাটাই বোধ হয় কাটা যাবে, এমনি ভাবে ও তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

বিপ্রপদর হাতের কাজ সারা হতে বেশীক্ষণ লাগে না। তিনি ভেবে দেখেছেন, রাগের মাথায় বেশী চেঁচামেচি করে লাভ নেই, তাতে আসমানতারারই দুর্নাম হবে। মোবারককে কেউ দোষী বলবে না। স্ত্রীলোকটাই নষ্ট, এই কথাই সকলে বিশ্বাস করবে—এতদিনের চেষ্টা যত্ন সব হবে বৃথা।

মোবারক মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিপ্রপদ ওকে ধীরে ধীরে উপদেশের ছলে তিরস্কার করে যান। বুঝিয়ে দেন যে, এ সব অত্যন্ত গর্হিত। তারপর মোলায়েম করে সামান্য একটা প্যাদার কাছে বলেন, 'তোমারও তো মা-বোন আছে মোবারক, তাদের সংগে যেমন করে বাস

করো, তেমনি ভাবে এখানেও তোমার চলা উচিত। তুমি যদি নিজে না বোঝ, অন্যে কি পারবে তোমাকে বোঝাতে! এই যে মেয়েটা এখানে রয়েছে, এর ভাল মন্দের জন্য তোমরা কেউ এতটুকুও দায়ী নও, শুধু আমারই দায়িত্ব—যদি এই কথাই মনে মনে ভেবে থাকো তা হলে আমার আর কিছু বলার নেই। তোমার উঠতি বয়স, একটু লেখা পড়া জানো, বেশ চালাক চতুরও আছ—চাকুরীতে উন্নতির খুবই আশা তোমার রয়েছে, একটা বদ্-খেয়ালে তা কি তোমার নষ্ট করা ভাল? লোকে বলবে কি?'

'হুজুর, আমাকে আর বলবেন না—এ যাত্রা মাপ করুন, আপনি বাপ সমতুল্য।' মোবারকের কণ্ঠ অনুশোচনায় রুদ্ধ হয়ে আসে।

বিপ্রপদ আর কিছু বলেন না। ও ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তিনি যেন নিষ্কৃতি পান।

এরপর রীতিমত কাছারীর কাজ-কর্ম চলতে থাকে। আসমান-তারারও পড়া-শুনা চলে। কোনও গোলমাল নেই। সদরের হুকুম আসে, বিপ্রপদ তা তামিল করেন। মফস্বলে যান, কাছারীর কাগজ পত্র দেখেন—গতানুগতিক ভাবেই সব চলতে থাকে। তবে সময় সময় আসমানের ছেলেটার কথা মনে পড়ে, বেশী করে আলোড়ন আনে যখন ডালিম বাগটার পথ দিয়ে যাতায়াত করেন বিপ্রপদ।

হঠাৎ এক দিন নাকি মফস্বল থেকে ঘুরে এসে তিনি সংবাদ পান: আসমানতারা নেই, সে নাকি মোবারকের সংগে পালিয়েছে।

'কি পালিয়েছে!' বিপ্রপদ তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু পর মুহূর্তে ভাবেন, ভালই হয়েছে। তিনি আজ সকল দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। তিনি আজ বাস্তবিকই নিশ্চিন্ত। তাই প্রাণ খুলে হেসে ওঠেন।

বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে—

আউশধান রোয়ার সময় বয়ে যায়—এখন জমি দখল না করলে এ বছর আর কোনও কাজ হবে না, জমি পতিত থাকবে। ঘন বৃষ্টি নামলে আর সেখানে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অনেক অসুবিধা হবে। জমি কিনে দখল করতে না পারলে টাকা যা যাওয়ার তা তো গেলই—মান-সম্মানও দেশে আর থাকবে না। সব চেয়ে অসুবিধা আইনের বিচারেও অনেকখানি পিছিয়ে যেতে হবে।

বিপ্রপদ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি ছুটির জন্য অনেক মিনতি করে দরখাস্ত করেন। সপ্তাহ খানেক চলে যায় কিন্তু উত্তর আসে না কিছুই। রোজ পোষ্ট-আফিসে লোক পাঠান হয়—সব সংবাদ আসে, কিন্তু ছুটির কোনও সংবাদ আসে না।

বিপ্রপদ মহা ফাঁপরে পড়েন। তিনি নিজেই সদরে ছুটে যান। বাবুরা কোথায় যেন গেছেন, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে আসবেন না। অতএব বিপ্রপদকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। বাবুদের মধ্যে বড়বাবুই কর্তা। একে একে সব বাবু আসেন, কিন্তু তাঁরা বিপ্রপদর সংগে কথাই বলেন না, যেন চেনেন না। সর্বশেষে আসেন বড়বাবু। বিপ্রপদকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি বিপ্রপদ বাবু, কি মনে করে?'

'আমাকে কিছু দিনের জন্য ছুটি দিতে হবে।'

'কত দিনের জন্য?'

'এই পাঁচ মাসের।'

'এই তো আপনি কতদিন কাটিয়ে সবে কমাস এসেছেন! এ ভাবে ছুটি নিলে আমাদের কাজ চলবে কি করে?'

'আমার তো তেমন কোনও মারাত্মক কাজ বাকী নেই, আদায়-

উসুলও খারাপ হয়নি, কোনও কিস্তিও খেলাপ যায়নি। আমি আবার সময় মত হাজির হবো। আমি—'

'তাতে কি মহাল থাকে? নায়েব-গোমস্তার ওপর ভরসা করে কি বসে থাকা যায়!'

'কিন্তু কি করব? আমি যে কতটুকু জমি কিনেছি। তা যদি দখল করতে না পারি, সব টাকাই মাটি। মরসুম যায় যায়। আমি ফিরে এসে কাছারীর সব ঠিক করে নেবো।'

'মুখে যা-ই বলুন, ক্ষতি কিছু-না-কিছু আমাদের হয়ই, তা কিন্তু আপনারা স্বীকার করতে চান না।'

'কেন, এ কথা বলছেন কেন?'

'এই দেখুন না, ঐ মৌজাটার নাম, কি নাম হে উমেশ?'

'মহারাজ চৌদ্দরসির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ হাঁা, চৌদ্দরসির কথাই বলছি—সেখানের অবস্থা কেমন হলো ম্যানেজারকে ছুটি দিয়ে। বুঝলেন, তাঁরও আপনার মত অবস্থা। ছুটি না দিয়ে আর পারা গেল না। কিন্তু শেষে ক্ষতি হলো আমাদেরই। কিছু বলার জো নেই, আপনারা পুরোন কর্মচারী।'

'তা হ'লে এখন ছুটি পাওয়া যাবে না?'

'এর চেয়ে কি না বলা ভাল?'

বিপ্রপদর মনে মনে ধিক্কার জন্মে। ইচ্ছা হয় চাকরীকে ইস্তফা দিয়ে দিতে। কিন্তু কতকটা নিজের প্রয়োজনে কতকটা বাবুদের পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণী বলে তা পারেন না। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে উঠে যান।

একটা বছরের জন্য জমি পতিত পড়ে থাকবে, এত সাধের জমিতে দেওয়া হবে না চাষ—বিপ্রপদর যেন প্রাণ ফেটে যেতে চায়। তিনি কাছারীতে ফিরে যান। নিজের ক্ষুদ্রতা ও গ্লানি নিজেকেই ধীরে ধীরে হজম করতে হয়।

কিছু দিন বাদে বাবুরা ভেবে-চিন্তে যা লিখে পাঠান তা কতকটা কশাঘাত তুল্য।

এ কশাঘাতে যে মানুষ সে ক্ষেপে দাঁড়ায়, কিন্তু বিষয় লোভী বিপ্রপদ তা পারেন না। বাবুরা ছুটি মঞ্জুর করেছেন—চিঠিও এসেছে তাঁর বাড়ী থেকে যে, এক্ষুণি বাড়ী আসা চাই, নইলে তালুকটা হাতছাড়া হবে।

মেজ ঘোষাল রমণী, বড়বাবুর বাল্য বন্ধু। বিপ্রপদর ছুটি নিয়ে যেটুকু টালবাহানা হলো তার মধ্যে যে সে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা কেউ টের পেল না। জানল শুধু রমণী আর বড়বাবু।

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি পোঁটলা পুঁটলী বেঁধে রওনা দিলেন।…

পথে কোনও স্থানে একটুও অপেক্ষা করলেন না। শুধু সময় সময় আসমানের শূন্য ঘরটার কথা মনে পড়ল—আর মনে পড়ল ডালিম বাগের কবর-স্থানের কথা। আসমান পালিয়ে গেছে, শিশুটাও তার চলে গেছে, তবুও এ দাগ কেন রেখে গেল বিপ্রপদর বুকে? কত দূরে তিনি কাছারী বাড়ীটা ফেলে এসেছেন কিন্তু স্মৃতিটা কেন চলেছে তাঁর সংগে-সংগে?

ভাদ্রের ভরা গাঙ।…

ঘোলা জল ও কালো আকাশ ঐ বাঁকের আবডালে ঘন সবুজ কনকনে গাছ-গাছালি ও লতা বেতসের বুকের তলায় গিয়ে মিশেছে। নাম-না-জানা কত যে ফুল লতিয়ে লতিয়ে গাছের বুকে ও মাথায় ফুটেছে তা দেখলে চোখ জুড়ায়! এ পার থেকে ও পারে একবার আসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে বড় বড় হরিয়াল ও টিয়ার ঝাঁক। তাদের রংও সবুজ। সবুজ, ঢেউয়ে দোলন্ত কচুরীপানাগুলো। বর্ষার শেষ সমারোহে আজ যেন সবুজ মেয়েটা অবুঝ হয়ে উলংগ করে দিয়েছে তার পূর্ণ যৌবন শক্তিগড়ের নায়ে চলা পথের দুধারে।

বাড়ী এসে বিপ্রপদ একটুও বিশ্রাম না করেই হাঁটতে হাঁটতে বাগানের দিকে যান। তাঁর প্রিয় গাছগুলো কেমন আছে—কত বড় হয়েছে—নিজের চোখে একবার না দেখে সুস্থ থাকতে পারেন না। ওরা যেন কোন মায়ায় বিপ্রপদকে আকর্ষণ করে নেয়। এই তো সুগন্ধি নেবুর চারাটি। কেমন অজস্র ফল হয়েছে। কিন্তু কি যেন একটা বুনো লতায় জড়িয়ে ধরেছে ওকে শক্ত করে। গাছটা একে ছোট এখন, তাতে ফলন্ত—যেন শ্বাসরোধ হচ্ছে। বিপ্রপদ লতাটাকে ছিঁড়ে গাছটা মুক্ত করে দেন। তিনি বাড়ী নেই, ওদের কে-ই বা দেখে কে-ই বা যত্ন করে! ঐ তো আমের কলম দুটি। বাঃ, কি সুন্দর দুটি দুটি আমও ফলেছে। ওরা ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। যেন লজ্জিতা দুটি যুবতী বান্ধবী গাছপালার আবডালে এসে থমকে রয়েছে। ওরা বিদেশী। বিদেশ থেকে এসে এখনও যেন সম্পূর্ণ পরিচিত হতে পারেনি এদেশী বন্ধু বান্ধবীর সংগে। তবু মানিয়েছে বড় সুন্দর। বিপ্রপদ ঘুরে ঘুরে সব গাছগুলো দেখেন। লতা পাতা ধরে একটু নাড়া চাড়া করেন। কত দিন তিনি এ গাছগুলো দেখেছেন তবু আজ তাঁর কাছে নতুন বলে মনে হয়—বিস্ময়ের সৃষ্টি করে পদে পদে মমতার কাজল পরিয়ে দেয় চোখে। একখানা পাতলা মেঘ নিচু দিয়ে ভেসে যায়, আসে একটা ছোট পূবালী দমকা হাওয়া, বর্ষা নামে—ভিজিয়ে দিয়ে যায় মুগ্ধ বিপ্রপদকে। দূর থেকে একটা অজানা ফুলের মৃদু সৌরভ ভিজা বাতাসে জড়িয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বিপ্রপদ আঘ্রাণ নিলেন বুক ভরে।...

অমরেশ পা টিপে-টিপে পিছন থেকে এসে বিপ্রপদর হাত ধরে মারল একটা টান। 'বাবা, মা তোমাকে ডাকছে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ?'

'দেখছি বাগানের গাছগুলো কেমন হলো।'

'তোমার যে গা হাত পায় কাদা লেগেছে। চলো, ধোবে চলো। বোশেখ-জৈষ্ঠি মাসে আমরা এবার কি কষ্টই না করেছি! কত জল ঢেলেছি ঐ গাছগুলোর গোড়ায়। জল টেনে আনতে আনতে দিদিরা এক একবার নেতিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি হাঁপাইনি একটুও। এক একদিন আমি একাই—'

'জল টেনেছ, আর কেউ আসেনি, না?'

'হ্যাঁ, বাবা, আমি একাই টেনেছি, আবার একাই সব গাছে জল ঢেলেছি।'

'দূর! অসম্ভব কথা বলতে নেই বাবা! ওকে মিথ্যা কথা বলা বলে। কখনও মিথ্যা বলা কি ভাল?'

ঘাটে এসে বিপ্রপদ পায়ের কাদা ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেন। অমরেশও পা ধুয়ে ওঠে। পুকুরটার বুক বোঝাই কালো জল টলমল করছে। তার ভিতর চারদিকে অগুণতি রাঙা ও শাদা শাপলা ফুল ফুটে রয়েছে। তারই মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় বাড়ীর হাঁসগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে একটা ডাহুক লুকাল গিয়ে ঢেঁকিতলার বনে।

নিতাই মেঠো পথে জল কাদা ভাঙতে ভাঙতে ধানের রোয়ার মাঝ দিয়ে এসে উপস্থিত হয়। সে-ও ঘাটে এসে পা ধুয়ে বিপ্রপদর পিছু নেয়।

'কেমন আছো নিতাই? ইমামই বা আছে কেমন?'

'আমাদের থাকা না থাকা দুই সমান, বাবু!'

'সে কেমন?'

'সেই বাড়ী থেকে গেলেন, বলে গেলেন—এই তো এলাম বলে, আর আমাদের কথা ভুলেই গেলেন। বোশেখ গেল,—জৈষ্ঠি গেল—বর্ষা নামল—আমি ভাবি এই তো বাবু আসেন, কিন্তু বাবুর দেখা নেই। মাঠাকরুণ বলেন, তিনি ছুটির দরখাস্ত করেছেন, তুমি ভেবো না—ঠিক সময় মত

এসে হাজির হবেন। আউশের মরসুম গেল, আমনের জো এলো, পথের দিকে চেয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি, কিন্তু কোথায় আপনি! লোকের টিটকারীতে আমার আর মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না, ইমাম তো বড় একটা এদিকে আসেই না। আমরা বিদায় নিতে এসেছি—ইমাম আর আসবে না।'

'বসো নিতাই, তামাক টামাক খাও। যখন ইচ্ছা তখনই তো যেতে পারবে, কিন্তু অনেক দিন বাদে দেখা হলো একটু কথাবার্তা বলি। তোমরা তো আর আমার মাইনের চাকর না, তোমাদের আটকায় কে? ছুটির জন্য যে আমি কত চেষ্টা করেছি তা বললে তো বিশ্বাস করবে না।' বিপ্রপদ জামা কাপড় বদলাতে বদলাতে বলেন, 'সে হদ্দ চেষ্টা; কিন্তু কিছুতেই কিছু সময় মত হলো না। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ নিতাই—অদৃষ্ট মন্দ!'

'তা না হলে একটা বছর জমিগুলো থিল যায়, চুনো পুঁটিতেও করে অপমান! দেখেনি নিতাই ইমামের থাবা, কত শক্তি এই বুনো থাবায়!' বলেই নিতাই সশব্দে একটা থাবড়া মারে মাটির ওপর।

ছেলে মেয়েরা ভয় পেয়ে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে যায়।

'দুঃখ করো না নিতাই, সবুরে মেওয়া ফলে—সবুর করে দেখো।'

'কি ভুল যেহলো বাবু, ঘোষালেরা আস্কারা পেল, একটা থন্দ মাটি হলো।'

'বিগত বিষয় নিয়ে দুঃখ করে লাভ কি? যা হওয়ার না, তা হয়নি, সে কথা আর ভেবে কাজ নেই। আসছে বছর দেখা যাবে। এ দিকের সংবাদ কি?'

'তালুকের?'

'হ্যাঁ।'

'মেহেরপুরের বাঁকে নৌকা লাগিয়ে সেন মহাশয় আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওখানে তাঁদের একটা কাছারী আছে।'

'বেশ, তা হলে আজই বিকালে চল।'

'তাই চলুন দেরী করা ভাল না। আমি সময় মত আসব। এখন তা হলে উঠি।'

'ইমাম কেমন আছে? ওর সেই ছেলেটা?'

'সব ভাল আছে। এখনও সংবাদ পায়নি, তাই আসেনি। আপনার ওপর কি আমাদের রাগ সাজে! ওরা সেন মশারই সাথে কথা চালাচ্ছে।'

'বুড়ো বলেন কি?'

'সে নিজের কানেই শুনতে পাবেন। সে কি যে সে বুড়ো!'

'কিন্তু আমরা যখন যাবো তখন যদি ঘোষালেরা টের পায়? চুপে-চাপে কি কাজ করা ভাল নয়?'

'এ সব গোপনে হলেই ভাল হয়—শত্তুরের তো অভাব নেই—কিন্তু ধড়িবাজ বুড়ো নিজেই ঢাক বাজাচ্ছেন, আপনি আর চুপ করে করবেন কি?'

'তবে চল বিকাল বেলা, ইমামদের সংবাদ দিও।'

'আচ্ছা বাবু।'

১৮

আহার করতে বসে বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'দীনুদার খবর কি? তিনি তো এদিকে এলেন না। আর আমিও তো তাঁকে সংবাদ দিতে সময় পাইনি।'

কমলকামিনী বলেন, 'সংবাদ দেবে কি তিনি এদিকে আজকাল বড় একটা আসেন না। বাড়ীতে না কি একখানা দোকান দিয়েছেন—হরদম গ্রাহক-পত্তর—কোথাও বেড়াবার তাঁর সময় নেই।'

'ভালই তো—নিজের কাজ নিয়ে নিজে ব্যস্ত থাকেন। দোকানদারীর সুবুদ্ধি তাঁকে কে দিলে? টাকা-পয়সাই বা পেলেন কোথায়? এখন বোধ হয় সংসারে অভাব-অভিযোগটাও কম। বেশ, বেশ।'

উত্তরে কমলকামিনী হাসেন। একটা সন্দেহ হয় বিপ্রপদর, তাই খেয়ে উঠে তিনি একখানা লাঠি হাতে দীনুর বাড়ীর দিকে রওনা দেন।

বারান্দায় তিন চার জন গ্রাহক বসে। দীনু তামাক টানছে—গ্রাহক কটি প্রসাদের আশায় অধীর হয়ে আছে। ঝুরঝুরিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। উঠানটায় কাদা হয়েছে খুবই। দীনু সুপারি গাছ অর্ধেক করে চিরে পাশাপাশি রেল লাইনের মত পেতে দিয়েছে। বাড়ীর প্রয়োজনীয় জায়গাগুলিতে যেতে আর কাদা মাড়াতে হয় না। পুকুরঘাট থেকে পা ধুয়ে সরাসরি বিপ্রপদ বারান্দায় গিয়ে ওঠেন। 'দীনুদা, প্রণাম। আজ এসেছি। আপনি নাকি দোকান নিয়ে খুবই ব্যস্ত, তাই নিজেই এলাম দেখা করতে। দোকান কোথায়?'

'ভাল, ভাল। সুখে থাকো। দোকান করি আর যা-ই করি তুমি এসেছ শুনলে আমি একবার অবশ্য যেতাম, তোমার কি এতদূর আসতে হত। পথ ঘাট এঁটেল মাটি গলে যে পিছল হয়েছে!'

'দোকান কোথায়, দীনুদা?'

'বাইরে সাজিয়ে রাখার জো আছে? সব শালা চোর, ছেলে বুড়ো সব শালা। তাই তো দোকান মাচায় তুলে রেখেছি। দেখবে তুমি আমার দোকান? সব আছে। জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সব—তেল, নুন, চাল, ডাল, বেনেতি, মনোহারী সব আছে। দেখবে, দাঁড়াও, সব নিয়ে আসছি।'

বিপ্রপদ বুঝতেই পারেন না যে এত বড় একখানা দোকান যদিও মাচায় তোলা থাকে তবু এত সহজে কি করে নামিয়ে আনা যায়!

'ধরো, ধরো—এই ধরো !' বলে দীনু অতি কষ্টে মাচার দুয়ার থেকে একখানা ডালা নামিয়ে এনে বিপ্রপদর সুমুখে রাখে। 'এই দেখ।'

দেখার সামগ্রীই বটে ! হরেক রকম চিজ—না আছে এমন বস্তু নেই ! এমন নির্বাচন, এমন সংরক্ষণ শুধু দীনুর মত ব্যবসায়ীর পক্ষেই সম্ভব !

গাব ও কুঁড়ো দিয়ে ডালাখানা বেশ পরিপাটি করে লেপা। পিঁপড়েটির পর্যন্ত প্রবেশ নিষেধ। তামাক একপো, চিটাগুড় সেই পরিমাণ, ডাল আধ সের, তেল, নুন, লঙ্কা, হলুদ ইত্যাদি এক সের—বাকীটা চাল। এই গেল মুদি মাল—এতেই যা ওজন। বেনেতি, পোঁটলায় পোঁটলায় কবিরাজী অষুধের মত মোড়ক করা—মায় খাই সোডা পর্যন্ত। তারপর মনোহারী—দুটি সুঁই, দুটো 'আলেকজান' সুতোর গুলি, দু'খানা ছোট্ট সাবান, মূল্য এক আনা। হোমিওপ্যাথিকের শিশির মত একটা শিশিতে কি যেন লাল রং, তাই নাকি তরল আলতা—আরো কত কি ! মোট জমা পাঁচ টাকা কয়েক আনা। একটা হিসাবের খাতাও দেখায় দীনু। লেখা আছে অদ্য পর্যন্ত পঁচিশ টাকা বিক্রি হয়েছে, মূলধন ঠিকই আছে। তবু দীনুর সে কি চিন্তা ! প্রায় সওয়া পাঁচ আনা বাকী পড়েছে। তবে চিটেগুড়টায়ই খুব আয় দেখাচ্ছে, কারণ বলা উচিত না—বর্ষাকালে যথেষ্ট কাদা ভেজাল দেওয়া চলে। নুন, সোডা [illegible] জলো হাওয়ায় ওজনে বাড়ে, বেচে বেচে ফুরায় না। এ সব বিপ্রপদর কানে সগর্বে দীনু বলে যায়, কিন্তু প্রকাশ্যে গ্রাহক সমাজে বলে যে বিলেত বাকীর জন্য তার দোকান আর কিছুতেই চলবে না। এ দুনিয়ার যত লোক বাকী খেয়ে কেবল দীনুকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে কি তাদের ভাল হবে ?

'ঠাকুরদা, এক পয়সার লঙ্কা দেবেন ? ভাল লঙ্কা আছে ?'

'থাক্‌বে না কেন—পয়সা ?'

'দেখি কেমন লঙ্কা ?'

'দেখি কেমন পয়সা ?'

'ঠাকুরভাই একেবারে নগদ-ছগদ—ভাল জিনিস চাই।'

'জিনিস বাপু খুবই ভাল, কিন্তু পয়সাটা কোথায় ?'

'ওজন করুন না, এই তো।'

'হাতে দাও, ঘষা না ভাল, দেখে নি, তার পর তো জিনিস ?'

'সওদা আগে, না পয়সা আগে ?'

'পয়সা আগে, বাবা, পয়সা আগে। কথায় বলে, ফেল কড়ি মাখ তেল। কড়ি আগে না তেল আগে ? তুমি তো কচি খোকাটি নও যে কিছু বোঝ না!'

'পয়সাটা কাল সুপারি বেচে হাটের পর দিয়ে যাবো—এটুকু বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে ?'

'তুমি কি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির না কি হে ? আমিও যে কাল তোমাকে লঙ্কা মেপে দেবো এটুকু বিশ্বাস হচ্ছে না কেন ?'

'দিন দিন—এই যে পয়সাটা।' বলে লোকটি দীনুর হাতে পয়সাটি দিয়ে নিজের মনে মনে বলতে থাকে, 'ভেবেছিলাম এই পয়সাটার পান নেবো, ধোপা বৌ যে মুখরা—তা আর হলো না। ঠাকুরভাই একেবারে নাছোড়বান্দা! এত শক্ত হলে কি মুদী কারবার পাড়াগাঁয়ে চলে ?'

এ সব কথা দীনু শুনেও শোনে না। সে পয়সাটা ভাল করে দেখে-শুনে একটা তৈলাক্ত থলিতে ভরে রেখে লঙ্কা মেপে দেয়। গোটা আষ্টেক লঙ্কা তাও গ্রাহকটি দু তিন বার অদল বদল করে একটা-আধটা মাপে বেশী নিতে চায়। সামান্য বচসাও হয়, অবশেষে সে তা নিয়ে চলে যায়। বোঝা যায়, নগদ পয়সা দিয়ে এমন ছাতকুঁড়ো-পড়া মাল সে নিতান্ত ঠেকেই নিয়ে গেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, 'ঠাকুরদা, আমি যে বসে রইলাম।'

'কেন বসে আছ বাছাধন ?'

'ছেলের কাছে এক ছটাক ডাল মেপে দিয়েছেন, তা তো ওজনে কম !'

দীনু রেগে ওঠে। 'তবে কি আমি চোর ? বামুনের ছেলেকে চোর বললে তোমার চোদ্দ পুরুষ নরকে যাবে। আমি ত্রিসন্ধ্যে যে হাত দিয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করি সেই হাতে মেপে দেবো কম ? বলুক দেখি এরা কে বলতে পারে আমায় চোর ?'

দীনু গলার জোরে জিতে গেল, কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না।

'তবে ডাল হলো কি ঠাকুরদা ? এ তো নুন নয় যে জল হয়ে যাবে।' গ্রাহকটিও সহজে ছাড়বার লোক নয়। সে-ও ঘেংটি দিয়ে বসে থাকে !

'ভূতে খেয়েছে আর হবে কি ? দেখি তোমার ডাল, দাও তো পাল্লার ওপর।'

লোকটি গামছার এক কোণা খুলে ডালগুলো ঢেলে দেয়।

দীনু সুকৌশলে পাল্লা ধরে। বাস্তবিক ডাল মাপে কম হলেও পাল্লা সরল রেখায় দুলতে দুলতে এমন স্থানে স্থির হয় যে মাপটা সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়।

'দেখ, দেখ ভোমরা—আমি না কি মাপে কম দিয়েছি ? ব্যাটা বেয়াক্কেলে ছোটলোক কোথাকার !'

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, তবু বলে, 'হাটের মাপে আর এ-মাপে যেন কেমন কম-বেশী আছে। আমরা সওদা করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলাম !'

'দেখছ, দেখছ—তবু ওর গড়গড়ানি দেখছ ? তবু সন্দেহ ! তুই জাহান্নামে যাবি।'

লোকটা আর কিছু না বলে ডালগুলো গামছায় বেঁধে উঠে যায়।

যারা বোঝে, তারা অন্তরে অন্তরে শিউরে ওঠে, আর যারা না বোঝে, তারা দীনুর ন্যায্য মানদণ্ডের দিকে চেয়ে ভক্তিতে মাথা হেঁট করে।

বিপ্রপদ মনে মনে ধন্যবাদ দেয় দীনুকে, 'বাহাদুর বটে !'

যারা এসেছিল, তারা ক্রমে ক্রমে বিদায় হয়। দীনু অতি জীর্ণ বাটখারাগুলো দু-এক বার নেড়ে-চেড়ে উঠিয়ে রাখে। ডালাটা সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ করে বাঁধে। মাচার দুয়ারে তুলে রাখে। তারপর বিপ্রপদর কাছে এসে বসে। 'খবর কি ভায়া ?'

'বৈকালে আপনাকে যেতে হবে আমার সংগে।'

'কোথায় ?'

'সেনেদের কোষ নৌকায়।'

'নিশ্চয় যাবো, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। ঘোষালেরা আমায় খবর দিয়েছিল কিন্তু আমি যাইনি ওদের সংগে।'

'কেন যেতে হবে বুঝেছেন বোধ হয় ?'

'হুঁ, সে আর বুঝিনি ! শত হলেও তুমি আমার প্রতিবেশী স্বজাতি। তোমার তুল্য আমার আর কে আছে বিপ্রপদ ? আমার ভাই নেই, বন্ধু নেই, রোগে শোকে, আপদে বিপদে, উত্থানে পতনে তুমিই আমার ভাই —তুমিই আমার বন্ধু। দীনুর ভাষা গদগদ হয়ে আসে—চোখেও যেন জল দেখা যায়।

বিপ্রপদ মোহাবিষ্টের মত চেয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে বলেন, 'তবে চলুন দীনুদা—আজ আপনার অগ্নি-পরীক্ষা হবে সেনেদের কোষ নৌকায়।'

'আমি একনিষ্ঠ—নিশ্চয় উত্তীর্ণ হবো এ পরীক্ষায়।'

'তাই তো আমি চাই। দীনুদা, তাই তো চাই।'

আজ যা হোক একটা কিছু হয়ে যাবে। তাই যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছে।

মেহেরপুরের বাঁকে একখানা প্রকাণ্ড কোষ নৌকা নোঙর করা রয়েছে। সাত সাতজন মাল্লা, কোনও কাজ নেই, বসে বসে ঝিমোচ্ছে। আজ যাই কাল যাই করে প্রায় দুসপ্তাহ কেটে গেল, তবু বনিবনাত হয় না —খরিদ্দার মেলে না, যাওয়াও হয় না। সেন মশাই মহা বিরক্ত হয়ে গেছেন। আজ যা হোক একটা কাতার-কিনারা করতেই হবে। খাজনা থেকে বাজনা এবার বেশী হয়ে গেল। তালুক বেচে যে টাকা পাবেন তা যদি মাঝি-মাল্লার জাঁক-জমকে খরচ হয়ে যায় তবে আর লাভ রইল কি! বড়লোকের বড় ঠসক! তিনি মরে গেলেও কি কোষ নৌকা, প্যাদা, সিপাই না নিয়ে এ মহালে আসতে পারেন! তাঁদের পূর্বপুরুষও কি কেউ বিনা জাঁক জমকে এখানে এসেছেন!

এক কালে এদিকের সমস্ত চক্‌গুলিই তাঁদের ছিল। যেখানে নৌকা ভিড়েছে সেখানেই সহস্র হাতের সেলাম পেয়েছেন। কত ভেট নজর খাসি পাঁঠা মদ ঘি মশল্লা যে প্রজারা নিয়ে এসেছে তার কথা ভাবলে আজ স্বপ্ন বলে মনে হয়ে। যখন সমস্ত সরিকের তিনিই কমন ম্যানেজার ছিলেন, তখন তাঁর পূর্ণ যৌবন। তিনি অসংযম ও ব্যভিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন এ মুলুকে। এখনও তাঁর নাম শুনলে লোকে শিউরে উঠে। নিঁখুত মেয়েমানুষ ব্যতীত তিনি ভুলে কারুর কোন আর্জি মঞ্জুর করেছেন বলে তাঁর মনে নেই! দিনের মধ্যে তিনি তিন-তিনটা মেয়েমানুষও অদল-বদল করে চেখে দেখেছেন। ছেনে নিংড়ে ভোগ করে দেখেছেন নারী-দেহ! তিনি ছিলেন এ দেশের জমিদার—মূর্তিমন্ত অভিশাপ! মদে-মাগীতে চুর।

তাঁর পেশা ছিল দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রজা-শাসন এবং হীনবীর্য সরিক-লুণ্ঠন। হঠাৎ একটা মেয়েমানুষ খুন হয়—প্রতিবাদ করতে এসে গুম হয় তার পিতা। ভাইটা লাথি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে নদীর জলে। একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় ডাকিনী ডাকায়। মেয়েটা মুসলমানের হলেও হিন্দুরা সমবেত হয়। আসে পুলিশ—জোর দেয় মরা সরিকেরা। মামলা চলে—ঘোর মামলা! তিনি অতি কষ্টে বাঙালী পুলিশ সাহেবকে বাধ্য করেন ইংরেজ রাজার লক্ষ্মী ছাপওয়ালা টাকার বকলোশ পরিয়ে। সাহেবটি প্রজা ও মনিবের মধ্যে পড়ে একটা নিরপেক্ষতার ভাণ করে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দেন সেন মশাইকে! প্রাণে বাঁচলেও তাঁকে যে কস্তুরীভৈরব করতে হয়েছিল তার ঠেলায় এ গেরদের জমিদারী গেল পাঁচ আইনে নিলাম হয়ে। দু একটা তালুক মুলুকও যায় সেই ধাক্কায়। প্রজারা তাঁকে এখনও মহারাজ বলেই ডাকে!

কিন্তু তাঁর হাসি পায়। তিনি কি সেনবংশীয় শেষ রাজাধিরাজ? রাজ্য গেছে কিন্তু খেতাবীটা এখনও দাঁত বের করে হাসছে। মেয়েটার নাম ছিল মরিয়ম। মরিয়ম মরেছে, কিন্তু মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেছে ডাকিনী ডাকার বর্বর উদ্ধত অত্যাচারের।

সন্ধ্যা অতীত। কোষ নৌকার বড় কামরায় একটা ডে-লাইট জ্বলছে। মাঝখানে একটা ছোট টেবিল—তার দুপাশে দুখানা চেয়ার, সুমুখে একটা বেঞ্চ—বেঞ্চটার ঠিক বিপরীত দিকে একখানা আরাম-কেদারায় স্বয়ং সেন মশাই উপবিষ্ট। তিনি অম্বুরী তামাক টানছেন। সুগন্ধে কামরাটা ভরে গেছে। কামরাটার গায় বড় বড় ফ্রেমে আঁটা অনেকগুলি বিলাতি ছবি। তার মধ্যে অর্ধনগ্ন নারী, উলংগ নর্তকীর মূর্তিই বেশী। সেগুলির অযত্নে রং নষ্ট হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। সব চেয়ে যেখানা সুন্দরী রমণীর চিত্র, সেখানাই বড় বেমানান দেখাচ্ছে—

বুড়ো সেন মশাইর মত অনেক কিছুই গেছে যেন গড়িয়ে তার দেহের ওপর দিয়ে, তবু কাল তাকে ক্ষমা করেনি। তার অব্যর্থ সন্ধানে রমণী নেত্রহীনা।

এগুলি সেন মশাই ও তাঁর স্বনামধন্য পূর্বপুরুষদের মার্জিত রুচির পরিচায়ক। যৌবনের প্রমোদ-তরী, অদৃষ্টের পরিহাসে আজ বার্ধক্যের বিক্রয়-বিপণীতে পরিণত হয়েছে।

ঘোষালেরা তিন ভাই, এন্তেজদ্দিরা পিতা পুত্রে এবং সদল বলে বিপ্রপদ এসেছেন। দীনুও এসেছে। কিন্তু সে একটু দূরে সরে বসেছে—ঠিক কোন দলের বোঝা যায় না। সে একটু একটু হাসছে। এ হাসির অর্থ যে তার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ বাঘে মোষে লড়াই বেধেছে!

বিপ্রপদ ভাবছেন: দীনুদা তাঁর স্বপক্ষে থেকে বিপক্ষকে কটাক্ষ করছে—আর ঘোষালেরা ভাবছে ঠিক তার উল্টো। এন্তেজদ্দি ভাবছে যে তার কাছ থেকে যে টাকা পাঁচটা কর্জ নিয়ে দীনু মুদী দোকান ফেঁদেছে, এ হাসি সেই টাকারই সুদের হাসি। রুপোর মতই শাণিত কিন্তু বক্র তার অর্থ।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তামাক টেনে টেনে সেন মশাই বলেন, 'কত কথাই তো হলো—কিন্তু কেউ তো টাকার কথা বলছেন না? লজ্জা করলে যে যার আমাকে গোপনেও বলতে পারেন। আমি কাউরটা কাউকে বলব না।'

ঘোষালেরা যেখানে বসেছে ঠিক তার পাশেই একটা কামরা—একটা পর্দার অন্তরালে একটি মহিলা উপবিষ্টা। সে খোপেও একটা বাতি জ্বলছে। বাতির আলো উজ্জ্বল, ততোধিক উজ্জ্বল তাঁর তপ্ত গৌর কান্তি। মুখে একটা অনমনীয় দৃঢ়তা। তিনি দুটি সরিকের অভিভাবিকা। বললেন, 'আপনি একটা দর চাইলে তো খরিদ্দারেরা যা-হক একটা কিছু বলবেন। না আপনি তা আমার সুমুখে খোলসা করতে চাইছেন না? তাই গোপন এবং গড়িমসি?'

'সেকি, সেকি কথা বৌঠান—এ সব বলছেন কি! আমি কি নাবালক ভাইদের ঠকাব নাকি? আমার টাকা কে খাবে? ওরা ছাড়া আমার কে আছে?'

'থাকা না থাকার কথা হচ্ছে না—এখন একটা টাকার অংক বলুন, আমিও শুনি, যাঁরা এসেছেন তারাও জানুন, তা না হলে মাথা মুণ্ডু কি বলবে।'

দীনু বলে, 'মহারাজের খেঁই ধরিয়ে দেওয়া উচিত, নইলে বোঝা-বুঝি হবে কি নিয়ে?'

দাড়িতে হাত বুলিয়ে এস্তেজদ্দি একটু হাসে।

দীনু আবার বলে, 'এঁরা সব তীরন্দাজ—লক্ষ্যটা তো এঁদের সুমুখে উপস্থিত করবেন! মহারাজ, রাজধর্মে ভুল করছেন কেন? এ-ও তো একটা স্বয়ম্বর সভা।' দীনু হাসে।

সেন মশাই নীরবে সে হাসির অর্থ গ্রহণ করেন।

'তালুকটা একটা জমিদারীর সামিল—এর দাম কম পক্ষে বার হাজার টাকা। সেই বার হাজার টাকা না পেলে আমাদের বিক্রি করায় কোন লাভই থাকে না। ওর কমে আমরা হস্তান্তর করবও না।'

এস্তেজদ্দি কঞ্জুষ প্রকৃতির লোক। দামটা শুনে বলে ওঠে, 'ছোবান আল্লা,—আমার গো কম্ম না তালুক কেনা।' সে তৈল সিক্ত টুপীটা খুলে ফুঁ দিয়ে আবার মাথায় পরে।

ব্যস্ত হয়ে দীনু বলে, 'কেন, কেন বার হাজার চাইলেই কি বার হাজার দিতে হবে? চাওয়া আর দেওয়া এক কথা নয় তালুকদার সাহেব। অস্থির হয়ে কি সওদা করা যায়?'

ঘোষালেরা বার হাজার তো দূরের কথা বার আনায় পেলেও আর এজমালীতে কোনও সম্পত্তি খরিদ করবে না। তারা খরিদ্দারের ছদ্মবেশে এসেছে বিপ্রপদর ক্রয়ে বিঘ্ন জন্মাতে। এস্তেজদ্দি বাস্তবিক বিপ্রপদর

প্রতিযোগী। সে উঠে যায় দেখে, তারা তিন ভাই ধরে বসায়। অবশ্য এর মধ্যে দীনুরও ইসারা আছে।

দীনু বলে, 'মহারাজ, আপনি যদি নামমাত্র মূল্যে বিপ্রপদকে দিয়ে যান, তবে ভায়া রাখতে পারে। না হলে, ওর পক্ষে অসম্ভব। কারণ এর পরেও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় আছে হাতী পুষতে।'

দ্বিতীয় কামরা থেকে তীব্র স্বরে মন্তব্য হয়, 'তার চেয়ে দান করাই ভাল। হাতী দান ঘোড়া দান তো রীতিই রয়েছে হিন্দুদের।'

'বিপ্রপদ যে কায়স্থ, মহারাণীর দান গ্রহণ করবে কে?'

'তবে ঘোষালদের জিজ্ঞাসা করুন—তাঁরা তো ব্রাহ্মণ। লাখ টাকারও ব্রাহ্মণ নাকি ভিখারী।'

'বৌঠান, এ সব ব্যংগে লাভ কি! সকলে শুনুন—আমি যা চাই না কেন, আপনারা কি দিতে পারবেন একে একে বলুন, বিপ্রপদবাবু?'

বিপ্রপদর হয়ে ইছমাইল মিঞা বলে, 'পাঁচ হাজার।'

এন্তেজদ্দির জিদ হয়, সে দাঁড়িয়ে বলে, ছ হাজার।'

ইছমাইল মিঞা বলে, 'সাড়ে ছ হাজার বাবু দেবেন গুইণ্যা।'

এন্তেজদ্দির ছেলেটা রুখে উঠে বলে, 'সাত হাজার দেবে বাজান সুপারি বেইচ্যা।'

ইছমাইল মিঞা জবাবে ডাক আরও চড়ায়। 'জেদের ভাত কুত্তায় খায়—দিমু সাড়ে সাত হাজার, দিমু আষ্ট হাজার, দেহি কেডা রাখতে পারে। আমরা কি মরইয়া গেছি নাকি?'

এন্তেজদ্দি চুপ করে থাকে। তার ছেলেই সকলকে স্তম্ভিত করে বলে, 'দিমু দশ হাজার, দিমু পোনর হাজার—যা লাগে হাতা-খাতা বেইচ্যা দিমু। হইছে কি? কেনতে আইছি, কিইন্যা যামু।'

ঘোষালেরা হাসতে থাকে। দীনুও পা নাচাতে নাচাতে মুখ টিপে হাসে। বিপ্রপদ হাসেনও না, কিছু বলেনও না। তাঁর বুকটা ঢিব-ঢিব করছে।

সেন মশাই একটু স্মিতমুখে বলেন, 'আহা, উত্তেজিত হয়ে লাভ কি? সেই বার হাজার দিতে রাজী আছ এন্তেজদ্দি? চৌদ্দ পনর হাজার বাত্‌কে বাত্‌ কথা।'

ঘোষালেরা বলে, 'রাজী আবার না? নিশ্চয় রাজী আছে।'

'তা হলে এখনই বায়না-পত্তর করো। কি ঘোষাল মশাইরা, আপনাদের কি কোনও আপত্তি আছে? বিপ্রপদবাবু আপনার?'

ঘোষালেরা প্রায় সমস্বরে বলে ওঠে, 'না না, কিছু না। এন্তেজদ্দি রাখাও যা আমরা রাখাও তাই। ও বুদ্ধিমান, পয়সাওয়ালা বন্ধু লোক, ওর সংগে যাবো একটা সামান্য তালুক নিয়ে ডাকাডাকি করতে। আমাদের তো কত রয়েছে, ওর সখ হয়েছে, ও রাখুক। এখন চলি—সেন মশাই নমস্কার। নমস্কার বিপ্রপদবাবু।'

টাকার অংক শুনে বিপ্রপদ নীরব—এবং তার পক্ষের লোকজনও।

রাগে দুঃখে ইমাম দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে। টাকার কাজ তো মুখের কথায় সারে না।

দীনু বিপ্রপদর কানে কানে বলে, 'ভালই হয়েছে। মূর্খের মত অর্থব্যয় করায় কোনই পৌরুষ নেই। এমন দিন আসবে যে এন্তেজদ্দি সেধে তোমায় তালুক দেবে। ওটার কাজ কি তালুক রক্ষা করা? গো-মূর্খ, তা না হলে বার হাজার টাকা দিয়ে কি কেউ রাখে তিন শো টাকা মুনাফার তালুক! চলো, আমরাও এখন উঠে পড়ি। রাত কম হয়নি। ঐ ঘোষালেরা তাদের নৌকা ছাড়ল।'

ব্যংগহাস্য-মুখরিত একখানা নৌকা কোষনৌকার জানালার কাছ দিয়ে ভেসে যায়।

দীনু অস্থির হয়ে ওঠে, এখনও সন্ধ্যাহ্নিক বাকী।

বিপ্রপদ বিমর্ষ মুখে বসে থাকেন।

ইমাম আর সহ্য করতে পারে না। সে বলে ওঠে—'দিমু সেই বার

হাজার—দিমু আমার সব জমি-খ্যাত বেইচ্যা [illegible] টাকা। এখনও কি চাবে না মহারাজ পুরান পেরজার দিকে? [illegible] ছাওয়াল কি বাপের কাছে বেইচ্যা খাবে? পরকালের ডর নাই এব[illegible]’

কিন্তু ইহকালের, বিশেষত বর্তমান কালের হিসেবে [illegible] মশাই চোখের জলে ভোলেন না। তিনি এ সব অনেক দেখেছেন—তাই ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়ে থাকেন।

কিন্তু নৌকার মধ্যে এক জন অশ্রুমুখী হয়ে ওঠেন। তিনি দুরু-দুরু বক্ষে অপেক্ষা করতে থাকেন।

এন্তেজদ্দির ছেলেটা ক্ষেপে ওঠে,—‘আর এক হাজার বেশী দিলে হইবে কি? আমরা পুরান পেরজাও না, রাইওৎও না, আমরা দিমু আক্কেল-সেলামী।’

বিপ্রপদ উঠে পড়েন, আর না যথেষ্ট হয়েছে। লোভ এবং লাভ এদের মানুষের গণ্ডী থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে গেছে। ‘চলো ইমাম, আমরা যাই, ভাগ্যে থাকলে যথেষ্ট সম্পত্তি হবে। নমস্কার সেন মশাই, নমস্কার।’

বুড়ো সেন মশাই সেদিকে ফিরেও তাকান না। এন্তেজদ্দির ছেলেকে লক্ষ্য করে বলেন, ‘দাও বায়নার টাকা—এক্ষুনি লেখা-পড়া হক। নায়েব, নায়েব।’

‘এই যে মহারাজ, হাজির।’ বলে, বৃদ্ধ নায়েব বিড়ালের মত এগিয়ে আসে। এটি তাঁর যৌবনের সহচর। অনেক প্রসাদীকৃত মদ ও মেয়ে-মানুষ এটি ভক্তিভরে উচ্ছিষ্ট পাত্র থেকে এককালে গ্রহণ করেছে। তাই সব কর্মচারী একে একে বিদায় হলেও নায়েব কৃতজ্ঞতা পাশ ছিন্ন করতে পারেনি। কত কটু ভাষা, বল-প্রয়োগ, ঘাড়-ধাক্কা সয়ে যে এবেচারা টিঁকে আছে! বেতন পায় না তবু ব্যভিচারের সংগী, মনিব-চাকরের অংগাংগী সম্বন্ধটুকুর নেশা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এ নেশা এমন চিত্তহারী ওর জীবনে কোনও দিনই কাটবে না সন্দেহ।

এতগুলো টাকার কথা শুনেও নায়েব ব্যস্ত হয় না। এমন কত বার-তের হাজারের যে বায়না-পত্র সে লিখেছে তার কাগজপত্র অদ্যাবধি তার জিম্মায় আছে! অনেক হিসাব তার মুখস্থও রয়েছে। জমিদারী গেল পাঁচ আইনে নিলাম হয়ে, তারপর কত যে তালুক বেচা হলো, খাসের জমি পত্তন দেওয়া হলো, কিছুতেই খরচ আর পোষায় না! হিসাব হয় প্রতি-বারই কিন্তু খরচ হয় হিসাবের বাইরে। আয় করে খাওয়ার প্রশস্ত পথ ছিল জমিদারী, সেটা গিয়ে আসল ভেঙে খাওয়া সুরু হয়েছে। বয়স ও অবস্থার ভাঁটার সংগে সংগে মেয়েমানুষ অবশ্য ভাঁটিয়ে তলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রিয়পাত্রের কাছে সহস্র গেলাসের অজস্র বুদবুদের রঙিন স্বপ্নের মত এমন ভাবে লগ্নি করে রেখে গেছে যে সে নাগপাশ সেন মশাই এখনও এড়াতে পারেননি। সমস্ত বেচে কিনেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে একফোঁটা মুখে দিয়ে মরতে হবে! নায়েব তা জানে, তাই ভাবে এ বার হাজার কিম্বা তের হাজারের ভাগের ভাগে আর কদিন চলবে! এবার করবেন কি! দামী এবং বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি তো এইটাই শেষ।

নায়েব বিষণ্ণ মুখে বলে, 'কই, টাকা দাও।'

এন্তেজদ্দির ছেলে বলে, 'বা-জান, এখন টাকা দেও—বায়না করো।'

এন্তেজদ্দি এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিল, সে বলে উঠল, 'পাঠাডা, টাকা দিবি তুই। তুই না কইছ, বার হাজার না তের হাজার। আমার কাছে কিছু জিগাইয়া কইছ? আমি ঠেকছি কি যে টাকা দিমু? তুই আমার এষ্টাড রাখতে পারবি না। তুই আমার পোলা তো না, একটা পাঠা—ছাল ছাড়াইন্যা পাঠা; তুই এখানে থাক, আমি যাই।' সে রাগে গরগর করতে করতে কোষ নৌকা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ছেলেটাও অপ্রতিভ হয়ে পিছু নেয়। ক্রুদ্ধ পিতাকে প্রবোধ দেয়, 'রাগ হইও না বা-জান, আমি কি কিছু বুঝি নাকি? আমি যে তোমার নাবালক পোলা!'

'বাইশ বছর বয়স হইল এখনও তোর নাক দিয়া দুধ গলে! খাসীডা, তোকে জবাই দিয়া বাবুরা সরইয়া গেছে। আয়, আমাগো তালুক-মুলুকে কাম নাই। আমরা দুধের ফ্যান গাইল্যা পয়সা কামাই করি, আমাগো সেই ভাল। এখন চল খাসীর পো খাসী। চল, চল।'

ওরা ডোঙায় উঠে ভাটা দেয়।

সেন মশাইর চোখের ও মুখের ওপর কে যেন কালি মেড়ে দেয়।

এবার দুর্দান্ত সেন নিরুপায় হয়ে বিপ্রপদকে অপেক্ষা করতে বলেন। 'দেখুন. আপনি ভাগ্যবান, এ তালুক আপনার কপালেই আছে। এখন দর-দস্তর আপনার কাছে। আমি জানি ওরা কেউ তালুক রাখবে না—ওদের আস্ফালন বৃথা।' বলতে বলতে সেন মশাই নিস্তেজ হয়ে পড়েন। এখন আপনার দয়া, বুঝে-সুজে যা হক আজই করে যান—আমি কাল নৌকা খুলতে চাই। বড্ড খরচ—আর সামলাতে পারিনে।'

ভাড়া করা প্যাদা সিপাই, ঠিক করা নৌকার মাঝি-মাল্লা সব অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এদের এক সপ্তাহের কথা বলে এনে প্রায় দুসপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছেন—আর একটি দিনও এরা থাকবে না। গিয়েই তো এদের বিদায় করতে হবে নগদ টাকা দিয়ে। বিক্রয়ের এরা ধার ধারে কি! একটু বেতাল হলে সব গোমর ফাঁক হয়ে যাবে! ঠসথ যাবে গুঁড়িয়ে!

ভিতর থেকে মহিলাটি বলেন, 'এবার ঠাকুরপো ঠেকে সোজা পথ ধরেছেন! টাকা-কড়ি এক দিকে, আর প্রজার মনস্তুষ্টি এক দিকে। শুনেছি, পূর্বে কর্তারা এ সব খুব বিবেচনা করেই করতেন।'

দীনু বলে, 'ঠিক বলেছেন মহারাণী! আমিও ভাবছিলাম, রাণী মা যখন উপস্থিত রয়েছেন তখন বিপ্রপদর ভাবনা কি! ওর জন্য, বিশেষত এই মুসলমান প্রজাদের জন্য তিনিই তো ঢেলে দেবেন করুণার স্নেহধারা। মা, আপনাকে প্রণাম, আপনি জগন্মাতা।'

কথাবার্তা একটা স্থির হয়—টাকার অংক কমের দিকেই যায়—

বায়না বাবদ নগদ দেওয়া হয় কিছু—সপ্তাহ মধ্যে দলিল রেজেস্ট্রী হবে। সেন মশাইর হিসাবে গরমিল বাধে—আয় করতে গিয়ে ব্যয়ের অংকটা দাঁড়ায় মোটা, তবু বিপ্রপদর প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে হয়।

ইছমাইল মিঞা, ইমাম খুবই খুশী হয়েছে। বিপ্রপদও খুশী—শুধু মুখ শুকিয়ে গেল দীনুর। এত দিন বসে যা ভেবে-চিন্তে ঘোষালদের সংগে পরামর্শ করে সাজিয়ে-গুছিয়ে এনেছিল, তা বানচাল হয়ে গেল। তা ছাড়া এন্তেজদ্দির কাছ থেকে যে পাঁচটা টাকা আনা হয়েছে তাও ফিরিয়ে দিতে হবে। তালুক যখন কিনিয়ে দিতে পারল না তখন টাকা রাখবে কি করে? এবার দোকানটিও গেল!

সপ্তাহ কাল মধ্যে দীনুর হবে সর্বনাশ, আর বিপ্রপদ হবেন গাঁয়ের ভিতর মহারাজাধিরাজ—এর চেয়ে ওর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ!

নৌকা চলে, হাসি-গল্প হয়—দীনু হিংসায় অন্তরে অন্তরে জ্বলে-পুড়ে মরে।

ঘাটে এসে নৌকা থামতেই সবাই উঠে গেল, দীনুকে কেউ ডাকল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাঝি বলে, 'ঠাহুর ভাই, ঘুম ভাঙছে? ওঠেন, সকলডি চলইয়া গেছে।'

দীনু ধড়মড় করে উঠে বসে! চোখ রগড়ায়, হাই তোলে—পরে নেমে যায় নৌকা থেকে। 'সকলে ফেলে গেল, এখন যাই কি করে—যে পিছল পথ, তাতে ঘোর অন্ধকার।'

'তাগো দোষ কি? তারা তো ভাবছে আপনে ঘুমে!'

এ যে কি ঘুম তা দীনুর বুঝতে কষ্ট হয় না। দাবানলের পর নিস্তব্ধতা।

'চলেন, আমিও বাড়ীর মধ্যে যামু।' একটা লণ্ঠন নিয়ে মাঝি নেমে আসে। চার দিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, বর্ষাকাল—জল-কাদা হাঁটু সমান। মাঝি আগে আগে যায় পথ দেখিয়ে দীনু যায় পিছে পিছে।

বোসেদের বাড়ীর ভিতর থেকে উলুধ্বনি শোনা যায়—কমলকামিনী

হয়ত বায়না-পত্রখানা বরণ করে ঘরে তুলছেন, হয়ত গ্রাম্য প্রতিবেশীদের ডেকে পান বাতাসা বিলাচ্ছেন।

দীনুর মন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে অন্ধকার অগ্রাহ্য করে, মাঝিটাকে একা ফেলে ভিন্ন পথ ধরে।

২০

কবলা রেজেষ্ট্রী হয়ে গেছে কাল—তাই একটা ছোট-খাট প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেছেন কমলকামিনী ও বিপ্রপদ। হিন্দু-মুসলমানের পৃথক্ পৃথক্ বন্দোবস্ত হয়েছে। হিন্দুরা খাবে বাড়ীর ভিতর, মুসলমানরা খাবে বাইরে রেঁধে। কমলকামিনী মেয়েদের নিয়ে তাই জোগাড় করে দিতে ব্যস্ত। ইমান না কি রান্নায় ওস্তাদ, সে নিয়েছে তাদের স্বজাতির রান্নার ভার। একটা উনুন তৈরী করে তার চারিদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে নাট মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বড় আম গাছটার তলায়। অমরেশের আজ আর আনন্দ ধরে না—সে যেন ইমামের সহকর্মী। কাউর নিষেধ সে শুনছে না—এই জল আনছে, এই পাতা কেটে দিচ্ছে, বার বার হুকুম করছে বিনুকে। ছোট কাল থেকে সে মা ও বাবার কাছে যা শিখেছে তাই শিখিয়ে দিচ্ছে বিনুকে। তা ছাড়া ইমামদের বাড়ী গেলে যা আদর যত্ন পায় তার বিনিময়ে সে আজ চুপ করে থাকবে কি করে?

বিপ্রপদ ছেলের রকম-সকম দেখে হাসেন। শ্রীমান একেবারে হাঁপিয়ে গেছে। ফুট ফুটে মুখখানা ঘেমে রাঙা হয়ে উঠেছে।

কমলকামিনী হেসে বলেন, 'ইমাম, আমার ইচ্ছা করে তোমাদের নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে, কিন্তু তোমরা তা খাবে না—খেলে দোষ কি?'

'কিছুই দোষ নেই, মাঠাইন। ভাবলে আমরা সকলডি এক। কিন্তু তোমরা যে আমাগো ঘরে ওঠতে দাওনা, আমরা কেন খামু তোমাগো হাতে?'

'তুমি ঘরে উঠলে—আমাদের ভাতের হাঁড়ি ছুঁলে কি হয়, সত্যি সত্যি আমি বুঝতে পারি নে! অথচ তুমি তো জাননা, আমার এক দূরসম্পর্কের মামা বিলাত থেকে এসে, ঘরে না কি রান্নার জন্য মুসলমান বাবুর্চি রেখেছেন। তাঁর বন্ধু বান্ধব আসছে-যাচ্ছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, তাতে তো তাঁর কিছু হয়নি। কিন্তু এদেশে কেউ শুনলে, শিউরে উঠবে—দশ হাত পিছিয়ে যাবে। আমার ছেলে আজ খাবে না আমার হাতে, উঠতে পারবে না আমার ঘরে—এ ব্যবস্থা নিতান্ত অচল।' কিন্তু তিনিই কি পারেন সচল করে নিতে? না, তা পারেন না। তাঁর সংস্কারে বাধে। কেন বাধে এর সঠিক জবাব খুঁজে পান না। নিতাই ও ইমামের ভিতর কি পার্থক্য—যখন এক জন আসবে ঘরে, ঠিক তখনই আর এক জন থাকবে নীরবে বাইরে দাঁড়িয়ে! তিনি একটা ব্যথা নিয়ে ইমামের সুমুখ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান।

কিছুক্ষণ বাদে আবার তিনি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার এখন আর কি কি লাগবে? কোন জিনিষের অভাব হলে আমাকে জানিও।'

'তা আমার আর জানান লাগবে না—দাদু-ভাইরা আমার থিক্যাও করিত-কর্মা।' বলে ইমাম একটা সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমরেশ ও বিনুর দিকে।

'অমরেশ, আজ আর তুই কিছু খেলি নে সকালে? বিনু তো খেয়ে এসেছে। আয়, চারটি গরম গরম ভাত ফুটন্ত ডাল দিয়ে খেয়ে যা। বাবা, নইলে পিত্তি পড়ে অসুখ করবে তোমার।'

'মা একটু থামো—এই কাঠগুলো সাজিয়ে রাখি।'

'কাঠ আমি সাজিয়ে রাখছি, তুই খেয়ে আয়—যা।'

'তুমি পারবে না, আবার ভিজে কাঠ রাখবে ওপরে সাজিয়ে—কত কষ্ট হবে মিঞা-ভাইর রাঁধতে।'

'ইস্, বড্ড দরদ তো দেখছি মিঞা-ভাইর জন্যে। বড় হয়ে এ দরদ থাকলে বাঁচি!'

'তখন ভুইল্যা যাবে বিদ্যাশে গিয়া। কি দাদু-ভাই, ঠিক কইছিনি?' বলে ইমাম অমরেশকে বুকের মধ্যে টেনে আনে, 'কি, ভুইল্যা যাবা নাকি?'

জবাবে অমরেশ কিছু বলে না। কিন্তু মিঞা-ভাইকে সে কিছুতেই ভুলবে না, এমনই একটা দৃঢ়তা তার মুখে চোখে ফুটে ওঠে—তা ইমাম ও কমলকামিনীর দৃষ্টি এড়ায় না।

ইমাম বলে, 'যাও এখন কিছু খাইয়া আসো দাদু-ভাই।'

'না, একটু পরে যাবো—এখন না।'

কমলকামিনী জোর করেই তাঁর আঁচল দিয়ে অমরেশের সুকুমার মুখখানি মুছিয়ে দেন। 'চল আমি ভাত মেখে দেবো—চারটি খেয়ে আসবি, এখন তো কত দেরী।'

'যাও দাদু-ভাই, যাও।'

'হ্যাঁরে অমরেশ, তুই রাঁধতে পারিস? বল্ তো মাছের ঝোল রাঁধে কি দিয়ে?'

'আমি আবার রাঁধতে জানি নে? মাছের ঝোল তো সহজ, অম্বলও রাঁধতে পারি।'

'আয়, খেতে বসে আমায় বলবি চল।'

রান্নাঘরে এসে একখানা পিঁড়ি টেনে এনে অমরেশকে বসতে দিয়ে কমলকামিনী জিজ্ঞাসা করেন, 'এখন বল।'

'শুনবে, কি করে রাঁধতে হয় অম্বল?'

এক গ্রাস ভাত ছেলের মুখে তুলে দিয়ে বলেন, 'শুনব না আবার! বলে যা।'

'আগে ধনে লঙ্কা দিয়ে তারপর দেবে তেঁতুল।'

'বেশ ঝাল-ঝাল হবে, কেমন অমরেশ?' কমলকামিনী হাসি চেপে রাখেন।

'হুঁ, বেশী না, একটু একটু ঝাল হবে।'

এমন সময় বিমলা এসে পড়ে। 'কিসে ঝাল হবে মা?'

'অমরেশের অম্বলে।'

'ও মাগো, ভাইটি আমার পাকা রাঁধুনী। অম্বলে দেবে ঝাল, আর ঝোলে দেবে তেঁতুল!'

'ওমা, আমি খাবো না ভাত—আমি তাই বলেছি নাকি? বিমলিকে চুপ করতে বলো—না হলে এই উঠলাম কিন্তু।'

'আঃ, বিমলা, চুপ কর! ও রাঁধবে আমি খাবো—তোদের মুখে লাগবে নাকি ঝাল? তোরা শুধু শুধু জ্বলে মরছিস কেন? সব রাঁধুনী কি এক রকম রাঁধে? ও যেমন রাঁধবে আমাকে তেমনি খেতে হবে।' চোখ ইশারা করে কমলকামিনী বিমলাকে শাসন করেন। ও মুখে আঁচল গোঁজে। হাসি কি থামতে চায়!

অমরেশের শেষ গ্রাসটা মুখে দেওয়া পর্যন্ত বিমলা অতিকষ্টে হাসি চেপে ছিল, এখন একেবারে হেসে উঠল খিল খিল করে! 'মা, তুমি ওকে বোকা পেয়ে ঠাট্টা করলে—ও না হয় রাঁধতে না-ই বা জানে, তবু তোমার ছেলে তো। তোমার কি ওর সংগে ঠাট্টা সাজে?'

'কি মা?' অমরেশ কমলকামিনীর মুখে চোখে একটা চাপা হাসি দেখতে পেয়ে একেবারে ক্ষেপে ওঠে। 'আমায় ঠাট্টা, খাব না, খাব না, আর কোনও দিন খাব না তোমার হাতে।'

'না, না, আমি কি তোমায় ঠাট্টা করতে পারি বাবা? বিমলা মিথ্যা বলছে!'

'তবে হাসলে কেন?'

'তা হলে কি কাঁদব?'

'না, না, আমি সব বুঝি—তুমি ঠাট্টা করছ আমাকে—আমি সব বুঝি।'

'তবে এটুকু বোঝ না কেন যে অম্বলে লঙ্কা দিতে নেই?'

অমরেশ এবার কেঁদে-কেটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘণ্টা দু-তিন বাদে দেখা যায়, সে আবার ইমামের কাছে বসে গল্প করছে। হাসছে তার কথায়।

অম্বলের ঐতিহাসিক ঘটনাটা বিপ্রপদর কানে যায়। তিনি স্নান করতে যাওয়ার সময় ছেলেকে ডেকে সংগে নিয়ে যান। তাকে বুঝিয়ে বলেন, 'আমরা বড় হয়েছি, তোমরাও বড় হবে—তখন আমরা যাবো মরে—এখন থেকে দেখে শুনে না শিখলে তখন পারবে কেন? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, যারা আসবে তাদের আদরযত্ন আপ্যায়িত করে খাওয়াতে হবে। ধূলো কাদা থাকলে তারা তোমাকে দেখে বলবে কি? বিনুটা কোথায়? তাকেও তুমি সাজিয়ে পরিয়ে আন গে? তুমি বড়বাবু, সে মেজবাবু। যাও তাড়াতাড়ি—এক্ষুনি সব এসে পড়বে।'

বড়বাবু সগর্বে মেজবাবুকে ডাকতে বাড়ীর ভিতর চলে যায়।

রান্না সংগে-সংগেই সব তুলে ফেলা হয় নাটমন্দিরের পানে। বর্ষা কাল, বৃষ্টি নামতে কতক্ষণ! ইমাম বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেই রেঁধেছে! কিন্তু লঙ্কা ও পেঁয়াজ রসুনের ভাগটা বেশী দিয়েছে নিজেদের রুচি অনুসারে। তাই সব ব্যঞ্জনই লাল টকটকে হয়েছে। পাতলা তেল ভাসছে ওপরে।

কমলকামিনী ঘর থেকে হাতে তৈরী নানাবিধ মিষ্টান্ন নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলেন। এখানে মিঠাইর দোকান নেই, তাই কদিন ঘরের কেউ বিশ্রাম করতে পারেনি।

একটু উচ্চাংগের মুসলমানী প্রথায় বিপ্রপদ প্রজাদের অভ্যর্থনা করেন

—সমাদর করে বসতে দেন নাটমন্দিরে। আহারান্তে তারা খুশী মনে পান তামাক খায়। বলে যে হিন্দুর মধ্যে এমন আদপ কায়দা খুব কম লোকেই জানে। ঘোষালেরা এ দেশের বনেদী ঘর হলেও কত যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সে কথাও এখানে ওঠে। এবং সে জন্য লজ্জা বোধ করেন বিপ্রপদ। তিনি মুসলমানদের কেন হিন্দু প্রজাদেরও সমান আদর যত্ন করেছেন। তাই সকলে একবাক্যে তাঁকে প্রশংসা করে। যাওয়ার সময় প্রজারা নজর দেয়। টাকাগুলো দেখে তাঁর মন অহংকারে ভরে ওঠে। এই তো রাজোচিত সম্মান! আজ সেনেদের বদলে এ'সব তাঁরই পাওনা। তাঁরই ন্যায্য দাবী। অমরেশ এবং বিনুও কিছু কিছু নজর পায়। তারা চকচকে টাকাগুলো নিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে যায়—সবাইকে দেখাবে।

এই খাওয়া দাওয়া মেলা মেশা নতুন একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল শক্তি-গড়ে। ইছমাইল মিঞারা যে কত সন্তুষ্ট হয়েছে তা আর বলা যায় না। কিন্তু তিক্ত হয়ে উঠল বয়োবৃদ্ধ হিংসুক প্রাচীনপন্থীর দল। তবে কেউ সাহস করে, বিপ্রপদর সুমুখে কিছু বলতে পারল না। কি জানি আবার আর্জি দায়ের করে দিতে কতক্ষণ! তাই এমন একটা মধুময় জটলার আস্বাদ আনাচে-কানাচে বসেই নিতে হয়।

২১

বাড়ীর ভিতর একটা সংবাদ গেল নাট মন্দিরে এক দল অতিথি এসেছে। তারা মেয়ে দেখবে। সংগে তাদের ঘটক মাঝি-মাল্লা চাকর-বাকর আছে। যেন ছোট-খাট সৈন্যবাহিনী একটা।

বিপ্রপদ তাদের আদর-যত্ন করেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বিকালের দিকে কথাবার্তা হবে! অবশ্য মেয়ে দেখে পছন্দ হলে দেনা পাওনার জন্যে আটকাবে না।

বাড়ীর ভিতর একটা ধুমধাম পড়ে যায়। পাড়া প্রতিবেশীরা আসে। বড়লোকের মেয়ের সম্বন্ধ, একটা দেখার জিনিষ বটে—ঘরে লোক আর ধরে না। হাসি, আনন্দ, হট্টগোলে বার-চলা ভরপুর। সে ঢেউ রান্না ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে—তারপর যায় পুকুর পাড়ে। তারপরে উঠানে ও আঙিনায়।

কমলকামিনীর অন্তর নাচতে থাকে। কখনও আশায়, কখনও আশংকায়।

বিমলাকে নিয়ে একটা মহড়া চলেছে। কি ভাবে হাঁটবে—কি ভাবে কথা বলবে—তাদের প্রশ্নেরই বা জবাব দেবে কেমন করে। এই সব নিয়ে একটা উপদেষ্টা মণ্ডলী খাড়া হয়েছে। ঠানদিদিশ্রেণীই এ মণ্ডলীর প্রতি-নিধি! তারা কেউ বা শ্লীল কেউ বা অশ্লীল বিদ্রূপ করছে কানের কাছে।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর আবার খবর এলো, যারা মেয়ে দেখতে এসেছে তারা একটি নয়—ছুটি মেয়ে চায়। এবার শ্যামলার পালা। তাকে নিয়ে পড়ে সকলে। বিমলা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণের জন্য শ্যামলা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বেচারী একে-বারে কাবু হয়ে পড়ে। মাধুরী তার সই। সে এসে সময়োপযোগী একটা মিষ্টি হাসির গান জুড়ে দিল।

এদিকে নাটমন্দিরে বসে বিপ্রপদর সংগে ছেলে পক্ষের নানাবিধ আলাপ-আলোচনা হয়। কৌলিন্যের বিকট ব্যাখ্যা করল কেউ. কেউ বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের নাড়ী ভুড়ি টেনে আনল। কেউ বা সামাজিক অনুশাসন মন্থন করে একটা অশ্বডিম্ব উদ্ধার করল। বিপ্রপদ কতক বুঝে, কতক না বুঝে, উত্তর দিলেন।

তাঁর সংগে আলাপ করে পাত্রপক্ষ বুঝল যে তিনি একজন বিশিষ্ট কুলীন এবং বিদ্বান লোক, খুব বুদ্ধিমানও বটে। কারণ তাঁর নাম আছে, আর আছে নাম রক্ষা করার মত পয়সা। বরপক্ষ দেনা পাওনার ভারটাও

তাঁর ওপরই ন্যস্ত করে। এ-সব স্থানে এমনি ঠেকিয়ে দিলেই লাভ হয় বেশী।

মেয়ে দুটি আসতেই ঘটক মশাই যাতে তাদের কোনও দোষ-ত্রুটি না ধরা পড়ে এমনি ভাবেই কথাবার্তা বলতে থাকে। 'এসো মা, এসো মা, এঁদের প্রণাম করে এখানে বসো। দেখছেন, কেমন সুন্দরী, যেন বিলেতী পটে-আঁকা ছবি দুটি।'

'তোমার নাম?'

'বিমলা।'

'তোমার?'

'শ্যামলা।'

'রঙটি তো বেশ নির্মলা! যেমন বাপ তাঁর তেমনি বেটি—এ আর না দেখলেও চলে। এমন মেয়ে এ পরগণায় নেই। চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিখুঁত। আমি যা-যা বলেছি তা বর্ণে বর্ণে সত্য কি না এখন মিলিয়ে দেখে নিন। এর মধ্যে আর গোপনের কিছু নেই। এরা যে ঘরে যাবে সে ঘরে মা-লক্ষ্মী এসে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হবেন। তার নজির এদের মা। উপস্থিত হিন্দু মুসলমান সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন আমার কথা সত্যি কিনা?'

বরপক্ষ বিপ্রপদর জৌলুস দেখে আগে থাকতেই হকচকিয়ে গিয়েছিল —এখন মেয়ে দেখে যে তারা কিছু প্রশ্ন করবে তা ভুলে গেল। এ-বাড়ীর মেয়ে তারা নেবেই।

এখন বিপ্রপদর অনুমোদন সাপেক্ষ। তাঁর ছেলে দেখে পছন্দ হলে এ কাজ দুটো অনায়াসে হতে পারে। ছেলে দুটি কলকাতায় কাজ করে। যেমন পাশ, কামাইও করে দুপয়সা! বিপ্রপদর এক শ্যালক কলকাতায় থাকে। তার পছন্দ হলেই সকলের পছন্দ। বিয়ের দিন তারিখ অগ্রহায়ণ মাসেই ঠিক হয়ে যায়। শুভ কাজে বেশী দেরী হওয়া ভাল না। তিনি

এবার ছুটি ফুরাবার আগেই বিয়ে দিয়ে দিতে চান। আর এই তাঁর প্রথম কাজ, রীতিমত খরচ-পত্তর হবে। যে যেথানে আত্মীয় স্বজন আছে তাকেই আনতে হবে। বাজনা বাজীরও ব্যবস্থা না করলে চলবে না—হয়ত ঠেকে যাত্রা গানও দিতে হতে পারে। এ-সব ভাবতে গেলে বিপ্রপদর মাথা ঘুরে যায়। কত খরচ যে হবে তার ঠিক কি! এই তো সবে তালুক কিনলেন—একটা ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আর একটা ধাক্কা এসে হাজির!

তিনি মনে মনে টাকার একটা হিসাব করেন। কোথায় তাঁর কত টাকা জমা আছে! কমলকামিনীর বাক্সের নীচে আধুলী রয়েছে চার হাজার। তাঁর শয়ন কক্ষে তক্তাপোষের নীচে একটা মট্‌কি আছে পোঁতা—তার ওপরে কিছু চাল নীচে সব টাকা। এগুলো রাণীর মুণ্ডের টাকা, বহু পূর্বের সঞ্চয়। অনুমান তিন হাজারের বেশী কিছু হতে পারে। অনেকদিন দেখা হয়নি, একবার তুলে গুণে দেখতে হবে। কিন্তু তা তো ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা না করলেই বা চলবে কি করে? ঘরের সকলে ঘুমালে তক্তাপোষ সরিয়ে অতি সংগোপনে ঠিক চোরের মত তুলতে হবে। দুশটা মশার কামড়ও খেতে হবে। হয়ত কমলকামিনী জানলে প্রথম বাধা দেবেন। ওগুলো তার বুকের রক্ত। পরে অনেক বুঝিয়ে কাজ সারতে হবে। কিন্তু তাও পারলে হয়—নইলে অমনি থেকে যাবে ও-টাকা।

আর টাকা আছে একেবারে বাইরে—হাঁসের খোপের নীচে। সেখানে রাখা হয়েছে যে বার অমরেশ হয় সে বার একদিন শেষ রাত্রে। রোজ হাঁসের ডিম আনতে গিয়ে কমলকামিনী একবার করে জায়গাটা দেখে আসেন। খুব হুঁসিয়ার মেয়েমানুষ। এমনি না হলে চোর ডাকাতের হাত থেকে কি রাখা যায়! যাক্, কোন প্রকারে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবেই। বিয়ে না দিয়ে তো ঘরে মেয়ে রেখে পোষা যাবে না। বিধাতা না ঠেকালে

মানুষ আর কিছুতেই ঠেকে না। তবে কি না বড় হাল্কা হয়ে যেতে হবে। হলে আর কি-ই বা করা যাবে! মানুষের ধারণা, তিনি লাখপতি। লাখ টাকা আর ক টাকা? ডান বাঁ চললেই মানুষে অমনি ভাবে। ভাবে ভাবুক—মন্দ কি!

এই দুটি মেয়ে পার হলেও নিজেরই থাকবে কতগুলি! শিবপদর তো আছেই। দেবপদর হবে। অত ভাবলে মাথা খারাপ হয়। যখন যেটার তাগিদ আসবে তখন সেটা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আগে-ভাগে অস্থির হলে লাভ কি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরনো চিটে গুড়ের টিনের মধ্যেও তো কিছু রেজগি সঞ্চিত আছে। যাক্ যাক্, চলে যাবে, ঈশ্বর ভরসা!

ঘটকমশাই বলে, 'মা-লক্ষ্মীরা বসে আছে—এখন আপনারা অনুমতি দিলেই ওরা উঠতে পারে।'

প্রথম বরপক্ষের একজন বলে, 'আমাদের আর দেখার প্রয়োজন নেই। আপনাদের?' বলে দ্বিতীয় পক্ষের দিকে তাকায়।

'না, না, আমাদের নেই মোটেই।'

মেয়েরা যথারীতি প্রণাম করে উঠে যায়। এবার ঘটকমশাই জামার বোতাম খুলে বুকের ওপর সজোরে একটা ফুঁ দেয়। এ যাত্রা সে বাঁচল। মেয়েদের থেকে সেই যেন বিষম দায় ঠেকেছিল।

বিমলা ও শ্যামলা ঘরে যেতেই আর একটা হাসির রোল পড়ে গেল।

মাধুরী দুবোনের গাল টিপে দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'পুরুষ মানুষ হলে আমি এক্ষুনি নিয়ে যেতাম তোদের নায় তুলে! এখন ভাদ্র মাস, কবে আসবে অঘ্রাণ মাস—অত দিন আমার তর সইত না। বাপ দুটো নিতান্ত বেরসিক—তা না হলে—' আর বলা হয় না, কমলকামিনী এসে পড়েন। তিনি চলে যেতেই বিমলা বলে, 'তুই নিতান্ত ছ্যাবলা!'

'আর তোরা একেবারে ক্যাবলা বুঝি! দেখা যাবে, দেখা যাবে, আসুক শালারা।'

'অসভ্য কোথাকার!' বিমলা বলে, 'তোর সুড়সুড়ি—'

শ্যামলা বাধা দেয়, 'চুপ দিদি চুপ, বাবা আসছে এদিকে।'

'শ্যামলা বিমলা দুজনে এদিকে আয় তো মা—তোদের নাম লিখে দে তো এই কাগজটায়। একটু ভাল করে লিখিস।'

নাম সই হলে বিপ্রপদ কাগজখানা নিয়ে চলে যান।

মাধুরীর আবার মুখ চলতে থাকে। 'আমি একাই তোদের দু বোনকে নিয়ে যেতাম বিয়ে করে।'

বিমলা বলে, 'আভাগীর আশা দেখ। সামলাতি কি করে?'

'কশে চাবুক মেরে।'

'মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলে দেখেছিস?'

'কত দেখেছি।' বলে সে পুরুষের পৌরুষ নিয়ে গর্ব অনুভব করতে চায়। 'আমরা হলাম ভোমরার জাত—একটুতেই হুল ফুটিয়ে দিতে পারি।'

'এ্যাঁ, দেখব, দেখব, কত তেজ!'

'কার তেজ দেখবি? আমার না যে আসবে তার?'

এবার বিমলা লজ্জা পায়। তবু বলে, 'তোর।'

'তবে দেখ আগে আমারটাই সয়ে!' মাধুরী সবেগে বিমলাকে জড়িয়ে ধরে, তার গালে অনেকগুলো চুমো খায়। শ্যামলা ভয়ে পালাতে চায়—মাধুরী তাকেও রেহাই দেয় না।

আজ আনন্দের মধুমেলা—ওরা হাস্য পরিহাসে ডগোমগো করতে থাকে।

অল্প কিছু দিন হয় দুর্গাপূজা হয়ে গেছে।...

কার্তিক মাস। দিন ক্রমশ ছোট হয়ে রাত বড় হচ্ছে। কাজকর্ম সেরে স্নান করে খেয়ে উঠলেই মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে এল, কিন্তু রাত আর যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। উত্তরের বাতাসের সংগে দক্ষিণা হাওয়ার দ্বন্দ্ব বেধেছে। একটু একটু করে হিমেল হাওয়ারই জয় হচ্ছে। বিপ্রপদ ভাবেন: এবার আর গাছের মাথায় সুপারি রাখা যায় না! পেড়ে বিক্রি করা দরকার। থোকা থোকা সুপারি পেকে লাল টুকটুকে হয়েছে—কোনও কোনও ছড়া গাঢ় হলুদ দেখাচ্ছে। দুটো চারটে যদি কাঁচা থাকে থাকুক—তা কেটে ভিজিয়ে 'মবাই' করলেই চলবে। এ সুপারিতে এবার কম টাকা হবে না—সংসারী সাধারণ খরচপত্তর কুলিয়ে যাবে। তিনি থোকের টাকায় হাত দেবেন না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাস ধরে নারকেল জমা করেছিলেন গাছ থেকে পাড়িয়ে, তাও পূজার মরসুমে বেচে কম টাকা পাননি। এ সব গাছ তাঁর নিজের হাতে লাগান, নিজেরই পরিশ্রমে জন্মান ফসল। প্রথম জীবনে খেটেছেন, এখন তার ফল বসে বসে ভোগ করছেন। এখন আর বিশেষ কোনও তদ্বির-তালাপি লাগে না। বছর বছর কিছু নতুন মাটি গাছের গোড়ায় দিলেই যথেষ্ট। সাধারণ গৃহস্থেরা এ সব দিয়েই সংসার চালায়। অবশ্য প্রায় প্রত্যেকেই ধান যে কিছু না পায় তা নয়। তবে প্রায় চার পাঁচটা মাস এই ফসলের ওপরই নির্ভর। কিন্তু এখন বিপ্রপদর খরচ বেশী। এ সব টুকিটাকিতে কুলোয় না। ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে গেলে তার চাল-চলন আলাদা—খরচ-পত্তরও বেশী। যা হক, তিনি সুপারি পাড়তে হুকুম দেন। কৃষাণেরা আসে—ভাগে কাজ করে যায়। সুপারি বেচে পান তিনশো টাকা। আর খাবার জন্য তো ঘরে প্রচুর মজুত থাকে। বছর ভরে কাটবে, বিলাবে, ফেলে ছড়িয়ে খাবে—তার আর হিসাব কে করে!

কিন্তু হাত একটু টান হলেও বিপ্রপদ আসল কাজে ভুল করেন না। ঐ টাকা থেকে কিছু টাকা ব্যয় করে গাছের গোড়ায় সার মাটি দেন।

আজকাল প্রায়ই খবর আসে, এখানে ডাকাতি হচ্ছে, ওখানে রাহাজানী হচ্ছে। বিপ্রপদর শুনে ভয় হয়। ভয়টা শেষে বিরক্তিতে পরিণত হয়। ওরা খেটে খেতে পারে না? পরের ধনে এত লোভ কেন? সারা জীবন না খেটে এক রাত্রে রাজা! কিন্তু চোর ডাকাতের বাড়ী তো দালান দেখা যায় না। যেমন আনছে, তেমনি ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। পাপের ধন যায় প্রায়শ্চিত্তে।

বিপ্রপদ ছোট দু ভাইকে ডেকে কিছু অস্ত্র শানিয়ে রাখতে বলেন। নিজে একখানা বড় রামদায় ধার দিতে বসেন। ধার দেওয়া হলে সেখানায় তেল মাখিয়ে নিজের শিয়রে টানিয়ে রাখেন। শক্ত কয়েকখানা লাঠি-সোটাও গুছিয়ে হাতের কাছে রাখা হয়। বিপ্রপদর জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল, তারপর যত দূর যা ঘটে ঘটুক।

গভীর রাত্রে বিপ্রপদ ও কমলকামিনী ফিস ফিস করে কথা বলেন। চারিদিকে শংকিত দৃষ্টি। কেউ কি তাদের দেখছে? কেউ কি শুনছে তাদের কথা? না। তারা দুজনে ঘরের ভিতরের তক্তাপোষটা সরিয়ে মটকিটার চাল তুলে ফেলেন। বিপ্রপদ শুয়ে শুয়ে তোলেন— কমলকামিনী সরিয়ে গুছিয়ে রাখেন। এবার টাকা উঠছে। টাকাগুলো কেমন ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে।

কমলকামিনী বলেন, 'খুব সাবধান—শব্দ হয় না যেন একটা টাকার। ...আঃ, একটু ধীরে।'

'আচ্ছা, ধামাটা এগিয়ে দাও।'

হঠাৎ কয়েকটা টাকা ঝনঝনিয়ে পড়ে যায়। কমলকামিনী ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, 'তুমিই সর্বনাশ করবে। ওই তো শিবপদ সজাগ হয়ে বাতি জ্বালাবার জন্যে দেবুকে না কাকে যেন বলছে। কি বিপদ!' তিনি তাড়াতাড়ি একখানা

কালো কাপড় এনে টাকার ধামাটা ঢেকে ফেলেন। পূর্ব থেকে বন্দোবস্ত ছিল বলেই অন্ধকারে এ সব আন্দাজে করতে তেমন কষ্ট হয় না। বিপ্রপদও অপ্রস্তুত হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। কমলকামিনীকেই বাধ্য হয়ে সাড়া দিতে হয়। 'কিছু না ঠাকুরপো, সেবার বার্লির বাটিটা সেই হুলোটা ফেলে দিয়েছে। ওটার জ্বালায় অস্থির—তোমরা ঘুমাও—কিচ্ছু না।'

শিবপদ আবার ঘুমিয়ে পড়ে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

আবার বিপ্রপদ ও কমলকামিনীর দ্রুত হাত চলতে থাকে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে থাকেন খুব সাবধানে।

২৩

টাকা তুলতে সময় কম লাগে না। কমলকামিনী একপ্রকার নিশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকেন। মটকি খালি হলে, বাক্স খুলে আধুলি-আনা হয়। এখন টাকাগুলো এমন স্থানে নিরাপদে সরিয়ে রাখতে হবে যে কেউ না কিছু সন্দেহ করতে পারে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হয়—কতক রাখবেন গোয়ালে আর কতক মেটে আলুর গাছের গোড়ায় ছাইয়ের ঢিবির তলায়। এ সব স্থানে বড় একটা লোকের যাতায়াত নেই।

ঘর থেকে টাকাগুলো বাইরে নিয়ে যেতে বিপ্রপদর বুকটা অস্থির হয়ে ওঠে—কিন্তু এ ছাড়া নিরাপদ করার আর দ্বিতীয় পথ নেই। তাই আর ভেবে সময় নষ্ট করেন না।

এবার চিটে গুড়ের টিনগুলো নিয়ে কোথায় রাখবেন? রেজগি তো সর্বদা কাজে লাগে। শেষ পর্যন্ত সেগুলো নিয়ে রাখেন গোয়ালের পাশে একটা ভুষি-কুঁড়োর জঞ্জালের নীচে, বেশ নির্জন অন্ধকার কোণটায়।

এখন যদি ডাকাত আসে নিতান্ত বোকা হয়ে ফিরে যাবে। তবে সোনার গহনাগুলো মাটির নীচে পুঁততে হবে। তা কাল রাত্রে করলেই চলবে—আজ আর সময় কই? পূব দিক্ ফর্সা হয়ে এল যে! ঐ মুসলমান

পাড়ায় মুরগী ডাকছে। বিপ্রপদ ও কমলকামিনী হাত পা ধুয়ে গিয়ে শুয়ে পড়েন এবং বেশ নিশ্চিন্ত মনে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হন।

স্থানে স্থানে ওঁদের দৌলত সরিয়ে রেখে ভাবনা কমেছে। হঠাৎ যদি ডাকাতে হানা দেয়, মারপিট করে, তবে ওঁরা মুখ বুজে থাকবেন—মরে গেলেও টাকার কথা বলবেন না। মিছামিছি কতক্ষণ আর হয়রান হবে—বিরক্ত হয়ে নিজের থেকেই সরে পড়বে। কিছু আগে থেকে টের পেলে সহজে বিপ্রপদ ভিড়তে দেবেন না ডাকাত বাড়ীতে।

দেনা-পাওনার ব্যাপারেও বিপ্রপদ খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলেন। কেউ টাকা পয়সা চাইতে এলে হাতে থাকলেও বলেন যে এখন হাতে নেই, জোগাড় করে নি, অমুক সময় এসে নিয়ে যেও। অর্থাৎ ঘরে থাকলেও ঘুরিয়ে দেন এইটুকু প্রকাশ করতে যে বাস্তবিকই তাঁর হাত খালি। এমনি ধারা নানা কৌশলে ওঁরা ওদের সম্পদ রক্ষা করে রাখেন।

ওই দৌলতই বিপ্রপদকে আজ জয়যাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ইমাম এসেছে, নিতাই এসেছে, দীনুও জুটেছে ওই দৌলতের জন্যই। কেউ এসেছে বন্ধু ভাবে, কেউ বা শত্রু ভাবে। বিপ্রপদ তাঁর সঞ্চিত সম্পদকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। জীবন দিতে পারেন তবু অর্থের অপচয় সইতে পারেন না। যদি কেউ কেড়ে নিতে আসে তার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করতেও এতটুকু পশ্চাৎপদ হবেন না। যৌবনের যশের সোপান ঐ অর্থ, বার্ধক্যের ভরসা ঐ দৌলত!

২৪

অবশেষে বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল।

আত্মীয়-কুটুম্বদের আনতে দেশে দেশে লোক গেল—নৌকা গেল। কদিনের মধ্যেই বাড়ী ভরে গেল চেনা অচেনা লোকে; কত ভাল মন্দ, লম্পট কপট, সাধু অসাধুর যে আমদানী হলো তার হিসাব রাখে কে! খাওয়া

দাওয়া হৈ চৈ হট্টগোল দিন রাত চলছে। ধোপা নাপিত ভুঁইমালী এক দিনের জন্য আর বাড়ী ছাড়বে না। প্রত্যেক পুকুরে সাময়িক প্রয়োজনের জন্য অস্থায়ী ঘাট দেওয়া হয়েছে সুপারি গাছ চিরে। নাটমন্দিরে, গাছের তলায়, পূজা মণ্ডপে, কাতারে কাতারে বিছানা পড়ে গেছে। জুতের ঘরে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেল। ওটা এখন মেয়ে মহল। নিজেদের মেয়ে লোক খুঁজতে হলেও রীতিমত আর্জি পেশ করে কাকুতি-মিনতি করতে হয় অনেকক্ষণ। তার পর ঈপ্সিতা যদিও বা আসে গোপনে কথা বলার জো নেই। হাজার কান, সহস্র চোখ উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে। পাশের বাড়ীগুলো পর্যন্ত বেদখল হয়ে গেল। তাদের ঘাড়েও গিয়ে পড়ল বিপ্রপদর মেয়ের বিয়ের অতিথ। এতে কেউ মন্দ বাসে না। যে যার সাধ্যমত যত্ন করে, স্থান দেয়—গল্প গুজবে সময় কাটায়।

যারা ঘা খেয়ে খেয়ে পেকেছে, ঠকে ঠকে শিখেছে, এমন সব প্রবীণের দল এল বিপ্রপদর ডাকে। এখন আর সময় নেই, হাট-বাজারে লোক পাঠাতে হবে—ফর্দ চাই। যেন কোন ভুলচুক না থাকে। কেউ আসে হাসতে হাসতে—কেউ বা আসে কাশতে কাশতে, যে যার যোগ্যতা প্রমাণ করবে আজ। ফর্দ সভাটা বসে নাটমন্দিরের এক পাশে, যেখানে পান তামাকের ডিপোটা খোলা আছে। অনেক বাকবিতণ্ডা হয়, হাতী ঘোড়াও মারা পড়ে দু দশটা, তার পর একটা খসড়া তৈরী হয়। যে দৈ ভালবাসে, সে দৈ দৈ করে এক অংক বলে যায়। মাছ যে ভালবাসে, সে মাছ নিয়ে টানাটানি করে। মিষ্টির বেলা সকলে একমত—প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয়োজন রাখতেই হবে, নইলে টানাটানি পড়বে নির্ঘাত, নিন্দা হবে খুবই। ফর্দ প্রায় শেষ হয়েছে, এখন যোগ দেবে, এমন সময় একটা অকরুণ স্বরে প্রবীণদের কানের কাছে বাঁশী বেজে ওঠে। বিরক্ত হয়ে তারা মারমুখো হয়ে ছুটে যায়।

সানাইওয়ালা স্বর ঠিক করছিল। সে হতভম্ব হয়ে বলে, 'এজ্ঞে কত্তা

ক্ষেমা চাই—আপনাদের চিনি নে।' সে মহা ওস্তাদ, যাত্রা-দল ফেরৎ ঘুঘু। তার মুখের ভাব দেখে সকলে ক্ষমা করতে তো বাধ্য হয়ই, উপরন্তু না হেসেও থাকতে পারে না।

এত বড় একটা ব্যাপারে দীনু নিজেকে দূরে ঠেলে রাখতে পারে না। সেদিন তালুক কেনার ব্যাপারে সে যে আঘাত পেয়েছে, এত দিনে দিব্যি তা সামলে নিয়েছে। পরার্থে যার জীবন উৎসর্গীকৃত। সে এমন একটা বৃহৎ অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে থাকবে কি করে? বিশেষত বিপ্রপদর এখন ভয়ানক অসময়—লোক জনের অভাব। যে সত্যিকারের বন্ধু সে এ সময় সাহায্য না করলে আর করবে কখন? সুসময়ে যারা বন্ধু হয়, অসময়ে ফিরেও তাকায় না—দীনু সে শ্রেণীর লোক নয়। তাই সে দধির পয়োধি মন্থন করার ভারটাই নিজের স্কন্ধে নেয়।

বিপ্রপদ বলেন, 'দেখবেন দীনুদা, দেবাসুরে আবার দ্বন্দ্ব না বাধে।'

'অর্থাৎ?'

'ঘোষালদের বাড়ীও একটা বিয়ে আছে কি না!'

'তাতে আমাদের কি? আমরা আলাদা বায়না দেব, আলাদা দৈ আনব।'

'কিন্তু তবু একটা অঘটন ঘটার আশংকা করি। আপনি বুড়ো মানুষ, ওর মধ্যে না গিয়ে, বরঞ্চ বরযাত্রীদের এদিকে থাকলেই ভাল হয়।'

'তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করছ? এই সামান্য টাকা পয়সার ব্যাপারে যদি অবিশ্বাস কর, তা হলে কাজে যশ হবে না বলে দিচ্ছি।'

বিপ্রপদ কার্যত তাকে এড়াতে চাইলেও, সে এমন কথা বলে যে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। 'না না, দীনুদা, আপনাকে করব আমি অবিশ্বাস এ কি সম্ভব! আপনি মন এত ছোট করছেন কেন? তবে সংগে ইমামকে নিয়ে যান, আজকাল পথ-ঘাট ভাল না।

দীনু হেসে বলে, 'এই তো ভায়া, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলে না!'

'আপনাকে অবিশ্বাসের কিছু নেই। কিন্তু ঐ বাড়ো শরীরটাকে তো

বিশ্বাস করা যায় না—তাই একজন দেহরক্ষী দিতে চাইছি। বলে বিপ্রপদ চলে যান—যেতে যেতে ফের বলেন, 'রওনা দেওয়ার সময় বায়নার টাকা নিয়ে যাবেন।'

দীনু মনে মনে বলে, 'বিপ্রপদ, তুমি যে আমাকে কতটা বিশ্বাস কর তা আমি বুঝি। তুমি একদিন আমার ভিটে মাটি বকেয়া পাওনার দায় নিলাম করিয়ে নেবে তাও জানি। তুমি সময়ের জন্য শুধু অপেক্ষা করে দিন কাটাচ্ছ—বসে রয়েছ সুযোগের জন্য। আমিও তোমাকে সহজে স্থির হতে দেব না। আমি তোমার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতু। ঘোষালের সংগে তোমাকে কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাব দক্ষিণের বিলে। তারই উদ্যোগ পর্বের আয়োজনে চললাম, তোমারই নায়ে, তোমারই পয়সায়। ইমাম আমি ঠিক না রাখলে, ইমাম আমার করবে কি ?

সেই দিন রাত্রে দীনুকে দেখা যায় ঘোষালদের বৈঠকখানায়।······

'যাচ্ছি বিপ্রপদর মেয়ের বিয়ের দৈ আনতে। তোমাদের যদি কিছু কাজে লাগি, তা জানতে এলাম। আমরা তো কোনও দিনই পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারব না, যদি গতর দিয়ে পারি—তাই বলতে এলাম। বিপ্রপদর অনুরোধ আর এড়াতে পারলাম না। পাশাপাশি বাস, একটু চক্ষুলজ্জা আছে তো। তা না হলে আমি ওর কাজে ভিড়ি। তবু তোমাদের ভুলতে পারিনি। শক্তিগড়ের কেউ না এলেও আমি এসেছি। বাবাজীরা, খুড়োর আসলে কখনও গোল হয় না, এইটা একটু লক্ষ্য করে দেখো।'

'আমরা অন্ধ নয় খুড়ো।' বড় ঘোষাল হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আমারও তো মেয়ের বিয়ে—দৈ তো আমারও চাই। কোথায় যাচ্ছেন দৈ আনতে ? দূরে গেলে তো নৌকা ভাড়া অনেক।'

[illegible]

পড়বে না। বিপ্রপদর নৌকায় বিনা ভাড়ায় তোমার ঘাটে এসে উঠবে—' তারপর যাবে তার ঘাটে। পড়তা অনেক কম পড়বে—বিশ্বাস কর বাবাজী।

এমন একটা অভাবনীয় প্রস্তাবে বড় ঘোষাল [illegible] হয়। সে যেন হাতে আকাশ পায়। 'খুড়ো কি সত্যি বলছেন, না আমাকে পরীক্ষা করছেন?'

'সত্যি-মিথ্যে এই দেখো।' বলে বিপ্রপদর দেওয়া টাকার থলেটা দেখায়। 'আমি গরীব মানুষ—এত টাকা পেলাম কোথায়?'

'তা হলে আমিও কিছু দিয়ে দেই—আমার জ[illegible] আষ্টেকের বায়না দেবেন। আমার।কষ্ট মিষ্টির ব্যবস্থা সংক্ষেপ। দৈ'র ও[illegible] সব ভরসা। আর কাঁহাতক পারি বলুন, কটা মেয়েই তো পার করলাম তবু ভাণ্ডার খালি হয় না। যেমন একটি যায়, ভানুমতীর ভেল্কীর মত আর একটি এসে হাজির, মোটের অংক নড়ে না। বিপ্রপদর প্রথম কাজ স্ফূর্তিতে পয়সা ব্যয় করছে—আমার আর স্ফূর্তি-টুর্তি নেই। কিন্তু তবু অতিথি-অভ্যাগতদের যত্নে ত্রুটি হলে মাথা কাটা যাবে, সেই ভয়েই আপনার কাছে এ কাজের ভার দিচ্ছি। দেখছেন তো এখনি বাড়ীতে তিল রাখার ঠাঁই নেই। পিল-পিল করে চেনা-অচেনা সব আত্মীয় স্বজন এসে ভরে গেছে, এর পর তো আরো আছে। আমার থাক কি না থাক—যদি এদের এতটুকুও ত্রুটি হয় তবে দেশ-বিদেশে আর মুখ দেখান [illegible]বে না। বনেদী ঠাট, বনেদী তালুক-মুলুক বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁ[illegible]ছ।'

'টাকা-পয়সা কিছু দিতে হবে না বাবাজী, শুধু মুখের কথা দাও—দেখো দীনু খুড়ো তোমাদের কত ভালবাসে। একেবারে ঘাটে এসে হাজির হবে, তখন দেখে-শুনে দাম দিও।'

'খুড়ো আপনি পিতৃতুল্য। আপনার নাতনীর বিয়ে, যা ভাল হয় করুন। এ তো আমি প্রত্যাশাই করতে পারি নে।'

'আচ্ছা বাবাজী, এখন উঠি।'

এক কালে ঘোষালেরা এদেশে সত্যিই বড় লোক ছিল। সেনেদের পরই নাম করলে তাদের নাম করতে হয়। কিন্তু এরাও ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বংশবৃদ্ধির সংগে সংগে এদের আয় বাড়েনি—কিন্তু ব্যয় বেড়ে গেছে বহু গুণ। দেশের লোকেরা তা টের পায়নি, জনসাধারণ এখনও তাদের নিয়েই দম্ভ করে অন্তত প্রাচীন পন্থীরা। বিপ্রপদকে এখনও তারা উচ্চাসন দিতে নারাজ, কিন্তু সেনেদের খারিজা তালুকটা কেনার পর ঘোষালেরা অনেক হাল্কা হয়ে গেছে—সংগে সংগে হাল্কা করে দিয়েছে তাদের পৃষ্ঠপোষকদের। তবু প্রাণান্তে তারা গৌরব বজায় রাখতে চায়। কিন্তু রাখবে কি করে? একটা মেয়ের বিয়ে দিয়ে উঠতে বড় ঘোষালের প্রাণান্ত আর বিপ্রপদ অনায়াসেই একটা নতুন তালুক কিনে আবার পাতালেন দু দুটো মেয়ের বিয়ে। যেন টাকার তোড়া খুলে দিয়েছেন। সেনেরা ধ্বংস হয়েছে অসংযম ও ব্যভিচারে—আর এরা ধ্বংস হতে বসেছে ব্যয় বাহুল্যে। সরিকে সরিকে তো মামলা মকর্দমা আছেই।

ফেলে ছড়িয়ে হিসাব করলে এখনও এদের এজমালীতে আয় দশ হাজার টাকা কিন্তু এক ভাগে পড়ে মাত্র তিন হাজারের কিছু বেশী। সে টাকা সব আদায় হয় না। ভাগে-ভাগে আর্জি দিয়ে পাওনা উসুল করায় যেমন ব্যয় বেশী—ভোগও যথেষ্ট। বহু জমা তামাদি হয়ে যায় তবু নালিশ দেওয়া হয় না। প্রজারা দুর্ব্বলতা বুঝতে পেরে শক্ত হয়। তখন মৌখিক শাসন, তলে তলে তোষণ-নীতি চালিয়ে তাদের তুষ্ট করা ছাড়া উপায় থাকে না। এক সরিক যদিও বা আর্জি দিয়ে তর সইতে পারে, আর একজন তা পারে না—এমনি সব নানা কারণে এত বড় বনেদী ঘরও পড়তা পড়ে আসে। আরও একটা বৃহত্তম হেতু সৃষ্টি হতে চলেছে দক্ষিণের বিলে। বলতে গেলে ঘোষালদের এখন প্রাণ ঐ জমির ধানে। বিপ্রপদ সেখানেও থাবা বাড়িয়ে নখ বসিয়েছেন বুনো বাঘের মত।

বিয়ের দিন লোকজন পেট ভরে খেয়ে বিপ্রপদর দৈ সন্দেশের এবং মিঠাই মণ্ডার প্রশংসা করতে করতে বাড়ী যায়—কিন্তু তখন পর্যন্ত ঘোষালদের বাড়ী অতিথি-অভ্যাগতদের তো দূরের কথা বরযাত্রীদেরই পাতা পড়ে না। যা দিয়ে শেষ রক্ষা তাই এসে ঘাটে পৌঁছায়নি। ঘোষালেরা বাড়ী ছেড়ে ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কোথায় দৈ'র নৌকা! যত দূর দেখা যায়, একখানাও বড় নৌকা খালে দেখা যায় না। জাত গেল, মান গেল—তারা করবে কি!

এমন সময় লোকের মুখে সংবাদ আসে ইমাম ও নিতাই ঘোষালদের ঘাটে নৌকা ভিড়তে দেয়নি, একেবারে বিপ্রপদর বাড়ী এসে উঠেছে সব দৈ। দীনুর কথায় তারা কেউ কান দেয়নি—বিপ্রপদও নাকি সে সব শুনতে চান না। তাঁর বায়নার দৈ অপরের ঘাটে উঠবে কেন? দীনু কি করবে? হাওয়া ধরে তো আর দৈ পাতা যায় না। বিপ্রপদর জন্য আজ তার লজ্জায় মাথা কাটা গেছে। সে আর ভাইপোদের এ পোড়া-মুখ দেখাবে কি করে? তাই সে আর নিজে আসেনি—লোক দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছে। দীনু মনের দুঃখে না খেয়ে-দেয়ে বিপ্রপদর বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেছে। এত বড় ঔদ্ধত্যের বিচার না হলে সে আর এমুখো হবে না।

আসল কথা, সে ঘোষালদের জন্য দৈ'র বায়না মোটেই দেয়নি, তা কেউ তলিয়ে দেখে না—ঘোষালদের মাথাও সেদিকে খেলে না—নিতাই, ইমাম ও বিপ্রপদর উপর এ বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা ক্ষেপে ওঠে, ক্ষেপার কথাও বটে!

সেদিন ঘোষালেরা প্রতিজ্ঞা করে, এদেশে হয় তারা, নয় বিপ্রপদ থাকবেন—এসপার-ওসপার যা-হক একটা হয়ে যাবে।

রাত্রে দীনু গিয়ে বিপ্রপদকে বলে—'এখন চারটি ব্যবস্থা করে দিলে খেতে পারি—পেট এখন ভালই আছে। দেখেছ ঘোষালদের বুদ্ধি, খাওয়াবে না দৈ রাজ্যশুদ্ধ হৈ-চৈ! এখন কার ঘাড়ে ফেলবে দোষ, নিতাই

এবং তোমার ওপর যত অসন্তোষ। ভায়া আমাকেও বাদ দেয়নি, ছাই ফেলার কুলোটা নিয়েও টানাটানি। ভাই তিনটি বুদ্ধির ঢেঁকি!'

সুপ্রতুল মত মেয়ে দুটির বিয়ে হয়ে যায়। বিপ্রপদর কোন কাজেই ক্রুটি হয় না। ঘোষালদের অপযশ ছড়িয়ে পড়ে দেশময়।

ঘোষালেরা সুযোগ খুঁজতে থাকে কখন প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

খড় কুটোতে আগুন দিয়ে দীনু-প্রেত দিব্যি দূরে বসে হাসতে থাকে।

এত দিন কমলকামিনী এবং তাঁর দুই জা কুটুম্ব-কুটুম্বিনী নিয়ে কি যে ব্যস্ত ছিলেন তা আর বলা যায় না। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে শুধু খেটেই চলেছেন। ঠাকুর নেই, চাকর নেই, এতগুলো লোকের সর্ব্বপ্রকার চাহিদা তাঁরা নিজেরাই একান্ত আন্তরিক ভাবেই মিটিয়েছেন। নায়ের মাঝি থেকে শালগ্রাম শিলার পূজারী পর্যন্ত এদের যত্নে ও সেবায় তৃপ্ত—পরম আদরে মুগ্ধ।

এঁরা চান অন্তরালে থেকে একজনকে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রকাশ করতে, তাতেই এঁদের শান্তি এবং তৃপ্তি।

কমলকামিনী শুধু দু জাকে নিয়েই এত বড় একটা কাজ করে উঠতে পেরেছেন, ভাবলে ভুল করা হবে—আশে পাশের প্রতিবেশীরা যত দূর সম্ভব এসে সাহায্য করেছে, মিষ্টিমুখে কি না হয়।

একটি মালায় নটি ফুল তার দুটি আজ গ্রন্থিচ্যুত হবে—সে বিচ্ছেদ ব্যথা যে কি তা কমলকামিনী বুঝতে পারেন। কাজের ভিড়েও কেবল চোখ ভিজে ওঠে। ঘন ঘন মেয়েদের ডেকে কি খেয়েছে, কি করেছে তাই কেবল জিজ্ঞাসা করেন।

সকলের বুকে একটা ব্যথা দিয়ে দুবোনে গিয়ে দুখানা নৌকায় উঠল। অমরেশ আজ আর থাকতে পারে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এত ঝগড়া এত মারামারি সব ভুলে যায়।

বিমলা জানলা দিয়ে মুখ বের করে বলে, 'মা, ওকে ডেকে নেও। অমরেশ তোর শত্রু বিদায় হচ্ছে কাঁদবি কেন? ভাল হলো, চুপ কর।'

এ কথার ফল হয় উল্টো।

শ্যামলা ডেকে বলে, 'এই নে অমরেশ, চাবিটা নে—আমার পুতুল পুঁতির মালা তোকে দিয়ে গেলাম, তুই সকলকে ভাগ করে দিস।'

সেবা দিদিদের নৌকায় যাওয়ার জন্য বায়না ধরে।

অবশেষে নৌকা ছেড়ে মাঝিরা বিপরীত দিকে বাইতে থাকে।

ঘরে এসে কমলকামিনী অনেক দিন বাদে শয্যা গ্রহণ করেন—বাইরে এসে বিপ্রপদ নির্জন আকাশটার দিকে চেয়ে থাকেন।

২৫

মেয়েদের কথা বিপ্রপদ বেশীক্ষণ ভাবতে সময় পান না। নানা দিকের নানা কাজ তাঁর কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। কেউ জোড় হাতে সুবিচার চায়—কেউ করে দিতে বলে মীমাংসা, কেউ উপদেশের আশায় অপেক্ষা করে বসে থাকে।

বিপ্রপদ আজ গ্রামের প্রধান—হাকিমের আসনে সমাসীন। তিনি কি করে অবজ্ঞা করবেন এসব আবেদন? কি করে অগ্রাহ্য করবেন ওদের এজাহার? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, খাওয়া-দাওয়ার সময় বয়ে যায় তবু তাঁকে থাকতে হয় কাছারী সাজিয়ে—পান তামাকের অবারিত ব্যবস্থা নিয়ে। তালুক কেনার পর থেকে তাঁর এ খাটুনী ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেছে। দূর-দূরান্ত থেকে কত লোক যে নিত্য দুবেলা তাঁর কাছে আসে নানা জটিল বৈষয়িক প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে! দূরাগত যারা, তারা তাঁরই ভাত খেয়ে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁরই পরামর্শ নিয়ে চলে যায়। কেউ শরিকের কাছে ঠকে ঠকে, ভদ্রাসন ছেড়ে যাওয়ার জোগাড়, কেউ

পরাক্রান্ত শত্রুর হাতে মুখ গুঁজে কেবলই মার খাচ্ছে, কেউ বা পুলিশের হাতে নাজেহাল—জোর করেই দেবে জেলে—এমনি শত সহস্র কূট সমস্যার মীমাংসার পথ খুঁজে দিতে হয় তাঁকে। বিপ্রপদ ক্লান্তি বোধ করেন না। নিতান্ত অসময়ে কেউ এলেও তাকে অনাদর করেন না। বরঞ্চ এ সব কাজে তাঁর যথেষ্ট অধ্যবসায়ই দেখা যায়। বাড়ী যত দিন আছেন এমনি ক্ষত বিক্ষত মনস্তাপক্লিষ্ট মানবের সেবা করে যাবেন, জাতি ধর্মের বিচার না করে—করবেন যে আসে তারই মনোরঞ্জন।

এক দিন এক জন অপরিচিত ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় এসে জিজ্ঞাসা করে, বলতে পারেন বোস ঠাকুর কোথায় ?'

বিপ্রপদ নিজেই জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন বোস ঠাকুর ? এখানে তো তিন ঘর বোস আছে, কাকে চাই ?'

'বিপ্রপদবাবুকে চাই।'

'কি দরকার ? আমার নামই তাই।' বিপ্রপদ বুঝতে পারেন না, 'তুমি' না 'আপনি' কোন সর্বনামটা ব্যবহার করবেন। লোকটিকে কথায় বার্তায় বেশ ভদ্রলোক বলে মনে হয়, কিন্তু জামা কাপড়ের দিকে চাইলে আপনি বলতেও দ্বিধা বোধ হয়। দেখা যাক আর কিছুক্ষণ! মাঝামাঝি ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'নাম ? বাড়ী ?'

'বাড়ী রাইসাড়ী। নাম স্বরূপ, কিন্তু আমি বহুরূপ, বিধাতা আমার ওপর বিরূপ—তাই নিলাম আপনার শরণ, আপনি না কি মহাজন। রক্ষে করুন দীনজনে, এই আকিঞ্চন করি প্রাণে।'

'পেশা ?'

'কথকতা।'

'জাতি ?'

'ব্রাহ্মণ।'

লোকটির প্রতি লক্ষ্য করে বিপ্রপদ দেখেন, ওর বয়স প্রায় চল্লিশ

হয়েছে, কপালের রেখাগুলি বেশ স্পষ্ট দেখাচ্ছে। কানের দুপাশের চুলগুলিও পেকে এসেছে। লোকটি রসিক, কিন্তু ওর বাড়ীর অবস্থায় কতটুকু রস আছে তা বোঝা দায়।

'কি চান আপনি ?'

'শিশুকালে পুষলাম যারে, সে শিক্ষা দেয় হাড়ে হাড়ে। সে একটা বুনো বাঘ, এখন আমাকেই ভাবে নধর ছাগ। তার ভয়ে পালিয়ে ফিরি দেশ-বিদেশে, অবশেষে উঠলাম শক্তিগড়ে এসে। আপনি না কি বিপদ-বারণ, তাই নিলাম আপনার শরণ। রক্ষে করুন হে মহাশয়, আপনার হবে জয় জয় !'

লোকটি অদ্ভুত ! চমৎকার ছড়া মিলিয়ে কথা বলে। অন্ধকারে মুখখানার ভাবভংগি এখন আর স্পষ্ট দেখা যায় না, তাই তিনি একটা আলো দিতে বলেন। ছেলেমেয়েরা এবং স্ত্রীলোকেরা আবৃত্তি শুনে অন্ধকারেই নাটমন্দিরে এসে ভিড় করেছে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে জুতের ঘরের পশ্চিম বারান্দায়। সকলেই সত্ত আগন্তুকের জন্য একটা বিশেষ কৌতূহল বোধ করতে থাকে। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার এ এক ব্যতিক্রম বটে।

অন্ধকার আর একটু গাঢ় হয়ে এলো।

সহসা লোকটা চীৎকার করে উঠল। 'একটা বাঘ, বাঘ—ছেলেমেয়েরা লাগবে তাক, মশাই যেন না হন রাগ।'

বিপ্রপদ একেবারে লাফিয়ে ওঠেন। বাঘ এলো কোত্থেকে ? ছেলে-মেয়েরা হাঁউমাউ করে ওঠে। একটা জড়াজড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কেউ কেউ কেঁদে ফেলে।

বিপ্রপদ কি করবেন ! সজোরে হেঁকে বলেন, 'একটা আলো, আলো দাও। ল্যাজা আন শিবে।'

কমলকামিনী এ সব কত দেখেছেন ছোটবেলায়। একটা লণ্ঠন নিয়ে এসে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'পুরুষ মানুষের এতও ভয় ?'

লণ্ঠনের আলোতে দেখা যায়, সত্য সত্যই একটা প্রকাণ্ড সুন্দর বনের বাঘ লোকটার হাত কামড়ে ধরেছে। একেবারে রক্তে নদী হয়ে গেছে। অমরেশের পায়ের কাছে লেজটা পড়েছিল, সে আঁৎকে উঠে সরে যায়। ছেলেমেয়েরা সব স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

বিপ্রপদ এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন—'বহুরূপী।'

অমরেশও কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারে, এ জংলা জ্যান্ত বাঘ নয়। কারণ ব্যাঘ্র মশাই নিজের থাবা দিয়ে লেজটা গুছিয়ে রেখে একটা বিড়ি ধরাল।

বিপ্রপদ বলেন, 'এখন দিয়ে দাও এদের যা দেবার—বিদায় করো।'

'দেখবেন মা ঠাকরুণ, বুনো বাঘের খোরাকী যেন পোষায়। অনেক দূর থেকে আসছি আপনাদের নাম শুনে। দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, কত লোকজন খেয়েছে নিয়েছে। আমাদের এই ছাগ ও বুনো বাঘের যেন পেট ভরে। ঘরে বাঘিনী ও ছাগিনী রয়েছে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আমাদের পথ চেয়ে তাদের কথাও মনে রাখবেন। তারা অনেক দিনের উপোসী।'

'একটু বুঝে-সুজে বিদায় করো বুঝলে?' বিপ্রপদ বিদেশী লোকের সামনে খাটো হতে চান না। বলেন, 'এরা কিন্তু নানা দেশ-বিদেশে ঘোরে।'

'এই নেও।' বলে কমলকামিনী একটা ধামায় করে সের দশেক চাল নামিয়ে দেন।

বিপ্রপদ মুখে বলেন, 'কি, খুশী তো?' কিন্তু এতগুলি চাল দেখে মনটা কেমন করতে থাকে যেন! এত বড় একটা খরচের পর একটু সামলে চলা উচিত।

'হুঁ, খুব খুশী।' বলে বাঘে ছাগে বিবাদ ভুলে হাসতে হাসতে চলে যায়। জ্যোৎস্না রাত—গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরাও পিছু নেয়। অনেক ভিড় দেখে বাঘ আবার ঘোঁৎ করে ওঠে। ছেলেমেয়ের দল সভয়ে পিছিয়ে যায়।

আত্মীয় স্বজন লতায় লতা, পাতায় পাতা যারা এসেছিল তারা একে একে চলে যায়। যেতে যেতেও প্রায় মাসখানেক সময় লাগে। এবার বিপ্রপদ কমলকামিনীকে ডেকে বলেন, 'এক দিন জুতের ঘরখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা দরকার। কত ঝুল নোংরা জমেছে যে ঘরে! মানুষ দিয়ে এ কাজ হয় না, অন্ততঃ মনের মত হয়ই না। নিজেদেরই করতে হবে। কবে পারবে?'

'আমিও তো তাই ভাবছি। শুধু ঘর না বারও ভাল করে পরিষ্কার করা দরকার। এখন বিমলা শ্যামলা নেই, একা একা পারা হয় না—বৌরা তো সংসার নিয়েই ব্যস্ত। তুমি যদি একটু সাহায্য করো। কিন্তু তা কি এখন তুমি করবে? এখন তো বড়লোক হয়েছে—তালুকদার!'

'অত আর ঠাট্টা করতে হবে না। আমি বাবু হলেও, যে বিপ্রপদ সেই বিপ্রপদই আছি—ওতে আমার মান যাবে না। তবে, কাল সকালেই আরম্ভ করা যাক, কি বলো? ঘরটাই প্রথম পরিষ্কার করতে হবে। ওখানা তুলতে আমার কত রক্ত যে জল হয়ে গেছে! কি ছিল, কমল, তুমি তো সবই জানো! একখানা মাত্র ছোট ঘর। তার না ছিল ছাউনী, না ছিল ভাল বেড়া। বৃষ্টি এলে মাথায় পড়ত জল, ঝাপ্টা এলে ভিজে যেত ঘর-বারান্দা। কি যে দুঃখে দিন কাটিয়েছি তা এখনও ভুলতে পারিনি। তুমি তো ভুক্তভোগী, সবই নীরবে সয়েছ!'

'থাক থাক এখন সে সব কথা। তবে মনে রেখো, তুমি গরীব ছিলে, গরীব-দুঃখী যেন তোমার কাছ থেকে আঘাত না পায়।'

'তাই ভাবছি প্রজাদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে দেখব? যারা নিতান্ত গরীব তাদের মধ্যে আমার এই তালুকের আয়টা বাটারা করে দেবো। আমি সামান্য মানুষ, আমার যা সামান্য সাধ্য তাই করব।'

'যা করো, নীরবেই করো। এ সব কথা প্রকাশ হলে ক্রমে ক্রমে সদর

খাজনাও আদায় হবে না। প্রজারা মাথায় উঠে বসবে। এতকাল জমিদারী সেরেস্তায় তুমি কাজ করে মানুষ চিনলে না, গরীব ও বজ্জাত, দুটো আলাদা জাত। তাদের পৃথক্ করে চেনাই দায়। আমার বাবা সে সব চিনতেন—তাই তাঁর দয়া-মায়া আদায়-উসুল সব ভাল ছিল।'

'বাপ না থাক তাঁর বেটি তো ঘরে আছে—তার কাছেই না হয় হাতে খড়ি দেওয়া যাবে এখনও তো আমার বয়স বেশী হয়নি, কি বলো?'

'বয়স আবার বেশী হয়নি! বুড়ো ছাত্তর! হাতেখড়ি না দিয়ে, যদি বাড়ি দেই?'

'দিও, তোমার যা ইচ্ছা দিও।'

দুজনে হাসতে থাকেন।

ঘর তো না যেন একটা মিউজিয়াম। গৃহস্থালীর কত জিনিষ—তার সংগে বনেদী আসবাব-পত্তর কত যে রয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স তৈরী করিয়েছেন কমলকামিনী। তার ওপর অনায়াসে শুতে পারে তিন জন। বাক্সটার ওপরের দিকে ডালা। ডালা তুললে তাতে অসংখ্য কাঁসা পিতল তামার জিনিষ পত্তর বাসন-কোসন দেখতে পাওয়া যায়। বড় দুটো পিতলের হাঁড়ি এবার কিনেছেন বিয়ের নিমন্ত্রণ রাঁধার জন্য। একটা প্রকাণ্ড বড় গামলাও খরিদ করা হয়েছে গত বছর। সে গামলায় চড়ে পার হওয়া যায় নদী। খাগড়াই কাঁসা, পশ্চিমা বাটলাই, হাতা খুন্তি, বেড়ি, জলের কলসী ধীরে ধীরে সঞ্চয় করেছেন। এমন সব জিনিষ এক পুরুষে কেন দশ পুরুষেও নষ্ট হবে না।

ঘরখানার চারদিকে ঘোরান চারটে বারান্দা—মাঝখানে 'টোপের' ঘর। তারপর আবার পূর্বে-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণ দীঘলি একটানা খোলা বারান্দা। মাঝের ঘরটা আবার তিন তলা। তার প্রত্যেক তলায় কত যে পট-ঘট, কত যে ডালা-কুলা, কত যে সাবেকী জিনিষ-পত্তর, তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়! হরিণের সিং থেকে বাঘের ছাল পর্যন্ত সবই

আছে। তবে পরিপাটি করে গুছান না। বিপ্রপদ ও কমলকামিনী সৌখীন ছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁদের মধ্যে পারিপাট্য-বোধ জন্মায়নি। তার সুযোগ তাঁরা পাননি। সংগ্রহ করেছেন কিন্তু কি করে ভোগ করতে হয় তা হদিস করে উঠতে পারেননি। এখানে সেখানে সব গাদা-মারা রয়েছে। তবু এগুলির জন্য বড় মায়া, বড় মমতা তাঁদের। প্রায়ই ওপরে উঠে এগুলি দেখে যান, নেড়ে চড়ে আবার রেখে চলে যান। কিন্তু জুতের ঘরের দ্বারদেশে একটা সহজাত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। দুটো বুনো মোষের শিং সমেত দুটো মাথা দুপাশে টাঙান—যেন উদ্ধত বীরত্বের প্রতীক!

ঘরখানা ঝাড় পোঁছা করতে স্বামী স্ত্রীর দ্বিপ্রহর গত হয়ে যায়। ওঁরা একমনে জল ঝাড়ন ঝাঁটা যখন যা দরকার ব্যবহার করে যান। কেউ হয়ত পান খেয়ে চূণ মুছেচে বাঘের ছালটায়; কেউ হয়ত খানিকটা হরিণের শিংয়ে রেখেছে কি সব ঘসে। বিপ্রপদর এ সব দেখে মনে বড় ব্যথা লাগে। কত দুঃখ-কষ্ট করে তিনি এগুলি সংগ্রহ করেছেন। 'দেখ, দেখ, কৃষ্ণকালীর ছবিটা নেই। কে যেন সরিয়েছে। ও ছবিখানা বড় পুরানো, বাবা ওখানার দিকে চেয়ে চেয়ে দেহত্যাগ করেছেন। কোন্ পাষণ্ড এ অপকর্ম করল! দুখানা ছবির জন্য আমার দশ টাকা গেলেও দুঃখ ছিল না।'

'কি করবে, এখন তো আর উপায় নেই—আর একখানা কিনে এনো।'

'কিন্তু ওখানা তো আর পাব না—ওর সংগে যে বাবার স্মৃতি জড়িত।'

'তা তো ঠিক, কিন্তু কি করবে বলো!'

এরপর যতক্ষণ বিপ্রপদ কাজ করেন আর কোন কথাই বলেন না। ওখানা কি আজকালের ছবি!

অমরেশ একবার মাকে খুঁজতে খুঁজতে দোতালায় ওঠে। কি যেন বলবে, বাবাকে দেখে আর বলা হয় না।

বিপ্রপদ খুব নরম সুরে জিজ্ঞাসা করেন, 'অমরেশ, বাবা, বলতে পারো, কৃষ্ণকালীর ছবিখানা এখান থেকে নিল কে?'

'কোন্ ছবিটা?'

'এই যে এখানে টাঙান ছিল। মাঝখানে কৃষ্ণ ও কালীর ছবি, এক দিকে রাধিকা, অপর দিকে আয়ান ঘোষ।'

'কৃষ্ণর হাতে বাঁশী আর কালীর হাতে খাঁড়া? জোড় হাতে একটা বুড়ো এক দিকে বসে—আর একটি মেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ছবিটা, বাবা! তুমি দেখেছ, দেখেছ বাবা?'

'কে যেন দলা-মোচা করে ফেলে দিয়েছিল ওইখানে, আমি তুলে রেখেছি আমার বাক্সে। নিয়ে আসব?'

'যাও যাও, নিয়ে এসো—নিয়ে এসো লক্ষ্মীটি।'

অমরেশ ছুটে গিয়ে ছবিখানা নিয়ে আসে।

'দাও, বাবা, দাও, তোমাকে একটা টাকা পুরস্কার দেবো।'

'তবে দাও টাকা।'

'এখন না, একটু পরে নিও।'

'না, না—এক্ষুণি দিতে হবে।'

'আচ্ছা চলো।' বলে ছবিখানা বিপ্রপদ মাথায় ঠেকিয়ে বেশ করে টেনে-টেনে সমান করতে করতে নীচে নেমে যান। এখানা তাঁর কাছে অমূল্য সম্পদ—পিতার স্মৃতিচিহ্ন!

২৬

খুব ভোরে বিপ্রপদ আজ প্রজাদের বাড়ী যাবেন। এরা প্রায় সকলেই পরিচিত। চিরদিন বোসেদের বাড়ী আসছে, বোসেরা ওদের বাড়ী যাচ্ছে। কত কাল ধরে যে এ যাওয়া-আসা চলেছে, তা কেউ জানে

না। একটা সহজাত গ্রাম্য-প্রীতির বন্ধনে ধীরে ধীরে সকলে বাঁধা পড়ে গেছে। প্রজারা বেশীর ভাগই মুসলমান এবং গরীব। অনেকেরই বর্ণজ্ঞান পর্যন্ত নেই।

ঘুরতে ঘুরতে বেলা হয়ে যায়—একটু একটু দেরী করতে করতে সময় কাটে। কোনও বাড়ী থেকেই সহজে উঠতে পারেন না। প্রত্যেকেই ভাবে, শুধু তার বাড়ীই বাবু এসেছেন, তাই, একটু পরে চলে যেতে চাইলেই, ক্ষুন্ন হয়।

অমনি এক বাড়ী থেকে বিপ্রপদ উঠি-উঠি করছেন, এক বৃদ্ধা এসে বলে যে সে আবদুলের মা। তাকে বিপ্রপদ হয়ত চেনেন না। না চিনলেও তার ঘরে একটু গিয়ে না বসলে সে খুবই দুঃখিত হবে।

'কোন্ ঘরে?'

'বাড়ীর মধ্যে আমরা হইছি সকলডির থিকা গরীব। ঐ কুড়িয়া খান—পূবের ভিডিতে ঐ যে ছোট্ট ঘরডুক, ঐখান আমাগো। মনে আছে আবদুলের কথা?'

'কেন থাকবে না? সেই, সেই যে খালের চরে যার গরুটা পুঁতে গিয়েছিল—সেই আবদুল তো?'

'হ্যাঁ, বাবু, হ্যাঁ।'

'আজ তোমাদের ওখানে, না গেলে হয় না, এই তো তোমাদের বাড়ীই এসেছি—আজ অনেক বাড়ী ঘুরতে হবে কি না, সময় বড় অল্প।'

'আমরা বড় গরীব, বাড়ীর মধ্যে আমরাই রোজ আনি রোজ খাই—তাইর জন্য বুঝি তুচ্ছ করলেন? আপনে তালুক কেনছেন শুইন্যা আমি পথের দিকে চাইয়া আছি কখন একবার আসেন রাইওৎ-বাড়ী! আবদুলরে এক দিন পাঠাইছিলামও ডাকতে। ও গেছিল কিন্তু দেখা পায় নাই।' বৃদ্ধা একটি মুসলমানী গ্রাম্য কবিতা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়। সে যেন শবরীর মত চেয়ে আছে পথের দিকে। কখন আসবেন নবঘন

শ্যাম শ্রীরামচন্দ্র? কখন তাঁর শ্যামছায়া পড়বে অংগনে? পথ চেয়ে চেয়ে তার দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়, তবু বাঞ্ছিত আসে না! কুঞ্চিত কালো অলকদাম আজ শফেদ হয়েছে, এখনও কি তাঁর সময় হলো না! আজও কি তিনি তার দুয়ার থেকে ফিরে যাবেন এই মুসলমান শবরীকে প্রত্যাখ্যান করে? বৃদ্ধা সামান্য চাষীর মেয়ে হলেও, জ্ঞানী—গ্রাম্য কাব্যজ্ঞান তার নিদর্শন।

বিপ্রপদর মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে ওঠে—হৃদয় যায় আর্দ্র হয়ে। তিনি বৃদ্ধার দাওয়ার ওপর একখানা হেউলী পাতায় হোগলায় গিয়ে বসে পড়েন।

একটা ডাব কেটে দেয় ইমাম—নিজ হাতে ফুটো করে খান বিপ্রপদ।

ঝগড়া করতে করতে একটা মুরগীর ছানা বিপ্রপদর জামার ওপর উড়ে এসে পড়ে। সকলে হা-হা করে ওঠে।

'থাক্ থাক্, ওতে কি হয়েছে—ও ভয় পেয়ে আশ্রয় নিয়েছে আমার কাছে। ওকে তাড়িও না।' ফুটন্ত কদম ফুলের মত ছানাটি পরম নির্ভয়ে বসে থাকে।

বৃদ্ধা বলে, সুলক্ষণ।'

বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'কিসের?'

'এই ভ্যাশের।'

এর পর উঠতে চাইলে বিপ্রপদকে অনুরোধ করা হয় রান্না করে আহার করতে। নিতাই ইমামকেও যত্ন করতে ত্রুটি হয় না। বৃদ্ধার প্রস্তাব বাড়ীর সকলেরই খুব ভাল লাগে। তারাও ঝুঁকে পড়ে।

কিন্তু তা আজ সম্ভব না। আর এক দিন হবে বলে সবাই উঠে পড়ে। বাবুর সংগে সংগে লোকজন চলে যায়—যেন রাজসভা ভেঙে গেল।

বৃদ্ধা আর একটা ছড়া আওড়ায়। ক্ষণিকের জন্য আঁধার ঘরে আলো জ্বলল, আবার খানিক বাদেই তা মিলিয়ে গেল। যাক্, তবু সে চোখ বোঁজার আগে তো আলো দেখল! আলো, আলো!

বিপ্রপদকে নিয়ে কয়েকটা বাগান ছাড়িয়ে, কয়েকটা গোশালা ডাইনে রেখে, একটা তিন কোণা ধানের ক্ষেতের পশ্চিম দিকের বাড়ীতে ইমাম ও নিতাই প্রবেশ করে।

আশ্চর্য, বাড়ীর ভিতর জনপ্রাণী নেই। তিন ভিটিতে তিনখানা ঘর শূন্য পড়ে রয়েছে। কিন্তু মানুষের যে বাস আছে তা বোঝা যায় ঘরের পোতার পাশের লংকা ও বেগুন গাছ কটি দেখলে। অসংখ্য লংকা ফলেছে, বেগুন ঝুলছে অগুণতি।

'এ-বাড়ীর বাসিন্দারা গেল কোথায় ?'

পুরুষেরা জেলে গেছে—মেয়েরা ভিক্ষায় বেরিয়েছে।' নিতাই বলে, 'আজ চার বছর হয় এদের জেল হয়েছে।'

'এদের কাছে খাজনা পাওনা ক সন ? জেলে গেল কেন ?'

'আপনি তো জানেন—খুনের দায়।'

'এক দেশে বাড়ী, জানি সবই, কিন্তু সব কথা তো স্মরণ থাকে না।'

'এদের দাইমূল হয়েছে—অর্থাৎ কালাপানী। ভিটে-মাটি এরা ছাড়া, কিন্তু দোষ এন্তেজদ্দির।'

ইমাম বলে, 'ঐ শালাই তো যত নষ্টের মূল।'

নিতাই বলে, 'হিন্দুর মধ্যে ঘোষালেরা, আর মোছলমানের মধ্যে এন্তেজদ্দিই দেশে আগুন জ্বালায়। ঘোষালেরা জমি দখল করতে পারেন না, নিলামী জমি। নিলাম কবলা দিয়ে দেয় এন্তেজদ্দিকে। সে এদের সরল সাহসী মানুষ পেয়ে মুখে মুখে কবুলিয়ৎ নেয়, কাগজে কলম ছোঁয়ায় না পাছে ওদের স্বত্ব হয়। আশ্বাস দেয়ঃ কবুলিতে এখন কাজ কি, জমি দখল করে দিতে পারলে পাঁচ বিঘে বর্গা না দিয়ে কয়েমী পাট্টা দিয়ে দেবে বিনা সেলামিতে। খরচ-খরচা এন্তেজদ্দির, গায়ের জোর আহম্মকদের। বিপক্ষও খুব তেজীয়ান্। দুদল নামল জমিতে। খুন হলো দুটো।

পয়সার জোরে এন্তেজদ্দি এড়িয়ে গেল, কিন্তু দুদলের আর একটিও

এড়াতে পারল না। টাকা এবং তদ্বির হলে এ পক্ষের লোক খালাস পেত —কিন্তু এন্তেজদ্দি বুঝল, এরা খালাস হলে জমি লিখে দিতে হবে। সে পয়সার থলেটার গলা বেঁধে চুপ করে আসমানের তারা গুণতে লাগল। দিনের পর দিন যায়, জেলের গরাদে ওরা মাথা ঠুকে মরে—এন্তেজদ্দি সহরমুখো হয় না। বাড়ী বসে মেয়েলোকদের শুধু আশ্বাস দেয়ঃ এই তো এলো বলে! ভাবনা কি, পাঁচ বিঘে জমি দেবে, তার পাকা ফসল ওরা এসে নিজের হাতেই কাটবে। কোথায় ওরা আসবে? জজের বিচারে ওদের সাজা হয়েছে।

ইমাম বলে, 'কে আছে, কে মরছে, কোনও চিঠি-পত্তর পায় না—মাইয়ালোক সোমাচার রাখে না কিচ্ছুর। যদি ওরা বাড়ী থাকতো, ঘর-দুয়ারের কি এই হাল হয়! আর কবুল করা জমি না দিয়া পারে এন্তা? এক রাত্তিরে জাহান্নামে পাঠাইত ওরে!'

বিপ্রপদ ভাবেন; ওদের খাজনা মকুব করে দিতে হবে, যত দিন না ওরা বাড়ী ফেরে। মুখে বলেন, 'চলো নিতাই, চলো ইমাম, আজ বাড়ী চলো—এখানে আর দাঁড়ান যায় না।'

খালটা পার হওয়ার আগেই একটা বাধা পড়ে। একটী ঘোমটা-টানা মেয়েলোক এক প্রকার ছুটতে ছুটতেই আসে। হাতে তার একখানা ছোট ডালা—তাতে কয়েকটি লংকা ও বেগুন কুড়ি তিনেক। মনিবকে সে উপহার দেবে।

'না, না, ও দিতে হবে না। তোমরা বেচে দুটো পয়সা পেলে তোমাদের কাজে লাগবে। দুঃসময়ে ও জিনিষও তোমাদের পক্ষে কম নয়।'

কিন্তু সে শুনবে না—দাঁড়িয়ে থাকে।

'নিয়ে যাও বলছি—নিয়ে যাও ফিরিয়ে।'

সে বলে যে তার গাছে আরও ফলবে, কিন্তু মনিব তো নিত্য আসবে না!

'তাতে হয়েছে কি? তুমি নিয়ে যাও গো—ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

না, নতুন মালিককে সে শুধু-হাতে ফিরতে দেবে না কিছুতেই।

'কিছুতেই যখন ছাড়বে না তখন নিয়ে এসো নিতাই। ওদের দুঃখের ফসল আমি উপেক্ষা করলে ওরা আরও দুঃখ পাবে।'

একে একে আরও দুটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ায়। সকলের মিলিত নিবেদনই ঐ ফলগুলি।

বিপ্রপদ চলে যান।

খালের পারে তিনটি অশ্রুমুখী স্ত্রীলোক নীরবে দাঁড়িয়ে কি যেন আর্জি পেশ করে নতুন ভূস্বামীর কাছে।

২৭
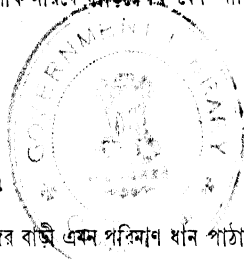
বাড়ী এসে বিপ্রপদ খুনী আসামীদের বাড়ী এমন পরিমাণ ধান পাঠান—যা ভেনে-কুটে ওরা স্বচ্ছন্দে তিনটিতে খেয়ে থাকতে পারে ধানের জমা ঠিক রেখে। এই গেল প্রথম ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—তালুকটার আদায়-উসুলের ভার পড়ে নিতাই ও ইমামের ওপর। দুজনে মিলে-মিশে কাজ করবে, দূর থেকে উপদেশ দেবেন বিপ্রপদ। নিতান্ত জরুরী প্রয়োজনে বুদ্ধিদাতা রহিল ইছমাইল মিঞা। কারুর ওপর যেন অত্যাচার না হয়, কেউ যেন কখনও নালিশ করতে না পারে মনিবের কর্মচারীর বিরুদ্ধে। সামান্য তালুক, লাভের আশায় এ তালুক খরিদ করা হয়নি—খরিদ করা হয়েছে প্রতিষ্ঠার জন্য তা যেন বিফল না হয়। এমনি আরো অনেক উপদেশ দিয়ে নিতাইকে সাধারণ ভাবে কাগজ-পত্র বুঝিয়ে দেন বিপ্রপদ। শিবপদ ও দেবপদকে তিনি এর মধ্যে আনেন না, কারণ দোষ হলে ওদের তিরস্কার করা যাবে

না—করলে হয়ত তা কালে কালে গৃহবিবাদে পরিণত হবে। তারা সংসারের দশটা পাঁচটা যে কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে তাই নিয়েই থাক। তারাও মনিব, দূরে বসে সেলাম পাবে এই ভাল।

ছুটি শেষ হয়ে গেছে—বিপ্রপদ আবার নায়ে ওঠেন, কার্যস্থলে যাবেন।

মধ্য রাত্রে ষ্টীমার ঘাটে এসে থামে, সে একটা বড় বন্দর। আজ এখানে অনেক সময় ষ্টীমার থামবে কারণ একটা কল বিগড়ে গেছে। সেটা না মেরামত হলে খুলতে পারবে না ঘাট থেকে। আজ কেন জানি ষ্টীমারটা একরকম খালি। এখানে তেমন যাত্রীও ওঠেনি। বিপ্রপদর ঘুম ভেঙে গেছে, আর ঘুম আসতে দেরী আছে অনেক। তিনি মাঝে মাঝে উঠে পায়চারি করছেন ডেকে। আবার গিয়ে শুয়ে পড়ছেন বিছানায়। দুমদাম করে হাতুড়ির ঘা পড়ছে তবু বিকল লোহার পাঁজরটা অবিকল হচ্ছে না। মুস্কিল, এ ভাবে কতক্ষণ কাটবে? তেমন কেউ যাত্রী থাকলেও বসে বসে আলাপ করা যেত। যে কজন আছে তারা লেপ মুড়ি দিয়েছে শীতের রাত্রে।

রেলিংয়ের পাশে গিয়ে দেখেন আকাশ একবারে নির্মল, নীচের জলও তেমনি। সহস্র সহস্র তারায় আকাশ একাকার। যেন সাদা ফুলের ফুলঝুরি। কিন্তু হিমেল হাওয়ায় যেন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নদীর জল সময় সময় ছলছল করে উঠছে। এই তো অনন্ত-বিস্তৃত আকাশ—এর নীচে নদীটা কতটুকু! আবার নদীটার তুলনায় জাহাজটা কত ছোট! সেই জলযানের তুলনায় আরোহী বিপ্রপদ? নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ঐ আকাশের মত সুদূরপ্রসারী। জীবনের শেষ পর্যন্ত বিপ্রপদ তা অতিক্রম করতে পারবেন কি না সন্দেহ। তবু তাঁকে ছুটে চলতে হবে। আশা বুকে নিয়ে বল্গাহীন অশ্বের মত উধাও ধেয়ে। দেখতে হবে সীমানা। তিনি ক্ষুদ্র কিন্তু তাঁর আশা অসীম। এ আশা না দুরাশা? কেন দুরাশা হতে যাবে? তিনি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন—

খড় বিচালী কাটাতেন, আজ তিনি কোথায়? কত দূর এগিয়ে গেছেন। আরো এগিয়ে যাবেন—আরো—আরো।

আবার নদীর জলের ছলছলানি শুনতে পাওয়া যায়—সেই তালে তালে বিপ্রপদর হৃদয়ও নাচতে থাকে।

একটা মর্মন্তুদ চীৎকারে বিপ্রপদ চমকে ওঠেন।

এ প্রাণহানির আশংকায় আর্তনাদ নয়—তার চেয়েও যেন বৃহত্তম ক্ষতির আশংকার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য করুণ আকুতি। আবার সেই চীৎকার! বিপ্রপদ সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে ছুটে যান। কোন্ দিক দিয়ে শব্দ এলো? মনে হয় স্ত্রীলোকের করুণ কণ্ঠ। কেবিনটার মধ্যে না ফ্ল্যাটের ও-পাশে? বিপ্রপদ ছুটে গিয়ে এক ধাক্কায় কেবিনটার দরজা খুলে ফেলেন, সেখানে একটা বুড়ো খালাসী শুয়ে। এখানে তো না। তবে শব্দটা এলো কোত্থেকে? তিনি ফ্ল্যাটের ওপর যেতে পারেন না, এর মধ্যে একটি যুবতী ফ্ল্যাট ও জাহাজের যোগাযোগের সিঁড়ির ওপর এসে হুড়মুড় করে পড়ে। সে আর্ত কণ্ঠে হিন্দুস্থানী ভাষায় বিপ্রপদকে তার মান সম্ভ্রম রক্ষা করতে বলে, জড়িয়ে ধরে পা। কিছুক্ষণের জন্য তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন।

তিনি হিন্দি কথা বোঝেন না, কিন্তু বিষয়টা অনুমান করে বুঝে উঠতে তার বেশী সময় লাগে না। তিনি স্ত্রীলোকটিকে পিছনে রেখে সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে দুটো রেলিং চেপে ধরে সতেজে দাঁড়ান। একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক তাঁর সমুখে এসে বাধা পেয়ে মারমুখো হয়ে রয়েছে। তাদের চেহারা দেখলে বোঝা যায় তারা রিক্সাওয়ালা, কুলী অথবা সহুরে জুয়াড়ী হবে। এক দল কাপুরুষ সামান্য একটা মেয়েমানুষের ওপর হানা দিতে জুটেছে।

'বাবু, রাস্তা ছেড়ে দিন—ওকে সায়েস্তা করতে হবে। ও আমাদের

একটা মনিব্যাগ নিয়ে পালিয়েছে।' ভিড়ের মধ্যে লোকটাকে ঠিক চেনা যায় না।

'তোমরা শাসন করতে কে? নিয়ে থাকে পুলিশে খবর দাও।'

'ছাড়ো ছাড়ো বাবু, তোমার দেখি বড্ড দয়া। রাঙা মুখ দেখেছ বুঝি?' দলের ভিতর থেকে একটা ছোকরা বিদ্রূপ করে, 'বাবু রাঙা মুখ দেখেছে!'

তার কথায় সায় দিয়ে দলের বাকী লোকগুলো হেসে ওঠে। 'ছাড়ো বাবু, এখনও মান থাকতে থাকতে পথ দাও। কেষ্টা এসে পড়লে তোমার আর রক্ষা থাকবে না। সামান্য একটা পাগলীর জন্য অপমান হবে। সরে দাঁড়াও, পথ দাও।' তারা দু তিন জন এগিয়ে আসে কিন্তু বিপ্রপদর চোখের দিকে চেয়ে আবার সভয়ে পিছিয়ে যায়।

ষ্টীমারের এক জন কেরাণী বিপ্রপদকে সাবধান করে, 'দেখুন মশাই, ওরা সহুরে গুণ্ডা-গাড়োলের দল—ওদের সংগে আপনার ঝগড়া সাজে না। আপনি ভদ্রলোক, আপনার ঝামেলায় কাজ কি, পথ ছেড়ে দিন।'

'প্রাণ গেলেও আমি তা পারি নে। শিয়াল-কুকুরের কামড়ের ভয় করলে তো আর সংসারে থাকা যায় না।

বিপ্রপদ জাহাজে ফিরে আসেন। উপস্থিত লোকগুলো, বিশেষত কেরাণীটা সিংহ দেখলে মানুষ যেমন সভয়ে পিছিয়ে যায় তেমনি সরে গিয়ে বিপ্রপদকে পথ করে দেয়। এমন দুর্জয় সাহসী পুরুষ এ পথে সে এই বত্রিশ বছর চাকরীর বয়সে আর দেখেনি। ঐ গুণ্ডাগুলো সুবিধা পেলেই যাত্রীদের ওপর কত অত্যাচার করে, অন্যায় ব্যবহার করে, কিন্তু এমন প্রত্যুত্তর কাউকে কখনও দিতে দেখেনি, বা শোনেনি। মনে মনে সে সন্তুষ্ট হয় খুবই কিন্তু আশংকা করে যে এর জের এত সহজে মেটবার নয়।

'কি রে, কোন শালা রোখে আমাদের?' বলে কেষ্টা এসে একটা ধাক্কা দেয়।

বিপ্রপদ দপ্‌ করে জ্বলে ওঠেন, 'দাঁড়া হারামজাদা পাজির দল। যাকে তাকে যা-তা বলা।' তারপর তিনি দুটোর চুল ধরে ঠেলতে ঠেলতে সমস্ত দলটাকে ফ্ল্যাটের ওপর নিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে নদীতে ঠেলে দেন। দু একটা লোহা-লক্কড় দড়ি-কাছি ধরে থাকে—অপরগুলো নদীতে পড়ে হবুডুবু খায়।

বিপ্রপদ কেবিনে ফিরে গিয়ে দেখেন যে তাঁর বিছানার কাছে একটা কোণে সেই মেয়েলোকটি বসে আছে। দুয়ারে শব্দ হতেই সে সভয়ে পিছিয়ে যায়। বিপ্রপদকে দেখে সে আশ্বস্ত হয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে এসে নত নেত্রে বসে থাকে।

এতক্ষণ পরে বিপ্রপদ দেখেন যে, এ অগ্নি-কণিকা। ধোপার মেয়ে যূথীর হাসিতে আগুন আছে—আর এর সারা দেহে আগুন। এ আগুনের কাছে এলে যেন কাউর রক্ষা নেই!

'তোমার নাম?'

'লোকে বলে পাগলী। কিন্তু, মেরে নাম মালা।'

'তোমার বাড়ী কোথায়? বেশ বাঙলাও জানো, হিন্দীও বলতে পারো!'

'মেরে ঘর হিন্দুস্থান।'

'পশ্চিম দেশে? এখানে এলে কি করে?'

'বনমে জংগলমে জলমে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে চলা আয়া।'

বিপ্রপদ অর্থ বুঝতে পারেন না, মনে করেন পাগল না হলেও এ মেয়েটার মাথার ছিট আছে! হয়ত বা পাগলই নাকি তাই বা কে জানে! 'কি বললে?'

'বনে জংগলে পাহাড়ে জলে খুঁজতে খুঁজতে এসেছি।'

'কি খুঁজতে খুঁজতে এসেছ?'

'ইয়াদ নেহি বাবুজী, ইয়াদ নেহি!'

'মানে ?'

পাগলী অর্থ করে দেয়। 'মনে নেই বাবুজী, মনে নেই।'

'খুঁজে বেড়াচ্ছ অথচ মনে নেই, এ তো বড় অদ্ভুত কথা! সাধে তামাকে লোকে পাগলী বলে। তুমি এমন সুন্দর বাঙলা শিখলে কি করে ?'

'শুনতে শুনতে।'

'শুনতে শুনতে তো বুঝলাম, কিন্তু এখানে এলে কি করে ?'

'আয়া পায়দলসে।'

'মানে পায়ে হেঁটে ? কত দূর থেকে মালা ?'

'কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় ঘুমকে বাঙলামে আয়া, তভি ভেট নেহি মিলা।'

'কাশী থেকে আসছ এখন কোথায় যাবে ?'

'আপনার সংগে।'

'এ কি বিপদ! আমি যাবো কোথায় সমুদ্রের ধারে, থাকব একা একা একটা কাছারিতে, তুমি সেখানে যাবে কি করে ? আমার সংগে কান স্ত্রীলোক নেই, তুমি থাকবে কি করে ?'

সে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় স্বরে জবাব দেয়, 'আমি যাবই বাবুজী, নিশ্চয় যাবো আপনার সংগে।'

বিপ্রপদ মনে মনে ভাবেন: আসমানতারাকে দিয়েই যথেষ্ট তাঁর শিক্ষা হয়েছে। দাঁত ভেঙেছে, আর ও-ঝামেলায় কাজ নেই। একটু একটু শীত করছিল, তিনি গায়ের কাপড়টা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়েন। বেশী অন্তরংগতা ভাল না। তা হলেই ঘাড়ে চাপবে। আর বিপ্রপদর এমন ভাগ্য, তাঁর জন্য যত আপদ রাস্তা-ঘাটেও বসে থাকে। তিনি চোখ বুঁজে ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকেন। যদি মেয়েলোকটি আপনা থেকে চলে যায় তবে খুবই ভাল হয়। কিন্তু তিনি নিজের মুখে ওকে নেমে যেতে বলবেন কি করে ? আর ও যাবেই বা কোথায় ? এখানে নামলে যে

বিপদের মুখ থেকে ওকে রক্ষা করা হয়েছে, সেই বিপদের কবলেই কি ওকে ঠেলে দেওয়া হবে না? যাক, তিনি চুপ করে থাকবেন—ও যা ভাল বোঝে করবে। বিপ্রপদ নির্লিপ্ত থাকলে ও আর সাহস পাবে না কাছে ঘেঁসতে।

সময় কতক্ষণ অতিবাহিত হয় বলা যায় না, বিপ্রপদও ঘুমাতে পারেন না, পাগলীও নড়ে না।

সিঁড়িতে ভারী বুটের শব্দ হয়। সেই ষণ্ডা ছোকরাগুলোর সংগে এক জন পুলিশ অফিসার এসে কেবিনে হাজির হয়, জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি না কি একটি স্ত্রীলোককে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'কে বলল এ সব কথা?'

'এই তো এরা।'

'এদের কথা আপনি বিশ্বাস করছেন? ঘটনাটা শুনুন, জাহাজের খালাসী থেকে কেরাণী পর্যন্ত প্রত্যেকেই জানে, আমি একে রক্ষা না করলে এমন একটা ঘটনা আপনাদের এলাকায় ঘটত আজ যা সকলের পক্ষেই লজ্জাজনক।'

'কি বলুন তো?'

'ওই ওর মুখেই শুনুন, পরে সাক্ষী-সাবুদ নিতে পারবেন।'

'তোমার নাম কি?'

'মেরে নাম মালা।'

মালা সব খুলে বলে। পুলিশ-কর্মচারীটি নিবিষ্ট মনে বর্বরদের অসৎ উদ্দেশ্যের কথা শুনে যায়। তারপর সে বলে, 'তুমি এখন কোথায় যাবে?'

'যাবো বাবুর সংগে।'

বিপ্রপদ বাধা দেন। 'না, না, আমার সংগে যাবে কোথায়? বাবুর সংগে থানায় যাও। আর কোন ভয় নেই তোমার—বাবু তোমায় রক্ষার সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'না, আমি আপনার সংগে যাবো।'

'যাবো বললেই যাওয়া হলো! আমি যাবো কোথায় তার নেই ঠিক-ঠিকানা, তুমি যাবে কি করে সেখানে? আমি একা পুরুষ মানুষ!'

মালা চুপ করে বসে রইল, তার নড়া-চড়ার ইচ্ছা নেই।

পুলিশ-কর্মচারীটি একটু মুখ টিপে হেসে চলে যায়।

কেবিনের বাইরে গিয়ে ধমক ছেড়ে গুণ্ডার দলটাকে শাসায়। 'দাঁড়া শালা, তোদের দেবো খেলাপে মিথ্যা মামলার দায়। চিনিস আমাকে—আমার নাম রুদ্র সেন!'

বিপ্রপদ মহা বিরক্ত হয়ে আবার শুয়ে পড়েন। এই মেয়েটাকে নিয়ে তিনি কি করবেন? সংগে অন্য কোন স্ত্রীলোকও নেই যে তার আশ্রয়ে ওকে নিয়ে যাবেন। লোক উঠবে নামবে তাদের শাণিত দৃষ্টির কাছে এই বিদেশিনীর কি পরিচয় দেবেন? পরনে ওর ঘাগরা, গায় ওড়না—ও এদেশী লোকের কাছে রীতিমত প্রশ্নের ও কৌতূহলের সামগ্রী। বিপ্রপদ সে কৌতূহল ও প্রশ্ন দমন করবেন কি দিয়ে? ওকে যে-কোনও ভাবে এড়াতেই হবে! সেই এড়াবার ফন্দিটাই তিনি মনে আঁটতে থাকেন। ফাঁকি দিয়ে ষ্টীমারে রেখে গেলে কেমন হয়? কিন্তু সে সুযোগ কি ষ্টীমারে থেকে নামবার পূর্বে হবে? ততক্ষণ ওর জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়? বিছানা থেকে একটা চাদর ও কম্বল টেনে এনে ওর হাতে দিয়ে বলেন, 'মালা কেবিনে গিয়ে শুয়ে থাক।'

'আগে ষ্টীমার ছাড়ুক।'

বিপ্রপদ মনে মনে বড় বিরক্ত হন। জ্ঞানের নাড়ী তো বেশ টনটনে—পাগল বলে কে? এমন অদৃষ্টের ফের, কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ঝামেলা সইতেই হবে।

ঘণ্টা পড়ে, ষ্টীমারও ছাড়ে।

মালা ধীরে ধীরে উঠে স্ত্রীলোকের কেবিনে চলে যায়।

ওর এই সুবুদ্ধিতে বিপ্রপদ খানিকটা স্বস্তি বোধ করেন।

তখন পর্যন্ত ভোর হয়নি। জনবিরল জাহাজের কেবিন থেকে একটা সুন্দর হিন্দী গানের কলি কে যেন সুমধুর কণ্ঠে গেয়ে যাচ্ছে। বার বার একটা গানই একই মাধুর্য দিয়ে সে গাইছে। ওর গানের ঝংকারে ঘুম ভাঙল বিপ্রপদর। আকাশের অন্ধকার ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিপ্রপদর কাছে গানের কোন অর্থই পরিষ্কার হচ্ছে না। কিন্তু কি মিষ্টি গলা, যেন মধু ঝরছে। তিনি কেবিনের বাইরে এসে দেখেন যে, জাহাজের হিন্দুস্থানী জমাদারটা তার ঝাড়ু বন্ধ রেখে, গানের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে। মালা গান গাইছে আর জমাদারটা যেন তার দেশে বসে শুনছে! বিপ্রপদ কোনও অর্থই বুঝতে পারেন না, তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে জমাদারটার কাছে এসে দাঁড়ান। জমাদারটা কেবলি মুচকি হেসে মাথা নাড়ে। একমাত্র সেই সমঝদার—এমনি একটা গর্বের ভাব তার ভংগিতে। মালা থামে না, ভোরের হাওয়ায় মধু ঝরতে থাকে, ওরা ক্রমে ক্রমে তন্ময় হয়ে যায়।

গান থামতেই বিপ্রপদ সহজে আত্মসম্বরণ করে নিজের জায়গায় এসে বসেন। বাস্তব সমস্যায় তাঁকে বিব্রত করে তোলে। মালা তার কাছে একটা জ্বালার মত বোধ হতে থাকে। তিনি গত রাত্রির ঘটনা উপেক্ষা করে অন্যান্য সকলের মত শুধু দর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকলে এ কণ্টক তাঁর গন্তব্য পথে এসে বিঘ্ন জন্মাত না। যা হবার তা হয়েছে, এখন কি উপায়ে তিনি এ কাঁটা তুলবেন?

'নমস্তে বাবুজী—সুপ্রভাত!'

'মানে? তুমি এখানে কি চাও? কেবিনে যাও।'

'ম্যয় ভুখা হুঁ।'

এবার বিপ্রপদ কিছুই বুঝতে পারেন না। তিনি কি মালার ইয়ার্কির পাত্র নাকি? তিনি গম্ভীর হয়ে থাকেন—কি মুস্কিলেই পড়েছেন!

সেই সময় জাহাজের কেরাণী এসে বলে, 'মশাই ওর ভাড়াটা ?'

'আমার কাছে চাইছেন কেন ?'

'তবে কার কাছে চাইব ? আপনি ওকে নিয়ে এলেন, আবার নিয়েও যাচ্ছেন আপনি ওকে, ভাড়া দেবে কি কোম্পানী ?'

'উপকার যে করে তাকেই বুঝি বাঘে খায় ?'

'আমি তো আগেই বলেছিলাম, আপনি ভদ্রলোক, আপনার ও-সব ঝামেলায় কাজ নেই।'

'তা হলে আপনার মতে ভদ্রলোকের ঝামেলা করে নিরীহ স্ত্রীলোককে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচান উচিত নয় ?'

চোখ দুটো একটু পিট-পিট করে কেরাণী উত্তর খুঁজে বলে, 'এ-ও তো একপ্রকার কোম্পানীর অত্যাচার। আপনি ভদ্রলোক অসহায় স্ত্রীলোকটিকে বাঁচান, আমাকেও রক্ষা করুন—ওর ভাড়ার টাকা কটি দিয়ে দিন।'

'কত ভাড়া ?'

'আপনার গন্তব্য স্থান ?'

'তার সংগে ওর সংস্রব কি ? ও কোথায় যাবে ?'

'এই, তুমি যাবে কোথায় ?'

'বাবুর সংগে।'

আবার চোখ পিট পিট করে কেরাণী হাসতে থাকে। বলে, 'এখন দিয়ে দিন, যত ঘাঁটবেন তত পাঁক উঠবে। বলতেই বলে, স্ত্রীষু দুষ্কুলাদপি —অর্থাৎ স্ত্রীলোক ভয়ানক দুষ্ট। তাদের মর্জি বোঝা দায়। এই তো, আমারও মশাই ঘরে একই জ্বালা—আজ পর্যন্ত তার যে কি অভিরুচি তাই বুঝলাম না। প্রায় এই কুড়ি বছর সংসার করছি, মশাই, তার মন পেলাম না। বাঁকাবাঁকা—এমন বাঁকা যে একেবারে চলতি-সাপের মত বাঁকা।' সে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে রসিদ বইটা খুলে ফেলে।
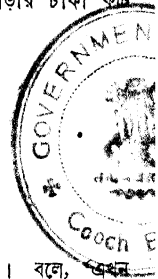
এ সব কথা বিপ্রপদর মোটেই ভাল লাগে না। তিনি একখানা পাঁচ টাকার নোট কেরাণীর হাতে দিয়ে নিজের গন্তব্য স্থানের নাম করেন। বাকী পয়সা মালার হাতে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই কিনে খেতে নির্দেশ দিয়ে চুপ করে থাকেন।

কিছুক্ষণ বাদে মালা ফিরে আসে, তার হাতে একঘটি জল। ঘটিটা বিপ্রপদরই। 'বাবু, মুখ-হাত ধোবেন না, অনেক বেলা হয়েছে, কিছু খাবেন না? আমি যাই, চা নিয়ে আসি।'

'আমার চোদ্দ পুরুষেও চা খায়নি, আমি তো দূরের কথা।'

'চা খান না, তবে খাবেন কি?'

'কিছুই খাই নে সকাল বেলা—আমার সন্ধ্যাহ্নিকও বাকী।'

'সামনের ষ্টেসনে জাহাজ ভিড়লে দুধ কিনে আনব, আর কলা?'

'তুমি খেলে আনতে পার, আমার ও-সব লাগবে না।'

'তবে কি খাবেন আপনি?'

'আঃ, আমাকে বিরক্ত করো না, তোমার কাজে যাও।'

সরলা বালিকার মত মালা বলে, 'আমার তো কোন কাজ নেই বাবুজী।'

'তবে যা ইচ্ছা তাই করো।'

মালা একটু সাহস পেয়ে যেন বলে, 'তবে যাই, নিয়ে আসি দুধ-কলা কিনে।'

ঘাগরা ঘুরিয়ে ও মোড় ফিরে চলে যায়।

বিপ্রপদর মনটা একটু হাল্কা হয় মালার সারল্যে।

বাস্তবিকই অনেক বেলা হয়েছে, কিছু ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। তিনি গামছাখানা নিয়ে নীচে নেমে যান। ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি ফিরে এসে দেখেন যে, মালা কেবিনের মধ্যে সব প্রস্তুত করে রেখেছে। সব অর্থে —দুধ ও কলা। এর বেশী এখানে কিছু খেতে পাওয়া যায় না।

এবার আর ছেলেমানুষের মত খাবার জিনিষের ওপর বিপ্রপদ রাগ করতে পারেন না, কারণ মালার ওপর থেকে বিরক্তি অনেকটা শিথিল হয়েছে। তাকে এখন অনেকটা সহ্য হয়ে আসছে। ওর ব্যবহারটা মন্দ না!

কিন্তু তবু বিপ্রপদকে মালার সংগ ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে এই মালা এক দিন তাঁর কণ্ঠের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। আসমানতারা কি তাঁকে কম দুঃখ দিয়েছে! ভুগিয়েছে কম! কিন্তু মালা যাবে কোথায়? কোথায় যাবে, সে প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁর কাজ কি? একটা ভবঘুরে মেয়েলোক ঘুরতে ঘুরতে যেখানে ইচ্ছা চলে যাক—তাঁর তাতে মাথা ব্যথা কেন!

দিনটা কোন প্রকারে কাটে। সন্ধ্যার একটু আগে ষ্টীমার ঠিক জায়গায় এসে থামে। বিপ্রপদ নিজের বাক্স ও বিছানাটা ঠিক করে নেন। এইবার কোন প্রকারে ওকে এড়িয়ে নেমে গয়নার নৌকায় চাপতে পারলেই হয়। তিনি একটা কুলির মাথায় জিনিষগুলি দিয়ে একটু পাশ কাটিয়ে যেতে পারলেই ব্যস! কিন্তু কুলী তো আসেনা। কুলীর সন্ধানে তিনি নীচে নেমে যান।

কেবিনে ফিরে এসে তিনি দেখেন যে, তাঁর বাক্স বিছানা নেই—সব উধাও হয়েছে। বাঃ, আশ্চর্য কাণ্ড বটে! তিনি ত্বরায় নীচে নেমে যান। চুরি হয়ে গেল নাকি? কিন্তু তার নাম লেখা বাক্স এই প্রকাশ্য দিবালোকে চোরে চুরি করাও তো সহজ নয়। তবে হলো কি?

সিঁড়ির কাছে মালা দুহাতে দুটো বোঝা নিয়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে।

শীতকালেও বিপ্রপদ যেন ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠেন। মালার মুখের দিকে চেয়ে তিনি শুধু 'চলো' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন না।

প্রায় একটা বছর গত হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও অমরেশ ও বিনুর তেমন কোনও ভাল পড়ার ব্যবস্থা কমলকামিনী করতে পারেননি। স্বামী ও দেওরদের এদিকে লক্ষ্য নেই একেবারেই। দিন দিন অমরেশের উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়েই যাচ্ছে। কমলকামিনী মনে মনে প্রমাদ গণেন! পড়াশুনোর নাম অমরেশ করে না, কেবল পাখীর ছানা শিকার, মাছ-ধরা এবং খেলা নিয়েই ব্যস্ত। বাড়ীর পণ্ডিত তাকে শাসন করতে পারে না। বিনু একটু সভ্য শান্ত ছিল, ভয়ও ছিল বেশ, কিন্তু অমরেশের উপদেশে সে ইঁচড়ে পাকতে সুরু করেছে। এ সব বাড়ীর পুরুষদের দৃষ্টি এড়ালেও কমলকামিনীর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তিনি শিবপদকে একজন ভাল শিক্ষক খুঁজে আনতে বলেন। অনেক চেষ্টার পর একটি লোক জোটে। সে দুর্দান্ত অমরেশকে বাধ্য করার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে। লোকটি বেশ বুদ্ধিমান।

'অমরেশ, তুমি রামায়ণ মহাভারত পড়েছ?'

'না।'

'বিনু?'

'উঁহুঁ।'

তবে আমি পড়ি, তোমরা শোন। তার পর বুঝিয়ে দেব গল্প।'

গল্পের কথা শুনে বোসের বাড়ীর দু'টি দুর্দান্ত শিশু সভ্য শান্ত হয়ে বসে। তাদের এই কৃত্রিম সংযমটা অনেকের চোখেই হাস্যকর বলে ঠেকে।

পণ্ডিতটি সুর তাল মান দিয়ে ললিত কণ্ঠে ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দ পড়ে যায়। কখনও ভাবাবেশে বিভোর হয়ে পড়ে সে, কখনও তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামতে থাকে। বিগলিত শুভ্র জ্যোৎস্না-ধারার মত এই অমর কাব্যধারা দিকে দিকে গলে ঝরে পড়ে! নাটমন্দির, পূজা-

মণ্ডপ অনুরণিত হয়ে ওঠে। বৌরা, মেয়েরা হাতের কাজ ফেলে কমল-কামিনীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে এক মনে শুনতে থাকে।

জনম-দুঃখিনী মা জানকীর দুঃখে, পুত্রহারা গান্ধারীর শোকে এমন যে দস্যু অমরেশ, তারও দুচোখ বেয়ে জলধারা নামতে থাকে। বিন্দুও কাঁদে।

দূরে বসে কমলকামিনীরও এ দৃশ্যে হৃদয় সজল হয়ে ওঠে।

এমনি ভাবেই কিছু দিন কাটে। কমলকামিনী নিশ্চিন্ত মনে সংসার করতে থাকেন। তিনি মেয়েমানুষ হয়ে যতটা ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, আপাতত তাই যথেষ্ট। অমরেশ গল্পের লোভে পড়ায় মন দিয়েছে। সামান্য একখানা পাঠ্য পুস্তক থেকে রামায়ণ মহাভারত কম নয়। এখন একটু অংক আর ইংরেজী শিখলে যে কোনও ইস্কুলে উঁচু ক্লাশে ভর্তি করা যাবে। আর নানাবিধ নীতিকথা পড়ে ওর মনটা নরম হবে, মেজাজটাও বদলাবে নিশ্চয়।

তাঁরা আর কি পড়েছেন। ঐ পর্যন্তই তো বিদ্যা। কিন্তু তাতেই তো সংসার চলছে। ছেলেদের একটু পাশ-টাশ করা দরকার। আর একটু বড় হলেই তিনি যাঁর ছেলে তাঁর গলায় গেঁথে দেবেন। তখন তিনি একটা কিছু ব্যবস্থা না করে কি চুপচাপ থাকতে পারবেন? মোটের ওপর কমলকামিনী অমরেশের যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট এখন।

কিন্তু সহসা একদিন কাল-বোশেখীর মত সোনালী এসে সব ওলট-পালট করে দেয়। একাগ্রচিত্ত অমরেশকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার পুঁথি পুস্তক থেকে। জানকীর অশ্রু, গান্ধারীর বিলাপ তাকে আর কিছুতেই আটকে রাখতে পারে না। বাঁধা পশু দড়ি ছিঁড়লে যেমন উন্মত্তের মত খানিকটা ছুটোছুটি করে, তেমনি করতে থাকে অমরেশ ও সোনালী।

যে অমরেশ একপ্রকার শীতলাতলার বাগানের কথা ভুলেই গিয়েছিল, সেই ভোর না হতে সেখানে গিয়ে হাজির। অন্ধকারে গা একটু ঝম্‌ঝম্‌ করে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। ফুল তোলার নামে ছুটিতে বাগান উজাড় করে ফেলে। একটি কুঁড়ি পর্যন্ত অপর কেউ এসে পায় না। কমলকামিনী প্রতিবেশীদের নালিশে নালিশে অস্থির। ছেলেকে চোখ রাঙালে ফেরে না, মারলে বোঝে না—এ এক বিষম জ্বালা!

একদিন কমলকামিনী বলেন, 'দাঁড়া, তোকে পাঠিয়ে দেবো কলকাতায় তখন বুঝবি কেমন মজা।'

'বেশ তো, দাও না পাঠিয়ে। রেলগাড়ী চড়ে যাবো দিদির কাছে—দিব্যি হুস হুস করে।'

'দিদিকে চিনিস, একটু বেয়াড়াপনা করলেই মার!'

'মারুক দেখি আমাকে কার সাধ্যি? আমি কি কারুর ভাতে, না কাপড়ে?'

'কথা তো শিখেছিস খুব অর্থ বুঝিস আর নাই বুঝিস!' কমলকামিনী বলেন, 'তুই ও-বাড়ীর সোনালীর সংগে মিসতে পারবি নে কিছুতে। ও-দিক মাড়ালে দেব পা ভেঙে!'

'কেন?'

'ওটা মেয়ে তো না, পাঁচু ভটচাযের ষাঁড়!'

অমরেশ ঠিক বুঝতে পারে না—এটা কতখানি গালাগালি।

'আচ্ছা, দেখা হক একবার ওর মার সংগে বলব ওটাকে বেঁধে রাখতে। বুড়ো মাগী, এখনও লজ্জা সরম হলো না—পাড়ায় পাড়ায় ঢং ঢং করে ঘুরে বেড়াবে।' আরও অনেক কটু কথা গায়ের রাগে কমলকামিনী বলে যান।

এ সব কথা কেমন করে যেন ঘুরতে ঘুরতে সোনালীর মার কানে যায়। সে হাওয়ায় ভর করে উড়ে আসে। উঠান থেকেই ডেকে বলে, 'বলি ও বড়বৌ, এ দেশের তালুক কিনেছ বলে কি সকলের মাথা কিনে নিয়েছ?

আমরা গরীব হলেও তোমাদের খানা-বাড়ীর রাইওৎ না, যে যা যখন মুখে আসবে, তাই তখন বলবে! অত অহংকার ভাল না, ভাল না, বলে দিচ্ছি! আমার মেয়েকে ষাঁড় বলতে তুমি কে? এই যে মেয়ের বিয়ে দিলাম ভদ্রাসনটুকু বন্ধক রেখে, তখন তো এমনি একটি পয়সাও দাওনি। এখন অত বড় কথা কিসের? তোমার ছেলে যায় কেন আমাদের বাড়ী ঢুঁ মারতে? যত দোষ আমার মেয়ের—গরীবের মেয়ে দেখেছ বুঝি, তাই অত ফড়ফড়ানি! তাই অত গড়গড়ানি! আজ বলে গেলাম, অত দেমাক ভাল না, ভাল না—বিধাতা সইবে না! নিজের ঘর আগে সামলাও, নিজের বাছুর আগে বাঁধ—তার পর অপরকে শাসিও।'

বাড়ীশুদ্ধ সকলে থ' মেরে যায় ব্যাপারখানা দেখে, কেউ এই নাম-করা মুখরা বিন্দি ঠাকরুণকে আর ঘাঁটতে সাহস পায় না।

বিন্দি ঠাকরুণ চলে যেতে সবাই জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছিল বড়বৌ, হয়েছিল কি?'

'হবে আবার কি? হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু।' কমলকামিনী রাগে, ক্ষোভে, অপমানে মাথা হেঁট করে থাকেন। মনে মনে ভাবেন: আজ আসুক একবার হারামজাদা—ওর একদিন না হলে তাঁর একদিন!

তখন পুব দিকের বাগানে গেলে দেখা যেত যাদের নিয়ে এ কলহ, তারা দুটিতে গাছের মাথায় উঠে পাতলা ডালে বসে অধ্যবসায়ের সংগে ডাঁশা নোনা ফল পাড়ছে। একটির বুকের ওপর দিয়ে কোমরে কাপড় জড়ান, অপরটির হাতে একটি দুর্বল আঁকশি।

এ গাছটা বিপ্রপদর সীমানায় জন্মেছে। দুর থেকে দীনু ওদের চিনতে পারে। অনেকক্ষণ ধরে ওদের কথাবার্তা শুনবার চেষ্টা করে। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে চুপি চুপি গৃহিণীকে ডেকে আনে।

'ও আর কি দেখব, রোজই তো দেখি। রাস্তার পাশের গাছ যার যত ইচ্ছা—'

'তা বলছি নে, তা বলছি নে আমি! তোমার পেটের দুটো থাকলেও তো অত বড়ই হত—অমনি সুন্দর দেখাত! আমি তুমি নোনা ফল দিয়ে করব কি, ওরা খাক, ওরা পেড়ে নিয়ে যাক। আহা [illegible]র পড়ে না যায়।' বলতে বলতে নিঃসন্তান দীনুর মন নরম হয়ে আসে।

গৃহিণী মন্তব্য করে, 'পোড়া কপাল, এত কাল পরে মিনসের আবার শোক উথলে উঠল।'

গৃহিণী অদৃশ্য হয়—দীনু চুপ করে চেয়ে থাকে সস্নেহে।

স্ত্রীলোকের যা পাওয়ার ও চাওয়ার, তা সবই পেয়েছেন কমলকামিনী। স্বামী সংসার, পুত্র কন্যা, টাকা পয়সা, ধান চাল—কোনটারই অভাব নেই তাঁর। তবু তাঁর সংসারে শান্তি নেই। একটি মাত্র ছেলে—সে হয়েছে অবাধ্য। বিনুরই বা আশা কি! এই যে অর্থ ও বিত্ত চরম দুঃখ করে সঞ্চয় করা হচ্ছে, এ কাদের জন্য? ভবিষ্যতে এ ভোগ করবে কে? শ্বশুর বংশের নামই বা রাখবে কে?

ছেলের চেয়েও এক এক সময় ঐ মেয়েটার উপরই রাগ হয় বেশী। ও যদি দেশে না আসত, তা হলে অমরেশের মতি গতির যে পরিবর্তন হয়েছিল, তাতে আপাতত তেমন কিছু চিন্তার ছিল না। যত নষ্টের মূল ঐ বজ্জাত মেয়েটা। ওর জন্যই যত অনর্থের সৃষ্টি। অমরেশের দোষ কি? ওর যেমন বয়স অল্প, মতিও তেমনি তরল। জলের মত যে পাত্রে ঢালবে সে পাত্রের রূপ পরিগ্রহ করবে। ছেলেরা না হয় ডানপিটে হতে পারে, কিন্তু মেয়েরাও যে অমন উচ্ছৃঙ্খল হবে, তা ভাবতেও পারা যায় না।

'কাকীমা, দু-দুটো মেয়ের বিয়ে দিলে, কই আমাকে ত কিছু খাওয়ালে না? ঘরে চিঁড়ে মুড়ি, দুধ কলা কি আছে দাও খাব।'

কমলকামিনী যে এইমাত্র ওর বিষয় চিন্তা করছিলেন এবং বিরক্তিতে

তাঁর মন যে ওর ওপর বিমুখ হয়ে আছে, এ কথা মুখ দিয়ে তিনি বলতে পারলেন না—কিন্তু এমন করে অযাচিতভাবে খেতে চাইল বলে ওকে আপ্যায়নও করতে পারলেন না। তিনি নীরবে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

বেহায়া মেয়েটা কমলকামিনীর ঐ অবস্থা দেখে এতটুকুও সংকুচিত না হয়ে ফের বলে, 'কাকীমার মন ভাল না, কিন্তু আমার পেটটা ত ভাল আছে, যাই, আমি নিজেই নিয়ে খাই গে। আয় অমরেশ, অমরেশ আমার সংগে আয়!' সোনালী নিজেই চিঁড়ে-মুড়ির ভাণ্ড টেনে এনে একটা বড় বাটিতে ঢেলে নিয়ে দুধ কলা, গুড়ের সন্ধানে যায়। দিব্যি পেট ভরে খাবে। গুড় সহজেই বড় ঘরে পাওয়া যায়, কিন্তু দুধ কলা কোথায়? অনেক খুঁজেও তা মেলে না।

'কাকীমা, আমাকে দুধ কলা না দিয়ে একা একা খেলে তোমার হজম হবে না। তুমি ভাবছ চুপ করে থেকে এড়াবে, তা পারবে না—বল, কলা কোথায়? দু-দুটো বিয়ের নেমন্তন্ন!'

কমলকামিনী আর গম্ভীর হয়ে থাকতে পারেন না। যে সাপের ভয়ে তিনি নিজের শাবকের জন্য অস্থির সেই সাপিনীকেই এনে দেন দুধ কলা। সোনালী অমরেশকে ডেকে বলে, 'হাবারাম, খেতে হলে এসো। চুপ করে থাকলে আর পাবে না।'

'তুমি খাও, আমি চাই নে। বিয়ের সময় কত রসগোল্লা সন্দেশ আমরা খেয়েছি।'

'তা কি এখনও পেটে আছে?' বলে একদলা মাখা চিঁড়ে মুড়ি অমরেশের হাতে দেয় সোনালী। 'খা, খা, দুধ ঝরছে।'

অগত্যা অমরেশ খেতে থাকে।

বিন্নু এসে বলে, 'বারে আমি বাদ যাব নাকি?'

'না, বাদ যাবি কেন?'

ইতিমধ্যে সেবা আসে—এ বাড়ী, ও বাড়ীর দশটি-পাঁচটি এসে

প্রলুব্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকে। সকলের হাতে একটু একটু দিতে দিতে ভাণ্ডটা খালি হয়ে যায়!

কমলকামিনী বলেন, 'মেয়েটাকে তোরা একটু খেতেও দিলি নে—সব বুভুক্ষুর দল।'

'তাতে হয়েছে কি কাকীমা, আমি এই মাত্র খেয়ে এসেছি।'

'না, না—খেয়ে এলেও তোকে আবার খেতে হবে। বস বস, আমি সব নিয়ে আসছি।'

'অত তাড়নায় কাজ নেই, বললাম যে আমি খেয়ে এসেছি।'

'তা হয়েছে কি, আবার খাবি।'

'তবে আনো আনো শীগ্‌গির করে।'

কমলকামিনীর ফিরতে বেশী দেরী হয় না। সোনালী খেতে থাকে, কমলকামিনী বলেন, 'তোমরা মা পাড়ায় পাড়ায় না ঘুরে বাড়ী বসে খেলতে পার তা? অমরেশটা মোটেই পড়াশুনা করে না—ওকে নিয়ে ঘুরলে তোমার ঘাড়েই দোষ পড়বে, তুমিই ত বড়।'

'আমি কি কাকীমা, ওকে পড়তে নিষেধ করি? ও-ই তো ইচ্ছা করে পড়ে না।'

'না পড়লে ওকে নিয়ে আর খেলা কর না। বুঝলে মা, ও বড্ড দুষ্ট হয়েছে।

'আচ্ছা।'

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, তা রক্ষা করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। অমরেশ ওর কাছে যাবে কি, ও-ই অমরেশকে আকর্ষণ করে, যেন একটা চুম্বক। যত দিন যায়, ততই ওর টান বাড়ে। একটু সময় না দেখলে সোনালী থাকতে পারে না। অমরেশের যেতে দেরী হলে, আসতে একটু দেরী হলে ও পথের দিকে চেয়ে দণ্ড পল গুণতে থাকে। দাওয়ায় বসে মার সংগে আবোল-তাবোল বকে, আর চেয়ে থাকে কখন ও আসে।

কিছু দিন পরের কথা বলছি।

সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমরেশের দেখা নেই। তার এই ব্যবহারে সোনালী মনে মনে বড় বিরক্ত হয়েছে। গত কাল অমরেশ একটা ডাহুক, গোটা দুয়েক বকের ছানা ধরে এনে জিম্বা করে দিয়ে গেছে সোনালীকে। খাঁচা নেই, একটা খোলা ডালায় করে কাঁহাতক রাখা যায় এগুলোকে! বাড়ীতে একটা পোষা বেড়াল আছে। সেটা ভামের চেয়েও পাজি। সারারাত ঘুমাতে পারেনি ওর এই উৎপাতে। বকের ছা পুষে হবে কি? ডাহুকেই বা কোন বুলি আওড়াবে? যদি একান্তই পুষতে হয় তবে টিয়া কিম্বা শালিখের ছা পোষাই উচিত। সেগুলো অন্তত দেখতে সুন্দর—কথা শিখলে তো ভালোই।

কিন্তু সারাদিন অমরেশ এলো না বলে পাখী তিনটার তত্ত্ব-তালাপি করতে সোনালী কসুর করে না। ভয়—পাছে অমরেশ এসে তার সখের পাখীগুলোর অযত্ন দেখে ক্ষেপে যায়।

এই আসে, এই আসে, করে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, তখন সোনালীর রীতিমত চিন্তা হলো! কেন, এমন কি কারণ ঘটল, যার জন্য ও একটি বারও আজ এলো না। যাবে না কি সোনালী অমরেশের খোঁজে? বোসের বাড়ী আর কতটুকু পথ।

'সোনালীদি!' ঘনায়মান অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অমরেশ এসে হাজির। তার ডাক শুনে সোনালী চমকে ওঠে।

'সারা দিন আসিস নি কেন?'

'বলছি। পাখী তিনটা কেমন আছে? মরেনি তো?'

'না—মরেনি, ভালই আছে। ঐ দেখ ঐ ডালায়।'

অমরেশ সোনালীর হাতের প্রদীপটা নিয়ে সাগ্রহে পাখী তিনটা একবার দেখে এসে আশ্বস্ত হয়ে তার কাছে বসে।

'তোর হাতে ওটা কি?'

'সারা দিন আমায় আজ কয়েদ করে রেখেছিল, খেতেও দেয়নি, আর এই কঞ্চিটা দিয়ে—'

'মেরেছে। সন্ধ্যার সময় তাই বুঝি ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছিস্ ?'

'হুঁ।'

'এখন আর তোকে খুঁজবে না ?'

'না। ভাববে, আমি ঘুমিয়েছি। আমি আর বাড়ী যাব না আজ। সন্ধ্যার সময় খেয়ে এসেছি। আজ রাত্রে খুঁজে না পেলে আচ্ছা শিক্ষা হবে। সারাটা দিন কেন আমায় আটকে রাখল !'

'বেশ তো, রাত্রে আমার কাছে শুয়ে থাকবি।'

'তুমি একটা গল্প বলবে, আমি শুয়ে শুয়ে শুনব। কিন্তু কেউ ডাকতে এলে যেন বলো না আমি এখানে আছি।'

'না, না, তা কি বলব বোকা। তুই আমার কাছেই রাত্রে থাকবি।'

সোনালীর মার তখন নিত্য নৈমিত্তিক কম্পজ্বর এসেছে, সে ঘরের ভিতর লেপ মুড়ি দিয়ে কাঁপছে। আর মাঝে মাঝে যা-তা বকছে। এ বাড়ীতে এ জ্বর প্রাত্যহিক ব্যাপার। মা ও মেয়ের গা সওয়া হয়ে গেছে। তাই কেউ সেবা পাওয়ার জন্য, বা করার জন্য ব্যাকুল হয় না।

বাইরের বারান্দায় সোনালী রাতের জন্য তার ও অমরেশের শয্যা রচনা করে। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়ার পাটটাও সেরে ফেলে।

রাত্রি গভীর হয়।

দুজনে মিলে অনেক গল্প-গুজব করে।

সোনালী একটা পুরোন পাঁজি বের করে কতগুলো অশ্লীল বিজ্ঞাপন অমরেশকে পড়ে শুনায়। অমরেশের তা ভাল লাগে না—সে শুনতে চায় রূপকথা। কল্পলোকের রম্য কাহিনী।

রাত্রি আরো গভীর হয়। চার দিক নির্জন—শুধু বাইরের বেত ঝাড়ে একটা ডাহুক গলা ফাটিয়ে ডেকে যাচ্ছে। আম, জাম ও সুপারি

গাছের মধ্যে একেবারে গাঢ় অন্ধকার জমে গেছে। একটুও ফাঁক নেই যেন। দূরে একটা হৈলা গাছে কতগুলো জোনাকী পোকা দানা বেঁধে একবার জ্বলছে, আবার নিবছে।

অমরেশের তন্দ্রা আসতে চায়।

হঠাৎ এক ফুঁতে সোনালী প্রদীপটা নিবিয়ে দেয়। দিয়ে—অসতর্ক অমরেশকে টেনে তার হাত দুখানা ওর উন্মুক্ত বক্ষের ওপর রাখে। তার পর একটা চুমো খায় সোনালী।

অতর্কিতে আগুনে হাত পড়লে মানুষ যেমন ছিটকে পিছিয়ে যায়, তেমনি ভাবে হাত সরিয়ে নেয় অমরেশ। 'তুমি বড্ড অসভ্য, বড্ড অসভ্য সোনালীদি'—বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলে। রাগে দুঃখে হাতের কাছের কঞ্চিটা দিয়ে নির্বিচারে ঘা কতক বসিয়ে দেয় সোনালীর নাকে মুখে। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে বাড়ীর দিকে—গভীর অন্ধকারেই।

রোরুদ্যমান ছেলেকে দেখে কমলকামিনীর বুকটা ধড়াস-ধড়াস করতে থাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হয়েছে ? অমরেশ, কাঁদছিস কেন ? বল না, চুপ করে রইলি কেন ? কি হয়েছে বাবা ?'

ভিড়ের মধ্যে সে কিছু বলতে চায় না। কমলকামিনী তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই সে সব কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলে।

কমলকামিনী বজ্রাহতের মত মাটিতে বসে পড়েন।

এ আঘাত সহ্য করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে তাঁর। তিনি উঠে অমরেশের হাত পা ধুইয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দেন। এই ডাইনীর কবল থেকে কি করে তাঁর দুধের ছেলেকে রক্ষা করবেন, সেই চিন্তায়ই তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাঁর অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখে কেউ কিছু আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় না। ক্রমে ক্রমে ভিড় কমে যায়।

কালই তিনি একখানা চিঠি লিখে লোক পাঠাবেন বিপ্রপদর কাছে। যাঁর ছেলে তিনি এসে রক্ষা করুন। মেয়েমানুষের সামর্থ ও ক্ষমতা সংক্ষিপ্ত। যদি বিপ্রপদ না আসেন, তবে কমলকামিনী নিজেই যাবেন ছেলেকে নিয়ে। সেখানে গেলে যা-হক একটা ব্যবস্থা হবেই।

এখনও তিনি যদি কোন ব্যবস্থা না করেন, নিজের কাজ নিয়ে মগ্ন থাকেন—তা হলে পড়ে থাকবে তাঁর সংসার, ঘর দোর, দেব-সেবা। কমলকামিনী ছেলেকে নিয়ে যে দিকে দুচোখ যায়, সেদিকে চলে যাবেন। গাছতলায় থেকে দিনান্তে ভিক্ষা করে খাবেন। তবু অমরেশকে মানুষ করতে হবে। ছিনিয়ে নিতে হবে ডাইনীর কবল থেকে। মেয়ে তো না, রাক্ষুসী! ও তাঁর ছেলেকে গিলে খেতে চায়। কিন্তু বিপ্রপদ পুরুষ মানুষ, তিনি কি এ সব কথা বিশ্বাস করবেন? হেসে উড়িয়ে দেবেন না তো? কমলকামিনীর সংগে কি শক্রতা ঐ মেয়েটার যে, তিনি ওর বিরুদ্ধে বলতে যাবেন যত কলঙ্কের কথা! ওটা তো ওঁর মেয়ের বয়সী। কিন্তু স্বামীর কাছে চিঠিতে কি লিখবেন? এ সব কথা কি খুলে লেখা যায় পত্রে? লজ্জা ও ঘৃণায় তাঁর মন রি-রি করতে থাকে।

রাত্রে আর ভাল ঘুম হয় না কমলকামিনীর। অতি প্রত্যুষে উঠে তিনি নিতাইকে ডাকতে পাঠান, পাঠিয়ে পত্র লিখতে বসেন। কি ভাষা ব্যবহার করবেন, তা বুঝেই উঠতে পারেন না। এ এমন একটা জটিল ও জঘন্য ঘটনা যে, স্বামীর কাছে লিখতেও স্ত্রীর কলম ওঠে না। কমলকামিনী শেষ পর্যন্ত এইটুকুই লিখতে পারেন যে: পত্র-পাঠ চলিয়া আসিও, অমরেশের সম্বন্ধে বিশেষ সমাচার আছে। যদি না আসিতে পার, তবে নিশ্চয় জানিও, আমি আসিতেছি। তাহাতে সমস্যা মীমাংসা হইবে না, বরঞ্চ খরচান্ত হইতে হইবে। ইত্যাদি…ইত্যাদি…

পত্রলেখা শেষ হলে কমলকামিনী পড়ে দেখেন যে, পত্রের ভিতর গুরুত্ব থেকে রহস্যের অবতারণা করা হয়েছে বেশী। এর চেয়ে ভাল মসাবিদা

করা তখন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কারুর কাছে যখন পরামর্শও নেওয়া যাবে না, তখন এই চিঠিই দিতে হবে—এর ফল ভাল মন্দ যা-ই হোক না কেন!

নিতাই এসে কাপড়ের খুঁটে পত্রখানা বেঁধে নিয়ে রওনা দেয়। এমন একটা কি জরুরী প্রয়োজন যে, এক্ষুনি বাবুকে আবার আসতে হবে—তা সে বহু প্রশ্ন করেও বুঝতে পারে না। ভাবে—বড় মানুষের বুদ্ধির খেয়াল, গরীবের বুদ্ধির অগম্য!

'মা, তবে কি বাবুকে নিয়ে আসতেই হবে?'

'হ্যাঁ বাবা! কত বার আর এক কথা বলতে হবে?'

উষ্মার ভাব প্রকাশ পায় দেখে নিতাই আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় না।

একমাত্র ছেলে, তার সম্বন্ধে সংবাদ—হয়ত বিপ্রপদ খুবই উদ্বিগ্ন হতে পারেন—তাই কমলকামিনী ফের নিতাইকে ডেকে বললেন, 'বলো যে চিন্তার কিছু নেই, সব ভাল আছে, কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে।'

'আচ্ছা মা, তাই বলব। আর চিঠিতে তো সব লেখাই আছে।'

'সব কথা কি আর চিঠি পত্রে লেখা যায়? তোমাকে তো সব বুঝিয়ে বললাম—তুমি ঠিক মত সব বলো।'

'আচ্ছা মা, এখন তবে রওনা হই।'

'এস গে—সাবধানে যেও।'

নিতাইকে দেখে বিপ্রপদ একটু নয় যথেষ্টই আশ্চর্য হন।

নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ আছে। কিন্তু মনের উদ্বেগ দমন করে বিপ্রপদ তাঁকে বসতে বলেন, বলেন বিশ্রাম করতে।

'এই নিন পত্তর, মা-ঠাকরুণের লেখা।'

'কি সংবাদ নিতাই, সব ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ, শরীর গতে সব ভাল—কিন্তু—'

'তবে কি বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কোন গোল বেধেছে? না ঘোষালরা—'

'না—সে সব কিছু না। মা-ঠাকরুণ ওতেই সব লিখে দিয়েছেন।'

বিপ্রপদ চিঠিটা ভাল করে পড়ে দেখেন, কিন্তু সঠিক কিছুই বুঝতে পারেন না। জিজ্ঞাসা করেন, 'ঘটনাটা কি বলো তো নিতাই, আমি চিঠি পড়ে কিছুই বুঝতে পারছি নে।'

'আপনাকে এক্ষুনি বাড়ী যেতে হবে, বাড়ীর সব ভাল।'

'বেশ। তুমিও যেমন সংবাদ নিয়ে এসেছ, তোমার মা-ঠাকরুণও তেমনি সংবাদ পাঠিয়েছেন। যেতে হবে বললেই কি যাওয়া যায়? আমি পরের চাকরী করি নে"?

'আপনাকে অতি অবশ্য যেতে হবে, আর তো সব পত্রেই লেখা আছে।'

'ছাই লেখা আছে পত্রে। তুমি যদি কিছু নাই জানো শুধু শুধু কষ্ট করে এলে কেন?'

'আমাকে যেটুকু শুনিয়েছেন, কি বলে দিয়েছেন তা তো সঠিক বলছি বাবু। আমার কি দোষ হলো তা তো বুঝতে পারছি নে?'

না, না—তোমার দোষ কি! তোমার দোষ কি! দোষ আমার। আমি সংসারের কর্তা, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমিই দায়ী!'

'বাবু, আমাকে তো অনুযোগ করে লাভ নেই, আমি আপনাদের গোলাম।'

'তোমাকে অনুযোগ করব কেন নিতাই, আমার অদৃষ্টকে অনুযোগ করছি। দূরে বসে এখন ভেবে মরি, অথচ লোক এলো, পত্র এলো, কিছুই বোঝা গেল না। যাক, আজ তুমি খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করো, কাল যা হয় করা যাবে। বিপ্রপদ কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে ডাকেন, 'মালা, মালা।'

'যাই বাবুজী।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মালা এসে হাজির হয়। পরনে তার সেই ঘাগরা, গায় সেই ওড়না।

নিতাই অবাক হয়ে এই হিন্দুস্থানী রমণীর দিকে চেয়ে থাকে।

বিপ্রপদ নিতাইর আহারের বন্দোবস্ত করে দিতে বলেন। মালা চলে যায়।

রাত্রে বিপ্রপদ বেশ করে ভেবে দেখেন: বাড়ীতে অসুখ বিসুখ নেই, বিষয় সম্পত্তির গোলমাল নেই, চট করে ছুটি পাওয়ারও সম্ভাবনা কম—এ অবস্থায় তিনি এখনই যেতে না পারলে এমন একটা ক্ষতি হবে কি! একমাত্র ভয় কমলকামিনী এসে পড়তে পারেন। একান্ত এলে মন্দ হবে না। বরঞ্চ তিনি মালাকে তাঁর হাতে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত মনে খাতা-পত্তর নিয়ে থাকতে পারবেন। অনেক দিন অনুপস্থিত থাকায় প্রত্যেকবার যা হয় এবারও তাই হয়েছে। নায়েব-গোমস্তারা মিলে একেবারে জগা-খিচুড়ি করে রেখেছে। এখন দিনরাত তাঁকে খেটে এগুলো সব দুরস্ত করতে হবে—কখন সদর থেকে ডাক আসে বলা তো যায় না। কমল-কামিনী বাড়ী ছেড়ে এলে নানাদিকে হট্টগোল বাধতে পারে। স্ত্রীলোক হলেও তাঁর একটা বুদ্ধির তাৎপর্য আছে। সকলে ব্যাখ্যাও করে। কিন্তু পত্রখানায় তার এতটুকু পরিচয়ও পাওয়া গেল না যে।

ভোর বেলা উঠেই তিনি প্রথম চিঠি লিখতে বসেন। নিতাইকে এখনই বিদায় করে দিতে হবে—না হলে ষ্টিমার পাওয়া কঠিন। কারণ, গয়নার নৌকা ছাড়ে খুব ভোরেই। আজ বিপ্রপদর ঘুম ভাঙতে একটু

দেরী হয়ে গেছে। মালার গানেই তাঁর ঘুম ভাঙে। কাছারী বাড়ীর সকলেই জাগে ওর প্রভাতী সংগীতে, নিতাইও আজ সে গান শুনে গেল। অর্থ কিছু বুঝল না, কিন্তু বড়ই ভাল লাগল তার।

বিপ্রপদ যে চিঠি লেখেন তা ঘটনাক্রমে সংক্ষিপ্ত হয়। এবং তাঁর অজ্ঞাতেই রহস্যপূর্ণ হয়ে থাকে খানিকটা।

'বাবুজী, এখনই যে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন—আজ মুখ হাত ধোবেন না ?'

'তিনি অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেন, 'হ্যাঁ—এই তো।'

নিতাই এসে ঘরে প্রবেশ করে। মালা আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে চলে যায়।

শিবচর

কল্যাণীয়াসু,

আমি শারীরিক ভালই আছি। অন্যান্য সংবাদ নিতাই মৌখিক বলিবে। এখন আমার যাওয়া অসম্ভব। অস্থির হইও না—আগতে তোমাদের কুশল কাম্য। ইতি—

আং পত্র—বিপ্রপদ বসু

'নিতাই, তুমি তো সব দেখে শুনে গেলে—মা-ঠাকরুণকে তোমার বুঝিয়ে বলো—আমি এখন যাই কি করে ?'

'আপনার ভাবতে হবে না, আমি সব বলতে পারব বুঝিয়ে।'

'তুমি কি খেয়েছ ? তোমার কাল কোন অসুবিধা হয়নি তো ?'

'না বাবু, উনি খুব যত্ন আত্তি করতে পারেন। যেমন দেখতে তেমনি রাঁধতে। একেবারে মা-ঠাকরুণের জুড়ি। সেই ভোর না হতে উঠেই চারটি ভাতে ভাত আমাকে রেঁধে দিয়েছেন। এখন আর কোন কষ্ট হবে না আমার। আমরা চাষা ভূষো লোক, চারটি অন্ন পেলেই তুষ্ট।' বলে নিতাই একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে।

'মা-ঠাকরুণের জুড়ি'—কথাটা খুব ভাল লাগে না বিপ্রপদর কাছে। বিশেষণ এত সবিশেষ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তিনি নিতাইকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। শুধু তার যাওয়ার ব্যবস্থা আগ্রহ করে দ্রুততর করে দেন।

'তুমি এমন সংবাদ নিয়ে এসেছ যে দুদিন থাকবে, একটু দেখবে শুনবে, খাবে দাবে তাও হলো না—যেমন আসা তেমনি যাওয়া। আমার এখানে কোন অসুবিধা নেই, থাকতে পারলে ভালই লাগত। দূর বলে দেশের লোক তো কেউ আসে না এদিকে। যাক, আবার একবার এসো।'

'এখন থেকে তো আমায় মাঝে মাঝে আসতেই হবে। কত খেতে পারব এরপর। আর বাড়ী বসে যা খাই তাও তো আপনারটাই।'

'অমরেশের সমাচার এমন কি জরুরী তা তোমার মা-ঠাকরুণকে খুলে লিখতে বলো, আমি রীতিমত উদ্বিগ্ন রইলাম। বুঝলে তো?'

'হ্যাঁ বাবু, সব বুঝেছি।' বলে নিতাই রওনা হয়।

কমলকামিনীর সংগে মালার তুলনা! কি জানে কমলকামিনীর সম্বন্ধে নিতাই! কতটুকুই বা বোঝে সে! যদি জানত, যদি বুঝত, তবে এমন তুলনা করতে সে কিছুতেই সাহস পেত না। কমলকামিনী বিপ্রপদর সন্তানের জননী, তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী—একটা প্রকাণ্ড পরিবারের স্নেহময়ী পালিকা। আর মালা পরিচয়-পত্রহীনা, তুচ্ছ একটা ভবঘুরে মেয়ে। তার না আছে স্থিতি না আছে বিবর্তন কেন্দ্র। সে এসেছে দাসীরূপে, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের পথ বেয়ে, আর কমলকামিনী এসেছেন রাণীর মত ঐশ্বর্যের রাজপথ ধরে স্বকীয় গৌরবে। কমল তার হৃদয়ের কালো জলে ফুটে রয়েছে স্থির হয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে। আর ও অন্ধকারে ভেসে চলেছে স্রোতের সংগে শাপলার মত অকূলে। বিপ্রপদ মনে মনে হাসেন—কমলের সংগে মালার তুলনা! কমল আর মালা, চাঁদ আর জোনাকী!

নিতাইর পথ চেয়ে কমলকামিনী এ কদিন কাটিয়েছেন বললে ভুল করা হবে। তিনি আশা করে রয়েছেন বিপ্রপদ নিশ্চয়ই আসবেন। তাঁর এ বিপদে তিনি কি পারেন চুপ করে থাকতে? অথচ বিপদটা যে কি, তার গুরুত্ব যে কতখানি, তাই জানলেন না বিপ্রপদ। তাঁকে লিখে জানাতে লজ্জায় কলম চলল না। সমস্যা না জানিয়ে মীমাংসার আশায় বসে রইলেন কমলকামিনী।

সময়মত নিতাই ফিরে এলো।

তাকে একা দেখে কমলকামিনী নিজেকে অপমানিত মনে করতে লাগলেন। পত্রখানা পড়ে তিনি বুঝলেন, বিপ্রপদ তাঁকে তুচ্ছ করেছেন। তাই তাঁর জবাব অত ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত। এত দিন সংসার করে এই প্রথম তিনি পেলেন স্বামীর কাছ থেকে আঘাত। সেবা করে, যত্ন করে, এ সংসারের জন্য সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে যে গৌরবের মধুচক্র সঞ্চয় করেছিলেন তাঁর মর্মস্থলে—তা যেন এক আঘাতেই চূর্ণ হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তে তিনি যেন নিজেকে শূন্য মনে করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ তিনি কোন কথাই বলতে পারলেন না।

চিঠিতে কি লেখা আছে নিতাই জানে না। কমলকামিনীকে চিন্তাকুল দেখে সে বলে—'এখন বুঝলেন তো, কেন বাবু আসতে পারবেন না। চিঠিতেই তো তিনি সব ব্যক্ত করেছেন। বড্ড কাজের চাপ কিনা তাই তাঁর এ সময় আসা খুবই অসম্ভব। কথা বলবারও সময় নেই, এত ব্যস্ত। অবস্থা দেখে আমি আর পীড়াপীড়ি করতে সাহস পেলাম না।' প্রসংগটা মনোজ্ঞ করবার জন্য নিতাই কিছু মিথ্যারও আশ্রয় নেয়।

'এদিকের কথা সব বলেছ তাঁকে?'

'হ্যাঁ, সব বুঝিয়ে বলেছি।'

'তবু তিনি বললেন যেতে পারব না?'

'না, না, তা বলবেন কেন, তা বলবেন কেন? বড্ড কাজের চাপ কি না!'

'তুমি কিছুই বলোনি তাঁকে। শুধু ঘুরে এসেছ—খামকাই খরচান্ত করে।'

ভাষার ইংগিতে নিতাই জর্জরিত হয়—সে-ও একটু কঠিন স্বরে জবাব দেয়, 'মা-ঠাকরুণ, আমি যা জানব তার অতিরিক্ত বলব কি করে? খেটে মরলাম অথচ সুনাম পেলাম না।'

'সুনাম পাবে কি করে? যাঁর ছেলের জন্য আমাদের মাথা-ব্যথা তিনিই দিলেন অগ্রাহ্য করে।'

'কিছুই তিনি অগ্রাহ্য করেননি। আপনার পত্র পড়ে আসলে তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি। না বুঝে মিছেমিছি এতটা পথ এ সময় আসা-যাওয়া করা কি সহজ!'

কিন্তু কমলকামিনী তবু তাঁর ভুল অভিমানে চেয়ে দেখেন না। বলেন, 'না আসুন, আমিও এমন দায় ঠেকিনি যে ছেলে ঘাড়ে করে যাব ঐ জংগলে। যাক ছেলে নষ্ট হয়ে—বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলে তো আমার নাম সে বলবে না?'

'আমরা ওর বুঝি কি মা!' ডাক দিলে হাজির হতে পারি এই পর্যন্ত। ধোপা বাড়ীর খালটায় সাঁকো নেই, তাই নায়ে এসেছি—যাই, সেটা ভাল করে বেঁধে রেখে আসি, খালে জোয়ার এলো বলে।' বলে নিতাই ওঠে।

কিন্তু কমলকামিনী বসেই থাকেন।

নিতাই ফিরে এসে এক ছিলিম তামাক সেজে টানতে টানতে কমলকামিনীর নিকট এসে বসে। আসল যেটা খবর সেইটাই তো বাকী!

'মা-ঠাকরুণ বড্ড সুন্দর গান শুনে এলাম এবার। কি ছাই গান গায় হারান নট্টের দলের ছোকরারা। কি মিঠে গলা, কি মিঠে আওয়াজ!'

'কি গান, নিতাই ?'

'তা তো বলতে পারিনে—চাষার ছেলে অত অর্থবোধ নেই মা। বাংলা নয়, হিন্দি-টিন্দি হবে।'

'কোথায় শুনলে ?'

'শুনলাম কাছারী-বাড়ীতে।'

'কে গাইল ? এমন গাইয়ে ওখানে এলো কি করে ?'

'রাধেকৃষ্ণ ! অমন গান কি আমাদের দেশের কেউ গাইতে পারে। আমাদের দেশে কি ও গান জন্মে ! একবার বিন্দাবন গিয়েছিলাম তখন শুনেছিলাম পথে, আর এবার শুনলাম বাবুর বাসায়—কাছারীতে। কি সুন্দর গলা।'

'বাবুর বাসায় ! কে গাইল ?'

'কে গাইল ঠিক চিনলাম না। এক রাত্রি মাত্র রয়েছি, কেউকে যে পরিচয় জিজ্ঞাসা করব তার সময় হলো না ! বাবুর কাছে কি আর জিজ্ঞাসা করা যায়, না ভাল দেখায়—তুমিই বলো না ?'

এমন সময় সেবা ছুটে এসে কমলকামিনীকে জড়িয়ে ধরে—তার বুঝি গলা শুকিয়েছে। তিনি সেবাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, 'পুরুষ না মেয়েলোক নিতাই ?'

'মেয়েলোক।'

'দেখতে কেমন ? বয়স কত ?'

'কত বয়স বলতে পারিনে। রূপ ? আমরা কি পারি মা তোমাদের রূপ-বর্ন্না করতে ! দেখলে চোখ ফেরান যায় না।'

'তবু কার মত দেখতে ? আমার মত, সুধীর মত, আমার বড় মেয়ে বিমলার মত—কার মত দেখতে ?

'ঠিক এদের কারুরই মত না—কিন্তু চোখে ধাঁধা লাগে যেন অভিসারে চলেছেন শ্রীরাধা !'

'ও সেখানে কি করে ? কোথায় থাকে ?'

'রান্না-বান্নার কাজ করে, বোধহয় বাড়ীর ভিতর থাকে। মেয়েমানুষ বাইরে আর কোথায় থাকবে মা ? মানুষ জন গেলে বড় যত্ন আত্তি করে। যেমন দেখতে তেমনি রাঁধতে—গান গায় তার চেয়েও ভাল। ভোর বেলা তার গান শুনলে কেউ কি আর থাকতে পারে ঘুমে !'

'এ কথা তো কিছুই লেখেননি তোমার বাবু পত্রে। শুধু আজে-বাজে সংবাদ।'

'এ আর লিখবেন কি তিনি, আমিই তো সব জেনে এসেছি। বাবুর এখন আর নিজের হাতে রাঁধতে হয় না—খাওয়া দাওয়ায়ও কষ্ট হয় না। ভালই তো হয়েছে মা !'

'তা ঠিক নিতাই, ভালই হয়েছে। কিন্তু তুমি আমি ছাড়াও তো মানুষ আছে, তাদের কাছে মন্দ হতে কতক্ষণ ?'

'মন্দ হবে হিংসুকের—তাতে তোমার আমার কি ? তুমি গেলে সেবা যত্ন পাবে, একটা লোকের সাহায্য পাবে, সেটা কি কম কথা ! দেখে শুনে সুখী হলাম, মেয়েটির স্বভাব-চরিত্তির খুবই ভাল, না হলে আমাকে কি করে অত যত্ন ?'

প্রখর ধী-সম্পন্না নারী এই কমলকামিনী। নিজের অধীরতা নিজেই সহজে সংযত করেন। যেটুকু দুর্বলতা নিতাইয়ের সুমুখে প্রকাশ পেয়েছে, তাই অন্যায়। ঈশান কোণ কালি করে বিপদের বাত্যা আসছে, এখনই শক্ত করে নোঙর ফেলতে হবে। যদি একবার ছিঁড়ে গিয়ে থাকে শিকল, তা আবার বাঁধতে হবে কসে। ঝড় চিরস্থায়ী নয়, বর্ষাও ক্ষান্ত হবে—আবার চাঁদ উঠতে কতক্ষণ ! কতক্ষণই বা লাগে জ্যোৎস্না গলে গলে পড়তে ! আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে হবে, তা না হলে চলবে কেন ? আজ সুদীর্ঘ কুড়ি বছর যাঁর সংগে চলেছেন তালে তালে পা ফেলে ফেলে, তাঁর যদি তাল ভংগ হয়েই থাকে, তবু কমলকামিনী ভাঙবেন না তাল,

পড়বেন না এতটুকুও মুষড়ে। ভুল যখন ধরা পড়বে, তখন তিনি ফিরিয়ে পাবেন পুরোন ছন্দ-বদ্ধ চলার গতি। তা ছাড়া সমস্ত সঠিক না জেনে-শুনে অধীর হওয়া নিতান্তই মূর্খতা। তিনি নিজের মনকে যতই প্রবোধ দেন, অবোধ মন তাঁর বুঝতে চায় না কিছুতেই।

স্নানান্তে কমলকামিনী যা করেন, তা কতকটা অস্বাভাবিক—অন্তত তাঁর পক্ষে তো নিশ্চয়ই।

আয়নাখানা সুমুখে রেখে চুল আঁচড়ান। সুন্দর সুগোল করে সিঁদুরের ফোঁটাটি এঁকে দেন কপালে। আঁচল দিয়ে মুখখানা মুছে একবার চেয়ে দেখেন ভাল করে। তাঁর ভিতর কি কোন সৌন্দর্যই নেই, কোন আকর্ষণই নেই তাঁর রূপে? কিন্তু এ রূপে যাঁকে আকর্ষণ করবে, প্রলুব্ধ হবে যে ভ্রমর, সে কোথায়?

'মা, তোমাকে ডাকছেন কাকীমা। খেতে চলো, কতক্ষণ আর তারা বসে থাকবে!' চঞ্চলা বলে, 'কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমার সিঁদুরের ফোঁটাটা, যেন তুলি দিয়ে এঁকেছ আজ। কি সুন্দরই না সীঁথি করেছ!'

কমলকামিনীর সংগে সংগে চঞ্চলাও রান্নাঘরে যায়। চঞ্চলা আবার বলে, 'দেখ দেখ, মা আজ সেজেছে কাকীমা রূপসী হয়ে!'

কমলকামিনী একটা ধমক দিয়ে বলেন, 'চুপ কর হারামজাদী!'

'তাই বুঝি দিদির এত দেরী—ভাসুর ঠাকুর আজ আসবে নাকি?'

'দেখ, মণিমালা, আমি তোর চেয়ে অনেক বয়সে বড়, সে কথা ভুলে যাস নে।'

মেজজাও কমলকামিনীকে দেখে একটু ব্যংগ করতে ছাড়ে না। 'বয়সে ছোট হলেও তো মণি মিথ্যা কথা বলেনি দিদি—বাস্তবিকই তুমি যেন আজ ইচ্ছা করেই একটু সেজেছ। ভালই তো নব্য সাজ সজ্জা!'

'যদি সেজে থাকি বেশ করেছি। তোরাও গিয়ে সাজ। আমি না য় নিজেই সাজিয়ে দেবখন, হিংসেয় মরিস নে জলে। এখন আয়, গিলতে বস।'

আহারান্তে যে যার কাজে চলে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কথাটা দেওরদের কানে ওঠে। তারা গল্পচ্ছলে এসে বৌঠানকে দেখে যায়। তাদের চোখে এ একটা নতুন জিনিস বটে।

সবই কমলকামিনী বুঝতে পারেন। ইচ্ছা করে, যেটুকু সামান্য প্রসাধন করেছেন তা নষ্ট করতে, শুধু স্বামীর অমংগল আশংকায় তিনি করতে পারেন না। হিন্দু নারীর চিরন্তন সংস্কারে বাধে, বুক কেঁপে ওঠে আচমকা।

সেদিন রাত্রে সেবা তাঁকে বিরক্ত করল না, অমরেশও যন্ত্রণা দিল না, কিন্তু রাত্রে তাঁর ভাল ঘুম হলো না। মনের উত্তেজনা কিছুতেই কমতে চায় না। কেবলই কতকগুলি বীভৎস স্বপ্ন চোখের কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কখনও বা রক্তারক্তি, কখনও বা খুনোখুনির দৃশ্য যেন ভেসে এলো সুমুখে। কখনও তিনি আঘাত করলেন কল্পিত মালাকে, আবার কখনও হয়তো সোনালীকে। তিনি দু তিন বার উঠে চোখে মুখে জল দিলেন। খানিক বসে রইলেন প্রদীপ জ্বালিয়ে। স্থির দীপশিখার দিকে চেয়ে সময় কাটল অনেকক্ষণ। এই যে ঘুমন্ত বাড়ী, এখন কেউ তো জেগে নেই, সকলেই পরিপূর্ণ নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে, কিন্তু কমলকামিনী একা কেন জেগে? কেন? কি তাঁর অপরাধ? তিনি তো জ্ঞাতসারে এমন কোন পাপ করেননি যে, তার প্রায়শ্চিত্ত করছেন রাত জেগে বসে?...

এ ভাবে কত রাত্রি কাটবে কে জানে? তিনি এর একটা প্রতিকারের উপায় না করতে পারলে হয়তো উন্মাদই হয়ে যাবেন। বিপ্রপদকে কি তিনি অবিশ্বাস করেন? তাঁর সম্বন্ধে কি সন্দেহের কোন অবকাশ আছে? না, না, এত সহজে কোন পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব। অমন

দেবতুল্য পুরুষ—তাঁর সম্বন্ধে এ সব চিন্তা করাও অন্যায়। কিন্তু দেবতা-দেরও তো স্খলন-পতন ঘটে! এখন পর্যন্ত হয়তো এমন কিছুই ঘটেনি, কিন্তু পিছল পথে যেতে কতক্ষণ? উচিত তাঁর নিজের এখনই বিপ্রপদর কাছে যাওয়া। বৃথা অভিমান করে বসে থাকলে ক্ষতি তাঁরই। আর ওখানে গেলে অমরেশেরও একটা ব্যবস্থা হবে, নিজেও তিনি আশ্বস্ত হতে পারবেন সব নিজের চোখে দেখে।

'সকাল বেলাই একটু নিতাইকে খবর দিও ঠাকুরপো।' অতি প্রত্যূষে কমলকামিনী শিবপদকে ডেকে বলেন, 'আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তুমি নিজেই যেও, বুঝলে?

'বোঠান, সে তো এক্ষুণি আসবে—একটা সাঁকো নেই, যাওয়ায় বড্ড অসুবিধা।'

'তার চেয়েও বড় অসুবিধা হবে যদি সে না আসে—কারণ আমি তোমার দাদার ওখানে যাব—আজই।'

শিবপদ আশ্চর্য হয়ে যায়। কমলকামিনীর মুখের দিকে চেয়ে আরও আশ্চর্য হয়। 'এ কি, তোমার মুখ চোখ অমন দেখাচ্ছে কেন? চোখের কোণে কালি ভেঙে দিয়েছে যে বোঠান, তোমার কি হয়েছে? হঠাৎ যেতেই বা চাইছ কেন দাদার কাছে? কিছুই তো বুঝতে পারছি নে!'

'তুমি তা বুঝবে না ভাই, অমরেশকে নিয়েই আমার বড় চিন্তা, ও আমাকে পাগল করে ছাড়বে। সেদিনের ঘটনা তোমাদের কাছে বলিনি, বলতেও পারব না, কিন্তু সইতেও পারব না তোমার দাদার কাছে না গেলে, একা একা আর এ ব্যথা বইতে পারি নে, তাই যেতে চাই আজই—তোমরা একটু জোগাড়-যন্ত্র করে দাও—আমাকে সাহায্য কর অসময়ে, আমি চিরদিন তোমাদের কেনা হয়ে থাকব বিনা পয়সায়।'

'এ তো সামান্য ব্যাপার, এর জন্য এত অনুনয়ের কি আছে! তুমি বলে দাও কি করতে হবে, হাতে হাতে জোগাড় করে দিচ্ছি।'

'আমি সংগে বেশী কিছু নেব না। বড় মেয়েরা বাড়ী থাকবে, শুধু
:গ যাবে সেবা ও অমরেশ। আমি গিয়েই ফিরব, কারণ, আদায়-
:লের সময় আমাদের মধ্যে এক জনের বাড়ী থাকা একান্ত দরকার
াানে!'

'সে কথা তো ঠিক—একজন মানান-সই তো চাই।'

একান্ত পল্লীগ্রাম। অযাচিত প্রশ্ন, অযাচিত উপদেশ, অযাচিত
:তূহলের অন্ত থাকে না। 'হঠাৎ কেন যাচ্ছ, নতুন সম্পত্তি নিয়ে কি
ইতে ভাইতে বনি-বনাত হচ্ছে না?' 'শুনলাম, বিপ্রপদ না কি অসুস্থ,
ত্য নাকি তা?' 'সাবধানে রাস্তা ঘাটে যেও, সংগে এক জন ভাল
াক নিও। নিতাই না কি যাচ্ছে সাথে, কেন শিবে যেতে পারে না?'
:প্রপদ নাকি ফের বিয়ে করছে?' মহেশের বৌ ফিস্ ফিস্ করে বলে,
:নুষের মন বিগড়ে যেতে কতক্ষণ! আগে-ভাগেই তোমার যাওয়া
:চত।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল উপেক্ষা করে এদের কথায় জবাব
দিয়ে কমলকামিনী সংগে যা নেবেন, তাই জোগাড় করতে থাকেন।

যখন গোছান সারা হয়েছে, বিছানা-পত্র বাঁধাও সারা, তখন পুরুত
ড়ী থেকে সংবাদ এলো আজ বাস্তবিকই দিন বড় খারাপ—মঘা।
ত্রা নিষেধ।

আগামী কাল রওনা হওয়া যাবে—দিন ভাল, যাত্রা শুভ। কমল-
ামিনীর আজ আর অশ্লেষা মঘার বিচার নেই, কিন্তু সংগে যে সেবা ও
মরেশ রয়েছে। হাজার হলেও ওদের মংগলামংগলের দিকে তো চাইতে
ব তাঁর।

পরের দিন এমন একটা ঘটনা ঘটে যে, কমলকামিনীর শিবচর যাওয়া
নির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখতে হয়।

দু ভায়রা যুক্তি করে এসেছে, কিছু দিন শ্বশুরবাড়ী বেড়িয়ে যাবে,
াল-মন্দ খাবে, বড়লোক শ্বশুর—চিন্তার তো কিছু নেই।

কমলকামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে মুখে হাসি টেনে মেয়ে-জামাইদের অভিনন্দন করেন। নতুন জামাই, এদের আদর-যত্ন না করে তিনি কোন মুখে যাবেন শিবচর ?

৩০

দেহের পরিশ্রম, অন্তরের দাহ দুটোতে মিলে কমলকামিনীকে ক্ষয় করতে লাগল দিনরাত। কাউকে তিনি বলতেও পারেন না, সইতেও বুঝি আর পারবেন না এ চাপ। কোন দিন যিনি শ্রমে কাতর হন না, উৎসবে-আনন্দে একাই একশো জন, তিনি আজ একটুতেই হাঁপিয়ে পড়েন। মনে হয়, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এক দিকে চলে যান—এ সংসার তাঁর কাছে নিতান্ত একটা প্রহসন! তবু মেয়ে জামাইরা যাতে কিছু টের না পায়, কিছু ত্রুটি না ধরতে পারে—তাই যা করেন, অনেকটা অভিনয়ের মতই করে যান কমলকামিনী। মেয়ে জামাইরা অবশ্য কিছুই ধরতে পারে না। কিন্তু সকল ত্রুটির, ক্ষতির ছাপ গিয়ে পড়ে কমল-কামিনীর চোখে মুখে। একটু লক্ষ্য করলে এমন নয় যে তা ধরা যায় না।

মেয়েদের মধ্যে বিমলারই বুদ্ধি প্রখর। সে একদিন জিজ্ঞাসা করে, 'মা, তোমার চেহারা দিন দিন অমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন ?'

'কি জানি মা, বলতে তো পারি নে—এমনি তো কোন অসুখ বিসুখ নেই।'

'শুধু শুধু অমন ধারা হতে পারে না কিছুতেই।'

কমলকামিনী সেবাকে বাতাস দিতে দিতে বলেন, সব সময় কি মানুষের শরীর এক রকম থাকে মা ?'

'তা বুঝি, মা। কিন্তু খারাপ হওয়ার তো একটা কারণ থাকা চাই! আজ প্রায় পনের দিন এসেছি, এসেই বাবাকে চিঠি দিয়েছি—বাবা কোন জবাব দিল না কেন ? তুমি কি কোন খবর রাখো ?'

কমলকামিনী গম্ভীর ভাবে বলেন, 'না।'

'কোন চিঠি-পত্রও পাওনি?'

'না।'

'আশ্চর্য!'

খাওয়া-দাওয়ায় রাত্রি দ্বিপ্রহর গত হয়েছে। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বিমলা মার কাছটিতে এসে বসে—সে যেন তার মার সমবয়সী। 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, মা?'

'কি কথা, বিমলা?'

প্রদীপটা একটু উসকে দিয়ে চতুর্দিকে চেয়ে দেখে সে জবাব দেয়, 'অমরেশের সেদিন রাত্রে কি হয়েছিল? বাবাই বা এলো না কেন নিতাইর সংগে?'

'এ সব কথা তুই শুনলি কোথায়?'

'মা, কান থাকলেই সব শোনে, চোখ থাকলেই সব দেখে।'

কমলকামিনী বুঝলেন: এ সব নিয়ে ভিতরে ভিতরে একটা আলাপ-আলোচনা হয়। হবে না? যেমন পুত্র তেমনি স্বামী! যাদের দিয়ে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হবে, লোকের কাছে বাড়বে গৌরব—তাদের দিয়েই মুখে পড়ল চুণকালি! লজ্জা ঘৃণায় তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে।

'মা, চুপ করে থেকে তুমি আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি এসে অবধি তোমার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারছি, তোমার অন্তরে দেবাসুরে যুদ্ধ চলছে। তাই তোমার মুখে সে হাসি নেই, সুখে সে সুখবোধ নেই। আমি তোমার মেয়ে, আমার কাছে কিছু গোপন করো না।'

এতটুকু ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেমন প্রকাণ্ড একখানা মেঘ গলে যায়, তেমনি সামান্য একটু সহানুভূতিতে কমলকামিনীর মন বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, তোর কাছে আমি আর গোপন করে রাখব না মা—একা

আবার প্রদীপটা উজ্জ্বল করে দিয়ে মা ও মেয়ে মুখোমুখী হয়ে বসে। রাত্রির নির্জনতায় ব্যথার আবেগে একটি মধুর সখ্যভাব ফুটে ওঠে দুজনার মধ্যে। কমলকামিনী একটি একটি করে সব কথা খুলে বলেন, বিমলা ব্যাকুল আগ্রহে শোনে। কখনও তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, কখনও সে স্তম্ভিত হয়ে থাকে। কমলকামিনী আজ সব ব্যথা বেদনা মেয়ের কাছে উজাড় করে দেন। তারপর চলে পরামর্শ—কি করে এ সব সমস্যা মীমাংসা করা যায়। যে যা বোঝে, সে তা বলে। অবশেষে তাঁরা একটা সীমারেখায় এসে পরামর্শ শেষ করেন।

'তাহলে আমি তোমার প্রথম সমস্যার ভার নিলাম।'

'জামাইকে জিজ্ঞাসা করবি নে?'

'সে তো না করবে না—মিছামিছি তাকে জিজ্ঞাসা করে হবে কি। আমি এবারই অমরেশকে নিয়ে যাব সংগে করে।'

'আবার যদি কোন কথা-কথি হয়?'

'হবে না মা, হবে না। সকলের একটা দায়িত্ব আছে, কর্তব্যও আছে অমরেশের জন্য। ওই একটি মাত্র ভাই তো!

'বেশ; তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।'

'বাড়ীর কাছে ইস্কুল। গিয়েই দেব ভর্তি করে। দিব্যি পড়বে শুনবে দেখবে বেড়াবে, থাকবে মনের আনন্দে।'

'এখন তাহলে তুই শুতে যা, রাত আর নেই বুঝি।'

বিমলা জবাব দেয়, 'এখন তুমিও একটু ঘুমোও—আমিও শুতে যাই।'

বিমলা চলে যায়। কমলকামিনী প্রদীপ নিবিয়ে শুয়ে পড়েন—কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় সমস্যাটা এক রকম অমীমাংসিতই থেকে যায়।

জামাই দুটি সহরবাসী, খুব মিশুক। এ বাড়ী ও বাড়ী যায়, খুব হৈ চৈ আমোদ প্রমোদে সময় কাটায়। পুকুর থেকে নিজেরাই গিয়ে মাছ ধরে আনে জাল দিয়ে—গাছ থেকে ডাব পেড়ে খায় যখন-তখন, থালে

গায়ে সাঁতার কাটে। এতখানি বিদ্বান চাকুরে ছেলেরা যে এমন সরল চ্ছন্দ ভাবে চলতে পারে—মিশতে পারে সকলের সংগে, এ কথা গায়ের লোক ভাবতেই পারে নি। তারা অবাক হয়ে তাদের কীর্তি দেখে। কেউ করে প্রশংসা কেউ বা করে নিন্দা। ওরা এ দুটোর বাইরে, তাই ছুটির দিনগুলো আনন্দে ফুটিয়ে তুলতে চায়, জুতের ঘর নাটমন্দির ঝম ঝম করতে থাকে ওদের কলরবে।

এরপর একদিন সব কলরব থেমে যায়—আলোগুলি টিমিয়ে জ্বলে।

ওরা অমরেশকে নিয়ে চলে গেছে।

৩১

ভারবাহী পশুর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে দিলে সে যেমন ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক টানতে থাকে, বিপ্রপদও তেমনি অবস্থায় পড়েছেন। কত চেষ্টা করে মালাকে এড়াতে গিয়ে পড়লেন জড়িয়ে। যখন জড়িয়েই পড়েছেন তখন তিনি ওর কল্যাণে যত দূর সম্ভব আত্মনিয়োগ করবেন। ও পাগল কি না সঠিক বোঝা যায় না তবে ওর কতকগুলো কার্য কলাপ যে স্বাভাবিক নয়, তা বোঝা কঠিন নয়। ওর গান, ওর সময়োচিত দু একটা কথাবার্তা ওর অত্যধিক নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার বিপ্রপদকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। তিনি তাই ভাবছেন, ওকে একটু ভাল চিকিৎসা করাবেন এক জন বিজ্ঞ কবিরাজ দেখিয়ে। যদি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে থাকে, যদি তার হেতু নির্মূল করা অসাধ্য না হয়, তবে ও হিন্দুস্থানী যুবতী হলেও একটা বর্দ্ধিষ্ণু বাঙালী পরিবারের কাছে অমূল্য সম্পদ। ওর গান কার না মনে হিংসা জন্মায়? ওর রূপ ওর স্বাস্থ্য অনবদ্য। বলা উচিত না, এমন একটি হিন্দুস্থানী দাসী পাওয়া ভাগ্যের কথা। এতদিন বাদে বুঝি কমলকামিনীর ভাগ্যেই ও জুটল। এখন থেকে কমলকামিনী বোধ হয়

একটু বিশ্রাম পাবেন ওর যত্নে। গ্রামে ওঁর এখন যে সম্মান, তাতে এমনি একটি পরিচারিকার নিতান্ত প্রয়োজন। নিতাই যদি কমলকামিনীকে মালার সম্বন্ধে কিছু না বলে থাকে ভালই হয়েছে। তিনিও চিঠিপত্রে কিছু লিখে জানাবেন না। আগামী বৈশাখের আর কি-বা দেরী? একটা আকস্মিক বিস্ময় সৃষ্টি করে দেবেন বছরের প্রথম সপ্তাহে। প্রথম কমলকামিনীর একটা অভিমান হয়ত ঈর্ষাও হতে পারে, কিন্তু যখন মালার সুরের মালা ছড়িয়ে যাবে আকাশে, তার ওপর পাবেন অক্লান্ত দৈহিক সাহচর্য, তখন তাঁর কোথায় থাকবে অভিমান, কোথায়ই বা থাকবে ঈর্ষা! কমলকামিনী বুকে করে রাখবেন মালাকে। তিনি বুঝবেন, সমাজে বড় মুখ রাখতে হলে এ একটা সম্পদ। ভদ্র-গৃহস্থের এ একটা বৈভব। তা যদি না হবে তাহলে তাঁর বাবুরা অত খরচ পত্তর করে তিন চারটা হিন্দুস্থানী ঝিকে কেন রেখেছেন বাড়ীতে? মালার কাছে তারা বাঁদীর যোগ্যও না। বিপ্রপদ নিজেকে অন্তত এ বিষয়ে বাবুদের চেয়ে অনেক গর্বিত মনে করেন—মনে করেন তাঁর স্ত্রী অনেক সৌভাগ্যবতী।

'নায়েব মশাই বলতে পারেন, একজন ভালো কবিরাজ কোথায় পাওয়া যায়?'

সলোম দেহটা একটু দুলিয়ে নায়েব উত্তর দেয়, 'কবিরাজের অভাব কি?'

'সব কবিরাজ ডাক্তার তো সব চিকিৎসা করতে পারেন না—একজন উন্মাদ রোগের চিকিৎসক চাই।'

'কে আবার উন্মাদ হলো ম্যানেজার বাবু?' নায়েব সভয়ে প্রশ্ন করে, 'কে উন্মাদ হলো?'

'অবশ্য কেউ যে উন্মাদ হয়েছে তা নয়। মালার যেন একটু মাথা গরম—যেন কেমন একটা ছিট্ আছে বলে মনে হয়। ওকে একটু পরীক্ষা করাতে চাই। যদি কোন দোষ-টোষ থাকে—'

'ও, তাই বলুন। আমি ভেবেছিলাম, বাড়ীর কারুর অসুখ নাকি!'

বিপ্রপদ হেসে বলেন, 'না, সে বিষয় আমি খুব সুস্থ আছি।'

'বাবু, বলতে দোষ নেই, কিন্তু সাহস হয় না আপনার কাছে বলতে—'

'কেন, কেন বলুন না—সকলেরই মতামতের একটা অর্থ আছে। যুক্তিযুক্ত কথা হলে কে না শুনে পারে বলুন তো?'

'একটা বেশ্যাকে, বেশ্যা ছাড়া কি বলব আসমান তারাকে—কোরাণ সরিফ পর্যন্ত পড়ালেন, কত মধুর করে মৌলভী সাহেব ধর্মতত্ত্ব পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে শোনালেন, কিন্তু তার ফল হলো বিষময়—সে গেল একটা পেয়াদার সংগে পালিয়ে। আপনার চেষ্টা যত্ন অর্থব্যয় সব হল পণ্ড। এ ক্ষেত্রেও যে ফল বিষময় হবে না কে জানে?'

'সে ভয় করলে তো মানুষ মানুষের উপকার করতে পারে না। আর দেখেনই তো নায়েব মশাই, আমি কি যাই যেচে কিছু করতে—ঘাড়ে এসে পড়ে সব। তবে কি জানেন, আসমান তারা পালিয়ে গেলেও তাকে আমি বেশ্যা বলতে পারি নে। তার ভাল লাগেনি, এখান থেকে চলে গেছে, তা বলে তাকে বেশ্যা আখ্যা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়।'

সদাশয় হলেই ঐ দশা, আমার এক খুড়ো ছিলেন তিনিও অমনি—থাক্ সে কথা। কবিরাজ একজন আছেন, আমাদের প্রজাও বটে, উন্মাদ চিকিৎসায় খুব নামও করেছেন!'

'বাড়ী কোথায়?'

'শিমুলতলা।'

'নাম?'

'ভদ্রসেন—খুব প্রাচীন লোক। মা মনসার ওষুধ পেয়েছিলেন দৈবযোগে। তা বেচে বিলিয়ে এখন বড়লোক—বাড়ীতে দালান কোঠা।'

'শিমুলতলা এখান থেকে কত দূর?'

'বেশী না। বাঁক পাঁচেক জল—যেতে হবে নৌকায়।'

'তাঁকে খবর দিলে আসবেন না ?'

'উহুঁ। তাঁর নাকি রোগী-বাড়ী যাওয়া নিষেধ। গেলে নাকি ওষুধের গুণ থাকে না।'

'ও একটা মস্ত ধাপ্পা। এখন ওষুধটা ধাপ্পা না হলেই বাঁচি। ওষুধ আনতে লোক পাঠালে হয় না। কাকে পাঠান যায় বলুন তো ?'

'রোগ না দেখিয়েই তার ওষুধ—আন্দাজে ? মালা তো আদৌ পাগল নাও হতে পারে !'

'ঠিক বলেছেন।'

'বিশেষ কিছু ব্যয় হবে না। মাত্র সওয়া সাত আনা ওষুধের মূল্য। রোগী আরোগ্য হলে ইচ্ছা মত মায়ের পূজা দিয়ে আসতে হয়—ভদ্রসেনের বাড়ী গিয়ে। সেখানের দেবী নাকি জাগ্রত !'—বলে নায়েব মা-শীতলার উদ্দেশ্যে একটা সভক্তি প্রণাম করে। বিপ্রপদ ও অন্যান্য কর্মচারীরাও তাই করেন।

পরের দিন নৌকা সাজান হয়—কোষ নৌকা। ছজন মাল্লা, ছখানা দাঁড় মাঝি হাল ধরে বসে রয়েছে অপেক্ষায়।

বিপ্রপদর তোড়জোড় দেখে মালা জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় যাচ্ছেন বাবুজী ?'

'মফস্বলে। তুমি একা রেঁধে-বেড়ে খেও, আমি বিকেল নাগাদ ফিরে আসব। তোমার কোন ভয় নেই মালা।'

'আমি একা থাকতে পারব না—আমিও সংগে যাব।'

'চলো। কিন্তু তুমি থাকলেই ভাল হতো।'

'না, না। আমি একা একা এখানে থাকতে পারব না।' তারপর কতকটা যেন মনে মনেই মালা বলে, 'এখানেও কুকুরের ভয়।'

'কে কুকুর মালা ?'

'কেউ না।'

'তবে ভয় কিসের ?'

'ও সব কথায় আমি ভুলছি নে—আমিও সংগে যাব।'

বিপ্রপদর একটা সন্দেহ ছিল, মালা কবিরাজ দেখাতে রাজী হয় কিনা। এবার তিনি বলেন, 'তবে চলো, তাড়াতাড়ি জোগাড় হয়ে নেও।'

অনুকূল স্রোতে নৌকা ভেসে চলেছে। ঘোলা জল দাঁড়ের ঘায়ে ছোট-ছোট ঘূর্ণি সৃষ্টি করছে। চূর্ণিত জল-কণিকায় সূর্যের আলো পড়ে সহস্র সহস্র রত্ন-কণিকার মত বিচ্ছুরিত হচ্ছে দিকে দিকে। নদীর এ-পারের তরুশ্রেণী উদ্ধত গৌরবে যেন ও-পারের বনরেখার দিকে চেয়ে আছে উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে। মাঝে মাঝে এক এক ঝাঁক গাঙ-শালিখ, কাদা-খোঁচা, টিয়া পাখী নদীর ওপার থেকে উড়ে, মাথার ওপর দিয়ে এক-একটা ঘুরপাক খেয়ে, আবার ঠিক জায়গা মত এসে বসছে—কোন ঝাঁক বা দিগন্তে মিশে যাচ্ছে। কলার খোলের মত আবার ওটা কি ভেসে উঠল ? একটা কুমীর। মালা সভয়ে পিছিয়ে আসে। কিন্তু ঔৎসুক্য সে বেশী সময় দমন করে রাখতে পারে না। ভয় করলেও আবার এগিয়ে যায় জানালার কাছে—উঁকি মেরে দেখে, কোথায় গেল কুমীরটা ? নৌকা এগিয়ে গেছে অনেকখানি—কুমীরটা পড়ে রয়েছে পিছনে। বেগুনী ফুলে ভরা একটা কচুরীপানার দল এসে আবডাল করে ফেলল ভাসমান জন্তুটাকে।

মালা জানালা খুলে চেয়ে চেয়ে দেখছে। রুক্ষ উষর ধূসর দেশের মেয়ে সে, তার কাছে এ সব দৃশ্য ভাল লাগারই কথা। সে হাত বাড়িয়ে কতকগুলো বেগুনী নরম ফুল তুলে এনে নৌকায় রাখল। দল ছাড়িয়ে এ ফুলগুলো কেমন করে যেন ভেসে এসেছিল তার জানলার পাশে। ফুলগুলি রেখে সে আবার চেয়ে রইলো বাইরের দিকে। আবার এক ঝাঁক পাখী উড়ে আসছে এই দিকে। নৌকার ওপর পড়বে নাকি ? না, সেগুলো উড়ে গিয়ে বসল দূরে একটা চরে। সে চরে কিসের যেন চাষ। হয়ত

চৈতা-বোরর। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে কারা থাকে—ঐ চরের চাষীরাই বুঝি।

বিপ্রপদর সংগে সংগে কাগজ-পত্র। তিনি মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ হরিবাসর না কি মালা? কোন জোগাড়-যন্ত্র তো দেখছি নে?'

মালা একটু দূরে স্বমুখের কামরায় বসে বসে দেখছে। তার কানেই যায় না এ সব কথা।

'আজ কি খানা-পিনা নেহি মালা?' এবার বিপ্রপদর অপরিপক্ক হিন্দী ভাষা মালার কানে যায়—তার হুঁস্ হয়।

'কেন খাবেন না বাবুজী? কিন্তু কোথায় বসে রাঁধব?'

'বলো, মাঝিরা দেখিয়ে দেবে।'

মালা কর্মিষ্ঠা মেয়েমানুষ। মাঝিদের ওপর একান্ত যা নির্ভর করা দরকার, তা ছাড়া কিছু করে না। নিজের কাজ প্রায় সব নিজের হাতেই গুছিয়ে নেয়। রান্নার অংকটাও সোজা করে ফেলে। শুধু ভাতে-ভাত। অল্প সময়ের মধ্যে সব প্রস্তুত হয়ে যায়। বিপ্রপদ স্নান করে খেতে বসেন। মালা পরিবেশন করে। বিপ্রপদর খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র মালা খেতে বসে। কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে আবার জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। নুয়ে নুয়ে জলে নরম আঙুলগুলি ভিজিয়ে খেলা করে। এমন করে সে কোনদিন নদীর বুকে নৌকায় চড়ে বেড়ায়নি।

'মালা তুমি সাঁতার জানো?—একটু সরে বস নইলে জলে পড়ে যেতে পার।'

যদিও মালা সামান্য সাঁতার জানে, তবু ভয়ে ভয়ে একটু সরে সাবধান হয়ে বসে। কি জানি বাস্তবিকই তো পড়ে যেতে পারে। 'এখানে কত জল বাবুজী?'

'ঠিক বলতে পারি নে। আশী নব্বই হাত হবে। মাঝিরা হয়ত ঠিক জানে। কত জল হবে বলতে পার তোমরা?'

এখানে হয়ত জল কিছু কম হতে পারে। কিন্তু আর একটু ভাঁটার পথে এগুলে অথৈ জল। নদীর দুকূলে দুরংয়ের জল—এক পার দিয়ে বইছে ঘোলা পানি, অন্য পার দিয়ে কালা পানি। ঘোলা পানিতে আঁশ আছে, কালা পানিতে তা নেই। কত সায়েব সুবো এসে মেপেছে, কিন্তু কালা পানিতে থৈ পায়নি তারা। তাই ঘোলা ও কালা পানির মাঝখানে একটা কি যেন ভাসিয়ে রেখে গেছে শিকল দিয়ে নোঙর করে। কালা পানিতে নৌকা গেলে আর রক্ষা নেই, চুম্বকের মত নীচের দিকে টেনে নিয়ে যায় অতল তলে। ওখানে গেলে নদীর সীমানা নেই। নক্ষত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে কালা পানি এড়িয়ে বাইতে হয় নাও। একটুখানি ভুল-চুক্ হলেই সর্বনাশ। মাঝি তার জীবনে একবার মাত্র সেই ঘোর বিপদে পড়েছিল—কিন্তু উত্তীর্ণ হয়েছে অতি কষ্টে। আরও অনেক কিছু সে বলে। নোয়াখালির গ্রাম্য মাঝি তার ভাষা বোঝা দায়। বিপ্রপদ যত দূর সম্ভব ভাবার্থ উদ্ধার করে মালাকে বুঝিয়ে দেন। ঠিক যেন একটা গল্প—মালা হাঁ করে শোনে। শুনতে শুনতে আরও কাছে এগিয়ে এসে বসে। ও যেন একটি কচি মেয়ে আরব্যোপন্যাসের কথা শুনছে।

শেষ বেলায় নৌকা এসে থামল ভদ্রসেন কবিরাজের ঘাটে।

অল্প দূরেই তাঁর বাড়ী।

মালা প্রশ্ন করে, 'এখানে থামল কেন নৌকা?'

'এইখানেই তো আমার কাজ, তুমি বসো, আমি উঠি।'

'আমি কতক্ষণ একা বসে থাকব? আপনি ফিরবেন কখন?'

'বেশী দেরী হবে না। দু তিন ঘণ্টার মধ্যেই। সন্ধ্যার একটু পরে আমি নিশ্চয় ফিরব।'

'সন্ধ্যার পর! তা হলে আমি কিছুতেই একা থাকব না—আমিও উঠব ওপরে, আপনার সংগেই যাব।'

বিপ্রপদ কৃত্রিম বিরক্তির সুরে বলেন, 'তুমি বড্ড অবুঝ মালা, কোথায়

যাবে আমার সংগে? আচ্ছা এসো, কবিরাজ মশাইয়ের বাড়ীর মেয়েদের কাছে তোমায় রেখে আমার কাজে যাই।'

মস্ত বড় চৌমহল্লা বাড়ী ভদ্রসেনের। ভাগ্যে থাকলে কি না হয়! দেবতার মহিমা বেচেও দু দশ হাজার টাকা হয়ে পড়ে। লোকে বলেঃ কবিরাজ মশাই মা মনসাকে দুধ কলা খাইয়ে খুব তোয়াজ করে পেয়েছেন ওষুধ। মা মনসার আবার দয়ার শরীর। তিনি ফুসলিয়ে এনেছেন মা লক্ষ্মীকে। তাঁর দৌলতেই নাকি দালান কোঠা। মা মনসা স্থির হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বহির্বাটিতে একেবারে ভদ্রসেনের বৈঠকখানার পাশে—আর মা লক্ষ্মী রইলেন অন্দরমহলে একেবারে পুরনারীদের কাছে দালান কোঠার গোলক ধাঁধায় আটকে।

ভদ্রসেন বড় ভদ্রলোক। শিবচর ষ্টেটের এক জন বড় প্রজাও বটে। স্বয়ং ম্যানেজার বাবুকে সশরীরে উপস্থিত দেখে তিনি ভয়ে ও সম্ভ্রমে অস্থির। কি করবেন, কোথায় বসতে দেবেন, তাঁর যোগ্য আসন কোন খানা? অবশেষে একখানা তৈলাক্ত চেয়ারের ওপর একখানা দামী শাল বিছিয়ে দেওয়া হয়।

বিপ্রপদ আসন গ্রহণ করেন। মালা দাঁড়িয়ে থাকে। এই অপূর্ব সুন্দরী বিদেশিনীকে দেখে তো বুড়ো কবিরাজ অবাক! নিজের আসনখানা ঝেড়ে পুঁছে তাকে বসতে সম্বর্ধনা করেন।

'কবিরাজ মশাই আমাকে তো যাত্রারদলের মহারাজের মতই চেয়ারের ওপর শাল পেতে অভ্যর্থনা করলেন! আমাকেও আপনি চেনেন না, আপনাকেও আমি চিনি নে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা নিকট সম্বন্ধ আছে, তা আমরা দুজনেই জানি। সেই জন্য যদি এ অভ্যর্থনা করে থাকেন, তা আজ না করলেও চলত। আমি আজ প্রজা মনিবের সম্বন্ধ নিয়ে এখানে আসিনি।'

'আপনাকে বাবু আমি দেখেই চিনেছি। কবিরাজ মানুষ লক্ষণ দেখে যখন রোগ নির্ণয় করতে পারি, তখন হাবভাব দেখে মানুষটিকে চিনব না কেন? যেমন মানুষ তাঁর তেমনি যত্ন যদি না করি, তবে আর মাহাত্ম্য রইল কি?'

'কবিরাজ মশাই বেশ বাক্‌পটু।' বিপ্রপদ বলেন, 'আপনি যে দাঁড়িয়ে রইলেন, বসুন—এ কেমন, বসুন না!'

'আমার বাড়ী, আমি বসি আর না-ই বসি, আপনার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।···ও বেহারী, বেহারী—একটু তাড়াতাড়ি বাবা, তাড়াতাড়ি। আজকের দিনটির জন্যে অন্তত কুড়েমীটা ছাড়, পান তামাক নিয়ে আয়।'

বেহারী সবেগে এসে মালার দিকে রূপো বাঁধান হুঁকোটি বাড়িয়ে দেয়। ভদ্রসেনের রুক্ষ কটাক্ষে টেনে এনে সে বিপ্রপদকে যাচাই করে। বেহারীর এ ভুল অস্বাভাবিক নয়। ঘাগরা পরা মালা পুরুষ মানুষ, না মেয়েলোক, তা সে হঠাৎ চিনবে কি করে? সে একটা অজ গ্রামের ভৃত্য বই ত নয়!

'আমি তামাক খাই নে।'

বেহারী ভদ্রসেনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

'নিয়ে যা, দাঁড়িয়ে থাকিসনে—পান নিয়ে আয়।'

'এখন পানও খাব না আমি।'

'উনি?'

'উনি তো খান না এ সব।'

'তবে থাক। এখন তুই যা—একেবারে জাহান্নামে যাস নে বাপ—ডাকলে যেন সাড়া পাই।'

বেহারী চলে যায়—মালা হাসে।

'উনি কে? এবং কি প্রয়োজনেই বা আগমন? এখন একটু বুঝিয়ে বলুন শুনি।'
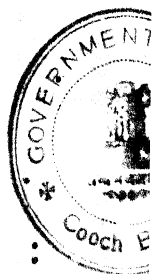
এই তো সবে সুরু হলো। বিপ্রপদ মালাকে নিয়ে যেখাবে যাবেন, সেইখানেই এই বিভ্রাট। পরিচয়হীনার কি পরিচয় দেবেন তিনি? তাঁর যে দাসী বাঁদী তাও তো বলা যাবে না, তাতে মালা আঘাত পাবে। তাঁর যে কোন আত্মীয়ও নয় মালা, তার প্রমাণ তার সাজ সজ্জা। সে বাঙালী ঘরের বধূও নয়, মেয়েও নয়। সে সাজ পোষাক থাকলে কেউ হয়ত প্রশ্নই করত না—একটা কিছু সম্পর্ক মনে মনে স্থির করে নিয়ে চুপ করে থাকত। এমনি আর কত সমস্যাই যে ভবিষ্যতের জন্য তাঁর ভাগ্যে তোলা রয়েছে!

'এই না আপনি বললেন লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করতে পারেন, এবার বৈলক্ষণ্য দেখছি কেন? আপনার বোঝা উচিত।'

চোখ বুজে একটু চিন্তা করতেই যেন ভদ্রসেনের জ্ঞান চক্ষে সব ধরা পড়ে যায়। তিনি বলেন,মা মনসার আজ্ঞা: তুমি কখন নারীর নাড়ী ধরবে না। আমি তা ধরিও না। কিন্তু দেবী মাহাত্ম্যে সব বুঝতে পারি। এখন আমি বুঝেছি, আপনাঁদের সন্দেহ অমূলক। চোখের চাউনি দেখলে আমি সব ধরতে পারি। একটু খেয়ালী মানুষ, খেয়াল মত রাখলে চিরদিন খুশীতে থাকবেন, কাউকে জ্বালা দেবেন না। এমন আমি ঢের দেখেছি, তাই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, চিন্তা করবেন না বাবু।'

বিপ্রপদ বুঝলেন: ভদ্রসেন সুচতুর এবং গুণীও বটে! তাই এত পয়সা ও প্রতিপত্তি। কি সুনিপুণ বাক্‌চাতুর্য। বৃদ্ধ হলেও বুদ্ধিভ্রম ঘটেনি। মালাকে নিয়ে একটা সমস্যা সৃষ্টি না করে কেমন সব আকারে-প্রকারে বুঝিয়ে দিলেন। অথচ মালা কিছু টের পেল না। বিপ্রপদও একটা মহা বিপদ থেকে রেহাই পেলেন।

'বাবু, আপনি এখন স্বচ্ছন্দে এখানে বসে বিশ্রাম করতে পারেন। ওঁকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাই। এখানেই আজ রাত্রে আহারের ব্যবস্থা হচ্ছে। গরীবের বাড়ী যা জোটে, তাই চারটি দয়া করে গ্রহণ করবেন।'

'না, না। সে জন্য কোন ব্যস্ত নেই। তাহলে মালা, তুমি ভিতরে যাও, সকলের সংগে আলাপ করে এসো গে। আমিও আমার কাজটুকু সেরে আসি। কবিরাজ মশাই ওকে দিয়ে আসুন না—আমার সংগে একটু বাইরে যাবেন।'

'এই মালতী, দেখ কে এসেছেন—ওঁকে ভিতরে নিয়ে যা।'

মালতী আসে—মালা ও মালতী অন্দরের দিকে চলে যায়। এবার বিপ্রপদ কবিরাজ ভদ্রসেনকে সব খুলে বলেন।

ভদ্রসেন আদ্যোপান্ত শুনে বলেন, 'মেয়েটি ভাবপ্রবণা—উন্মাদের কোন লক্ষণই দেখছি নে। গান গাইলেই আর উন্মাদ হয় না।'

'তা ঠিক, তা ঠিক। আপনি বহুদর্শী চিকিৎসক, আপনার নজর কি এড়াতে পারত পাগল হলে?'

'কিছুতেই পারত না হুজুর—এ মা মনসার আশীর্বাদ!'

'আপনি মহৎ ব্যক্তি।' বিপ্রপদ আর কথা খুঁজে পান না। 'তা হবে না কেন—এই তো দিন রাত অধ্যয়ন করছেন। আমরা এ বিষয় অনভিজ্ঞ, তাই চিন্তা ছিল—আপনি নিশ্চিন্ত করলেন। ওই মটকিগুলি কিসের? কেমন তেল কুচকুচে পাত্রগুলো বসিয়ে রেখেছেন সারি দিয়ে! আবার ওতে কি? দেখছি সব কটিই যে এক মাপের!'

'ওগুলোতে ওষুধ-তেল। নিত্য জ্বাল হচ্ছে, নিত্য সরবরাহ হচ্ছে। আজ রবিবার, আমার বিশ্রামের দিন—তা না হলে দেখতেন কত নৌকা বাঁধা থাকত ভদ্রসেনের ঘাটে। সবই মায়ের দয়া, মায়ের ইচ্ছা।'

'আপনার বয়স?'

'একাশী বছর চলছে।'

'একাশী বছর! তবু তো আপনি বেশ শক্ত-পোক্ত আছেন?'

'হাঁ। এই বয়সে কত পাগল দেখলাম, কত গাল-মন্দ হিংসা দ্বেষ,

দ্বন্দ্বের কথা শুনলাম—কিন্তু পাগল কাঁদলেই প্রায় ভাল হয়, হাসলে খুব ভয়ের কথা। হাজার ওষুধেও ভাল হতে চায় না।'

বিপ্রপদর মুখ শুকিয়ে যায়, বুকটা ধক্ করে ওঠে: মালা তো হাসে।

'আপনি যা ভাবছেন, তা কিছু নয়—ও হাসি পাগলের হাসি নয়, উনি প্রকৃতিস্থ।'

'আপনি মনের কথা বুঝলেন কি করে?'

'অভিজ্ঞতায়। রোগী দেখতে দেখতে জ্ঞানের নাড়ী পেকে গেছে।'

'এবার বুঝলাম সব।'

এমনি আরও অনেক কথা-বার্তা হয়। রাত্রিও বাড়ে; রাত্রান্তে মালা ও বিপ্রপদ নৌকায় ফেরেন। ভদ্রসেন লোকজন ও আলো দিয়ে তাঁদের এগিয়ে দিয়ে যান নৌকায়।

রাত্রির অন্ধকারে জোয়ারের টানে নৌকা আবার চলতে থাকে। মালা আবার জানলার কাছে এসে বসে। বিপ্রপদ ঠাণ্ডা হাওয়ায় চট করে ঘুমিয়ে পড়েন। জলে হাত ডুবিয়ে আগের মত আঙুলগুলো নাচাতে থাকে মালা। জলের মধ্যে হাজার হাজার ওগুলো কি জ্বলছে! জোনাকীর চেয়েও ছোট, কিন্তু জেল্লা কেমন চোখ-ধাঁধান! ভয়ে-বিস্ময়ে মালা হাত তুলে নেয়। এত হীরা জহরৎ এলো কোত্থেকে?

মাল্লারা বুঝতে পেরে বলে যে, নদীর জলের নুণ এখনও কাটেনি, ঘন বর্ষা না পড়লে কাটবেও না। নোণা জলে নাড়া পড়লে অমনি দেখায়, অমনি চকমকিয়ে জ্বলে।

বাস্তবিক দাঁড়ের আঘাতেও জলের ভিতর কোটি কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণি-মাণিক্য ঝক্-ঝক্ করে উঠছে, একটু পরেই তা অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। বাঃ, কি চমৎকার! ওদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মালাও ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর বেলা বিপ্রপদর শিবচরের ঘাটে এসে ঘুম ভাঙে।

সুমুখের কামরায় বসে মালা তখন গান গাইছে।

মালা যে পাগল না, এ কথা ভাবতেও বিপ্রপদর ভাল লাগে। মালা তাঁর কি? গৃহের পরিচারিকা? কমলকামিনীর দাসী? এ সব অযোগ্য সম্বন্ধ। তবে সে কোন পরিচয় নিয়ে এই বসু-পরিবারের সংগে মিশে থাকবে? মাতা, বধূ, কন্যা, না নতুন কিছু? তিনি আর ভাবতে পারেন না। তাঁর ডাক পড়ে, 'বাবুজী!'

'কি মালা?'

'এখন উঠবেন না? নৌকা ঘাটে এসেছে অনেকক্ষণ। কাল রাত্রে কত যে ছোট ছোট হীরা পান্না জহরৎ দেখলাম! হাতে নেড়ে-চেড়ে ছেড়ে দিলাম। তখন আপনি ঘুমে!'

'স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি?'

'না, সত্যি।'

'বলো কি! এত সব দামী পাথর নেড়ে-চেড়ে ছেড়ে দিলে কোথায়?'

'জলে।'

'এই জন্যই তো তোমায় বলে পাগলী। তোমার থাকা উচিত ভদ্রসেনের বাড়ী।' বিপ্রপদ স্মিত মুখে বলেন, 'কত হীরা পান্না ফেলে দিয়েছ জলে—এখন বসে বসে কাঁদছ নাকি? পাগলীই বটে!'

'না বাবুজী, আমি যা বলি, তা সত্যিই বলি। লোকে বোঝে না—আপনিও বুঝতে চাইছেন না, হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন—কিন্তু মাঝিরা সাক্ষী, তাদের কাছে পুঁছিয়ে জী।'

প্রৌঢ় বিপ্রপদর চোখে আজ হঠাৎ একটা নতুন ছায়া ফেলে এই যুবতী যাযাবরী।

'আবার হিন্দী—অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করব? আচ্ছা করে দেখি। এই ওসমান, বলো তো, ব্যাপারটা কি?'

মাঝি ছিল পিছনে—ঘটনাটা ঘটেছে সুমুখে—সে কিছু জানে না। গলুইর মাল্লারা এগিয়ে এসে বলে যে, এই, এই ব্যাপার।

'ও, এতক্ষণে গিয়ে বুঝলাম।' বিপ্রপদ হেসে বলেন, 'এই তোমার সত্যিকারের হীরা পান্না! ভালই তো! ওর এক ছড়া হার গড়িয়ে দেবো তোমাকে।'

'আজ ঠাট্টা করছেন, বরাতে থাকলে সত্যি হতে কতক্ষণ!' একটু দৃঢ়তার সংগে মালা জবাব দেয়, 'এমন তো কত হয়! কত হতে দেখেছি।'

বিপ্রপদ হঠাৎ প্রসংগটাকে চাপা দিয়ে বলেন, 'ভদ্রসেনের স্ত্রী তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করলেন, আদর-যত্ন করলেন কেমন? কি খানা-পিনা করলে?'

প্রথমেই সকলে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি আপনার কে?'

'উত্তরে তুমি কি বললে?'

'কি বলব তাই ভেবে আমি চুপ করে রইলাম। মালা একটু বাঁকা বিদ্যুতের মত হেসে ফের বলতে থাকে, 'আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যাইনি, আপনিও কিছু বলে দেননি, তাই চুপ করে না থেকে আর করব কি! আমাকে চুপ-চাপ দেখে কেউ বলল, বাবুর বহু—কেউ বলল মেয়ে—কেউ বলল ঝি। আচ্ছা বাবুজী, আমি আপনার কে? আবার কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব কি?'

শয্যা ত্যাগ করে, উঠতে উঠতে বিপ্রপদ জবাব দেন, 'বলো, তুমি আমার কেউ নও।'

মালা কতখানি আঘাত পেল, তা বোঝা গেল না। বিপ্রপদ মালাকে না ডেকেই নৌকা ছেড়ে উঠে চলে গেলেন।

মালা বসে রইল নৌকা ও কূলের সন্ধিস্থলটার দিকে চেয়ে। নৌকাটা একবার এগিয়ে আসছে, স্রোতের ঘায়ে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে—ঘুলিয়ে উঠছে মাঝখানের জল। কেউ মিলছে না ঠিক কারুর সংগে। তবু বাঁধা

আছে নৌকাটা পারে—একটা টানা নোঙর দিয়ে। মালার অদৃষ্টেও যে কি আছে, কে জানে!

কয়েক দিন পরে বিপ্রপদ আহার করতে বসে জিজ্ঞাসা করেন, 'মালা, তোমার বাড়ী কোথায়?'

'হিন্দুস্থান।'

'সে ত জানি। কোন জেলা, কোন গ্রাম?'

'তা বলতে পারিনে।'

'জাত?'

'আপনাকে ত প্রথম দিন গয়নার নৌকায় বসে বলেছি, ব্রাহ্মণের মেয়ে আমি।'

'হ্যাঁ, সে কথাও তো জানি।'

'তবে আপনি কি জানতে চান?'

'তোমার বাবার নাম? বাড়ী কোথায়, তা তো সঠিক জানই না।'

'না জানি নে। কিন্তু বাবার নাম জানি।'

'অনেক দিন মনে ভেবেছি, জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। আজ হঠাৎ মনে পড়ল, তাই জানতে ইচ্ছা হচ্ছে—তোমার পিতা জীবিত না মৃত, তাঁর নাম কি?'

'বাবা মারা গেছেন, সে অনেক দিনের কথা। তাঁর নাম ছিল জগৎপতি মিশ্র। তিনি একজন নামকরা গাইয়ে ছিলেন। তাঁর কাছেই আমার গান শেখা। মার নাম নাকি বলতে নেই, তবু আজ বলব। তাঁর নাম ছিল কাত্যায়নী দেবী। মা ছিলেন বাঙালী, বাবা হিন্দুস্থানী। এঁদের বিয়ে হয়েছিল কাশীধামে। বাবা মারা যাওয়ার পর, মা আমাকে নিয়ে নানা দেশে ঘুরে বেড়ায় গান গেয়ে ভিক্ষা করে। মাও আমার ভাল গান জানত কি না! বহু দেশ ঘুরে আশ্রয়ের সন্ধানে আসেন কলকাতায়।'

'কেন, তোমাদের দেশ—সেখানে কেউ ছিল না ?'

'থাকলেও জানি নে। কেউ কখনও বাবার খোঁজ নিতে কাশীতে আসেনি। বাবাও কোন দিন কারুর নাম পর্যন্ত করেননি। এখন বুঝছি, এর মধ্যে একটা অর্থ ছিল।'

'কি অর্থ ?'

'এই বিয়ে।'

'হবে হয়ত। কিন্তু এমন তো আমি দোষের দেখি নে কিছু—দুজনেই গুণী ছিলেন—বিয়ে হয়েছে—যাক সে কথা। তারপর ?'

'আমার মামাবাড়ী কলকাতায়। কিন্তু সেখানেও কেউ জীবিত নেই—সব ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। মা এত দিন লজ্জায় বুঝি বাপের বাড়ীর সংগে কোন সম্বন্ধ রাখেনি, কিন্তু নিরুপায় হয়ে যখন সেখানে ফিরেও কোন আশ্রয় পেল না তখন তার মনে বড় দুঃখ হল—হতাশায় ভেঙে পড়ল দেহ। মাও অল্পদিনের মধ্যে মারা গেল এক হাসপাতালে। এইবার আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হলাম। তখন থেকে পথে পথে, কত পাহাড়ে জংগলে দেশে বিদেশে যে ঘুরে বেড়াচ্ছি একটু আশ্রয়ের জন্যে ! কেউ আশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা—একটু ডেকেও জিজ্ঞাসা করল না কিন্তু যারা দরদ দেখাতে এলো তারা ছেলে ছোকরা অথবা লম্পটের দল। ওরা সব কুকুরের সামিল। তাই পাগলের ভাণ করে চলতে লাগলাম পথে। খুঁজতে লাগলাম সত্যিকারের দরদী—যদি কেউ মুখ তুলে চায়, যদি কেউ এতটুকু আশ্রয় দেয়। কিন্তু তেমন দরদী লোক এ দুনিয়ায় কজন মেলে ! সেদিন যদি আপনি আমাকে রক্ষা না করতেন, তাহলে আজ আমার মান-ইজ্জৎ থাকত কোথায় কে জানে ! আমি নিরুপায় হয়ে আপনার সংগ নিয়েছি। বলুন বাবুজী, আপনি আমাকে যে মাথা-গোঁজার ঠাঁইটুকু দিয়েছেন, সেখান থেকে কি তাড়াবেন ? না—রাখবেন রক্ষে করে ? দয়া করে চারটি খেতে দিচ্ছেন, তার বদলে আপনার পায় বিকিয়ে থাকব আমি।'

'আহা, কেঁদ না মালা, কেঁদ না, কে তোমাকে তাড়াচ্ছে?'

'মাঝে মাঝে যে আপনি মুখ ভার করে থাকেন—আমার ভয় হয়।'

'সব সময় কি মানুষ হাসতে পারে?'

'কিন্তু মুখ দেখলে তো মেজাজ বোঝা যায়।'

'তোমাকে আবার মেজাজ দেখালাম কখন?'

'সেদিন নৌকায় বসে। আপনি রাগ করে উঠে এলেন, আমাকে ডাকলেনও না, আমার যে কি দোষ হল তাও বুঝলাম না।'

'কবে রাগ করে উঠে এলাম মনে তো পড়ে না?'

'পুরুষ মানুষের মন, অমনি ভুলোই হয়।'

'সে কথা থাক। তোমার কাপড়-চোপড়ের কি হবে মালা? কোথায় পাওয়া যাবে? সব তো ছিঁড়ে গেছে।'

'আমার বড্ড শাড়ী পরার সখ।'

'তবে তো বাঁচালে আমাকে। কোথায় খুঁজতে যেতাম ঘাগরা আর ওড়না। কালই শাড়ী সেমিজ এনে দেব।'

'বাঙলা দেশে এসেছি, বাঙালী মেয়ের মতই চলব। বড় ভাল লাগে রঙিন শাড়ীগুলো পরতে।'

'তাই পাবে মালা, তাই পাবে।'

বর্তমানের যেটুকু সম্বল তার ওপর নির্ভর করেই মালা অতীতকে ভুলতে বসে। সে বড় পরিশ্রান্ত—ভাগ্যতাড়িতা। তাই তার এ গৃহকোণের বিশ্রামটুকু তার কাছে বড় ভাল লাগে। সে পরিপূর্ণ মন দিয়ে তা ভোগ করে। সংসারের টুকিটাকি কাজ যেন তার বিশ্রামেরই অংগ। ওতে তার শান্তির কোন বিঘ্ন ঘটে না। সে ক্রমে ক্রমে ভাবতে শেখে, এ ছোট্ট সংসারটা যেন তারই। তাকে কেন্দ্র করেই যেন বিপ্রপদ ঘুরছেন—পাইক পেয়াদা প্রয়োজনের জিনিষ জুগিয়ে যাচ্ছে। তারই জন্য শাড়ী, তারই জন্য সেমিজ, তারই জন্য সব কিছু। সে গুন্‌গুনিয়ে

গান গায় আর মনের আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। এখন মালা খুশী।

সারা দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার আগে বিপ্রপদ ডালিম বাগটার পাশ দিয়ে একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ান। সমস্ত দিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর এই বেড়ানার লোভটা তিনি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন না। আসমান তারার ছেলেটা চিরদিনের মত ওই ডালিম বাগে ঘুমিয়ে আছে। ওর কবরটা এখন আর চেনা যায় না। বর্ষায় জলে ধুয়ে মুছে মিলিয়ে গেছে। শুধু একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ তার অজস্র সুগন্ধি ফুল নিয়ে একটা স্মৃতিচিহ্নের মত দাঁড়িয়ে আছে সেই ছোট্ট গোর-স্থানটায়। বিপ্রপদ এগিয়ে গিয়ে দুটো ফুল তুলে এনে আঘ্রাণ করেন। শিশুটার হাসিটুকু মনে পড়ে—মনে পড়ে ওর মার কথা। কিন্তু বিপ্রপদর ঘৃণা হয় তা ভাবতে। তিনি বাসার দিকে ফেরেন। ফুল দুটো টেবিলের ওপর রেখে তিনি নিজের কাজে কাছারী-বাড়ীর দিকে চলে যান।

অনেক রাত্রে বিপ্রপদ বাসায় ফিরে দেখেন : মালা ঘুমিয়ে রয়েছে। বসে থেকে থেকে তারই শয্যার পার্শ্বে কখন যেন তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছে। তার দেরী হওয়ার জন্য তিনি মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হন। কিন্তু সাল-তামামিতে এমনি দেরী হওয়া প্রায় প্রত্যহই স্বাভাবিক। আগে তিনি নিজে রেঁধে খেতেন—দেরী বুঝলে নায়েব মুহুরীর সাহায্য নিতেন। তখন কেউ তাঁর জন্য অপেক্ষা করত না, কেউ ঘুমেও অধীর হতো না—তাই চিন্তাও ছিল না কিছুই।

তীব্র বাতির আলোতে বিপ্রপদ চেয়ে দেখলেন : ঘুমন্ত মালা অনিন্দ্য-সুন্দরী! তার খোঁপায় ও দুটো কি? তাঁরই তোলা ফুল দুটোই ত! বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে! কালো কুণ্ডলী করা এক রাশ চুলের মধ্যে দুটি শুভ্র গন্ধরাজ!

কিন্তু সে কি ভেবে কোন্ সাহসে পরল তাঁর তোলা ফুল খোঁপায়? এ

মালার সাহস, না দুঃসাহস! তাকে এ বিষয় একটু আকারে প্রকারে শাসিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু দুঃসাহস না হয়ে ছেলেমানুষীও হতে পারে। গুরুজনের তোলা ফুল কি মেয়েরা খোঁপায় পরে না? বিপ্রপদর স্নেহপ্রবণ হৃদয় মালাকে ক্ষমা করে।

ঘরের মধ্যে শব্দ হতেই মালা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। সে যে বাবুজীর শয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছে তার জন্য বিশেষ লজ্জিত হয়। শাড়ীর আঁচল গুছিয়ে এনে মৃদু হেসে চোখ রগড়ায়। আজই সে প্রথম শাড়ী পরেনি, পরেছে প্রায় সপ্তাহকাল আগে, কিন্তু বিপ্রপদর যেন সঠিক নজরে পড়ল আজ। এত দিন কাজের চাপে যা নজর এড়িয়েছিল, আজ তা প্রত্যক্ষ হলো মালার সদ্য জাগা দেহের ছন্দে কবরীর পুষ্পিত প্রসাধনে।

'মালা, আজ আমার দেরী হয়েছে—এ কদিন এমনি দেরী হবে। বছরের শেষ কিনা!'

'তাতে হয়েছে কি? আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—অভ্যাস হয়ে যাবে।'

'তুমি খেয়ে দেয়ে তোমার জায়গায় গিয়ে শুলেই পার, আমি তো নিজের ভাত বেড়ে নিতেও পারি! এত রাত জাগা কি ভাল?'

'বাঙালীর মেয়েরা তা পারে না। আমার মাও পারত না।'

'তাহলে তো তোমার কষ্ট হবে।'

'হক একটু কষ্ট, তাতে কি এসে যায়!'

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে বিপ্রপদ শয্যা গ্রহণ করেন। মালা এঁটো পাত তুলে বাইরে রেখে নিজের আহার্য নিয়ে বসে। সে খেতে খেতে কি যেন ভাবে তাই তার দেরী হয় অনেক।

বিপ্রপদ বলেন, 'এক গ্লাস জল দাও মালা!'

'এই দিচ্ছি'—বলে সে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে জল নিয়ে উঠে যায়।

'তোমার আজ এত দেরী হলো কেন?'

'কত কথা ভাবছি, কি ছিলাম, কি হলাম—ভবিষ্যতেই বা হবো কি, কে জানে!'

'তা যখন জানো না, বর্তমান নিয়েই থাক। এখন অনেক রাত হয়েছে, শুতে যাও।'

মালা ধীরে একটু জবাব দেয়, 'যাই।'

আগামী বৈশাখের আর দেরী নেই, তখন বিপ্রপদ বাড়ী যাবেন—এ আগে থেকে ঠিক করা। মালাকে তিনি কি বলে শক্তিগড়ে নিয়ে যাবেন! গ্রামবাসীদের কাছে তিনি কি বলে পরিচয় দেবেন? আগে যা স্থির করেছিলেন, তা ভেবে দেখলেন কার্যকালে অচল। পরিচারিকা বলেও চালান যাবে না। তাতে মালাও দুঃখিত হবে, লোকেও বিশ্বাস করবে না। লোকে বিশ্বাস না করার কারণ তার রূপ। দাসী বাঁদী এত রূপসী হয়, কে কোথায় দেখেছ? কমলকামিনী মালাকে দেখা মাত্র তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন। একে যুবতী তাতে অনূঢ়া। তার ওপর যখন শুনবেন যে, বিপ্রপদর সংগে এ ক মাস একা-একা কাটিয়ে এসেছে কাছারী-বাড়ীতে তখন মহাপ্রলয় অনিবার্য। সে মহাপ্রলয়ে যদিও বা বিপ্রপদ রক্ষা পান, কিন্তু মালা নিশ্চয় ডুবে মরবে। কোন কথা বুঝিয়ে বলার অবকাশ দেবেন না কমলকামিনী। স্ত্রী হলেও তিনি মেয়েমানুষ। এ ক্ষেত্রে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করবেন না স্বামীকে। বরঞ্চ আঘাত করবেন মর্মস্থলে। গাঁয়ের লোক অনুমানে খারাপটাই ধরে নেবে এবং কমলকামিনীর ক্রোধে ইন্ধন জোগাবে। এ সব কথা দীনু শুনবে, ঘোষালেরা জানবে—সমস্ত অর্থ বিপরীত হয়ে যাবে কমলকামিনীর জন্য। কিন্তু তিনি ঠিক থাকলে বাইরের হাওয়া দমকা বাতাসের মত অল্পতেই থেমে যেত। মালাকে নিয়ে গেলে গৃহযুদ্ধ এড়ান কঠিন। মান-মর্যাদা হবে নষ্ট। কাউকে কিছু না জানিয়ে মালা হয়ত আত্মহত্যাই করে বসবে। যার জন্য এ আলোড়ন সে হয়ত এক নিমেষেই নিবিয়ে দিয়ে যাবে সব। সে যে ভাবালু মেয়ে!

বৈশাখ মাস পড়তে পড়তেই তাঁর বাড়ী যেতে হবে, চাকরী যদি ছাড়তে হয় তবু যেতে হবে—প্রাণে বেঁচে থাকলে এ যাওয়া কেউ তাঁর রোধ করতে পারবে না। কারণ, তাঁর সব স্বপ্ন পড়ে আছে দক্ষিণের বিলে। ওই বিল তাঁকে শয়নে জাগরণে ডাকছে।

কিন্তু মালার জন্য তখন তিনি কি ব্যবস্থা করবেন? দেশের সমস্যা মালা বুঝবে না, সে বিপ্রপদর সংগও ছাড়তে চাইবে না। যাওয়ার সময় হলে সে তাঁকে মরিয়া হয়ে ধরবে, কাঁদবে, কিছুতেই ফেলে যেতে দেবে না। যদিও বা অনেক বলে কয়ে ভুলিয়ে রেখে যাওয়া যায়, তবে কি সে থাকবে এখানে একটা স্ত্রীলোকশূন্য কাছারী বাড়ীতে—নিতান্ত নিঃসংগ? বিপ্রপদর মত কে তার দায়িত্ব নেবে? বুড়ো নায়েব? না, সে কিছুতেই রাজী হবে না। মুহুরীটার তো অল্প বয়স। অন্যান্য যারা আছে তারা ভিন্ন জাত, ভিন্ন দেশের লোক।

এতদিন ধরে তিনি যা গুছিয়ে এনেছেন তা কি নষ্ট হবে সামান্য একটা স্ত্রীলোকের জন্য? অথচ এই নারী তাঁর কেউ নয়। পথ চলতে সে অনুসরণ করে এসেছে—বিপ্রপদ আশ্রয় দিয়েছেন, তার আহার্য জুগিয়েছেন, করুণা করে তাকে দিয়েছেন ভবিষ্যতের ভরসা। এখানেই তার ভুল হয়েছে। ভবিষ্যতের দায়িত্ব না নিলেই তিনি কর্তব্যের ডাকে আজ ফেলে যেতেন পথের মালাকে পথে। কিন্তু তা কি মানুষে পারে? সবই তো কর্তব্য। বড় এবং ছোট সবটারই মূল্য যাচাই করলে এক। মালার জীবনটা কি এতই অবহেলার? না না, তা হতে পারে না। মালাকে তুচ্ছ করা মানে সত্যকে অবহেলা করা। বিপ্রপদ তা কোন দিন পারেননি, এখনও পারবেন না। তাঁকে সব দিক্ বজায় রাখার একটা পন্থা আবিষ্কার করতে হবে। বড় হতে গেলে তাঁকে সব দিক দিয়েই বড় হওয়া চাই—অন্তরে বাইরে সব দিক দিয়ে।

টেবিলের ওপরের বাতিটা রোজই বিপ্রপদ নিবিয়ে শুয়ে পড়েন, কিন্তু

আজ এখনও জ্বলছে—মালা উঠে আসে বাতি নিবাতে। বাবুজীর হয়
ভুল হয়েছে।

'ও কি মালা, তুমি এখনও সজাগ?'

'আপনিও দেখি ঘুমাননি।'

'শুধু একটা কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।'

'এমন কি কথা বাবুজী?'

'তুমি বুঝবে না—বৈষয়িক ব্যাপার কি না!

'আলো নিবিয়ে দেব?'

'দাও।'

'আপনি না কি বাড়ী যাচ্ছেন শীগ্‌গির?'

'হ্যাঁ, যাব তো নিশ্চয়।'

'আমি?'

'তুমি, তুমি কি করতে চাও?'

'আমিও সংগে যাবি।'

'যেও।' এর চেয়ে বেশী কিছু তখন বিপ্রপদ বল
তাই ক্ষুদ্র একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেই চুপ করে থাকেন।

মালা বাতি নিবিয়ে চলে যায়, না নিঃশব্দে শয্যার পাশে দাঁ
থাকে বোঝা যায় না!

প্রথম পর্ব শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রি
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিক